শাহাদাতে কারবালা

গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ

১ম প্রকাশ ২০০৭

ضریح مطہر حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ

শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পরিষদ

জমিয়তুল ফালাহ কমপ্লেক্স, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

শাহাদাতে কারবালা

গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ

প্রথম প্রকাশ ২০০৭

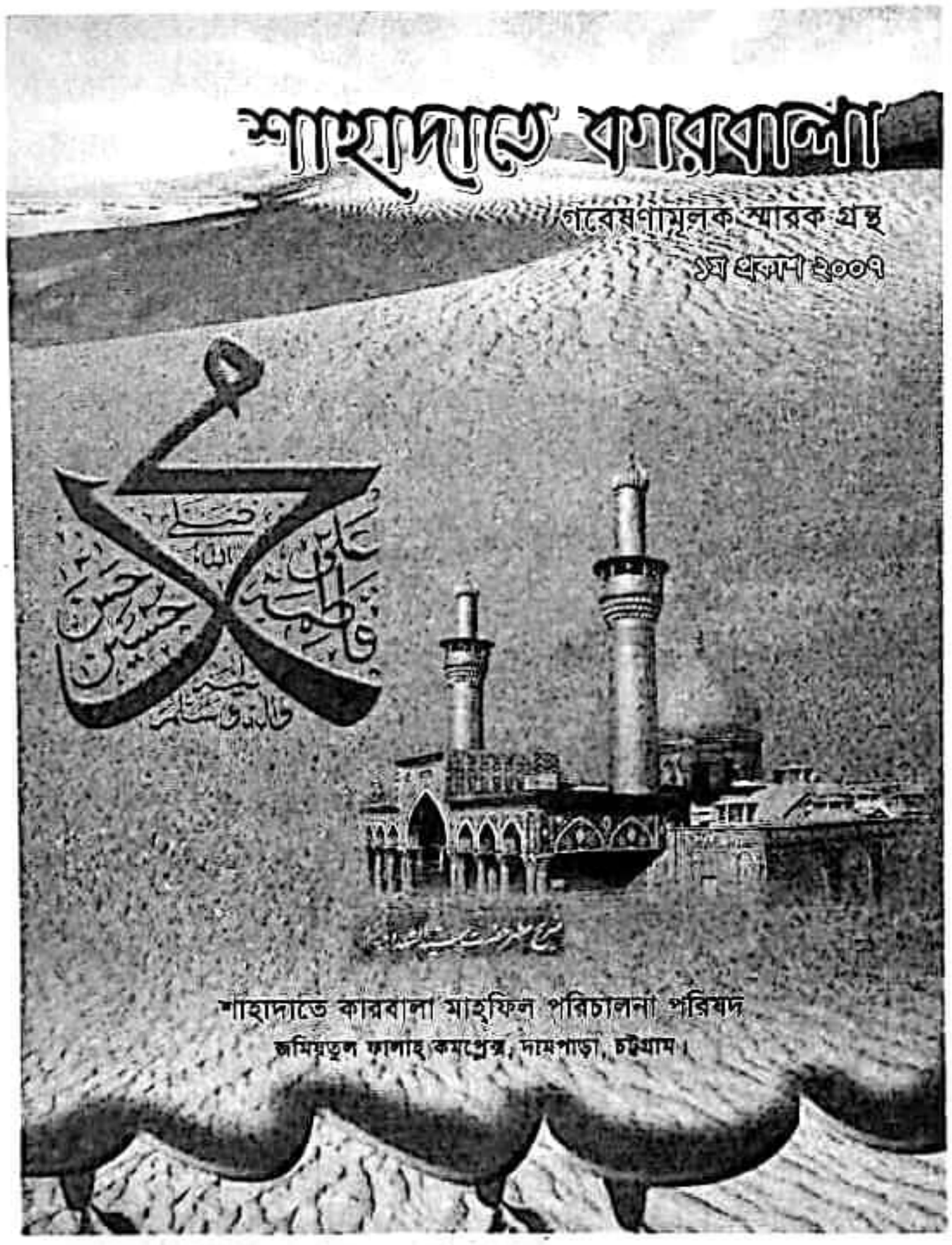

শাহাদাতে কারবালা মাহ্‌ফিল পরিচালনা পরিষদ

জমিয়তুল ফালাহ্ কমপ্লেক্স, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

শাহাদাতে কারবালা

গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ

মাহফিল বর্ষ : ২১, প্রকাশনা বর্ষ : ১ম, সংখ্যা : ১ম

প্রকাশকাল

১ মুহার্‌রাম ১৪২৮, ২১ জানুয়ারী ২০০৭ , ৮ মাঘ ১৪১৩

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল্‌ক্বাদেরী
মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্‌
মাওলানা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান
মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার

প্রকাশনা পরিষদ

আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ
আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল লতিফ
আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক
মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিম

মুদ্রণ সহযোগী

মাওলানা মুহাম্মদ মুঈন উদ্দিন

প্রকাশনা

শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পরিষদ
জমিয়াতুল ফালাহ্‌ কমপ্লেক্স, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ

ইমেজ সেটিং লি., আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্য

৫০ টাকা

SHAHADAT-E-KARBALA

A Research Journal

Published by

Shahadat-e-karbala Mahfil Organizing Committee

Jamiatul Falah Complex, Dampara, Chittagong, Bangladesh.

Muharram 1, 1428, January 21, 2007, Magh 8, 1413

Price : TK. 50.00, US $ 5

শাহাদাতে কারবালা

গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ

মাহ্‌ফিল বর্ষ : ২১

প্রকাশনা বর্ষ : ১ম

সংখ্যা : ১ম

সম্পাদকীয়

মানব সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে মানুষের হিদায়েতের জন্য আল্লাহ্‌ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেন এ দুনিয়ায়। নবী-রাসূলগণ স্ব স্ব জামানায় উম্মতদের হিদায়তের পথ প্রদর্শন করে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ব পালন করেন। খাতিমুন নবীঈন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রূপে আল্লাহ্‌র দ্বীন 'ইসলাম'কে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ইসলামের সুষ্ঠু বিকাশে খোলাফায়ে রাশেদীন যথার্থ ভূমিকা পালন করেন। খেলাফতে রাশেদার পর ইসলামের ইতিহাসে নেমে আসে এক অন্ধকার যুগ। সে নাজুক পরিস্থিতিতে ইসলামের শাশ্বত আদর্শ সমুন্নতকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাসূলে করীম (দ.) এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)। ইসলামের মৌল নীতি-আদর্শ বিকশিতকরণের এক পর্যায়ে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার আপোষহীন জিহাদে তিনি সপরিবারে কারবালার প্রান্তরে পাষণ্ড ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ইসলামের জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়। নবীজীর সাজানো ইসলামের বাগানকে সুশোভিত করতে নবী দৌহিত্রের সপরিবার আত্মত্যাগ বিশ্ব ইতিহাসে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমুজ্জ্বল থাকবে। ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাত সম্পর্কে অলীকুল সম্রাট হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রাহ্‌.) যথার্থ বলেছেন : 'দ্বীন আস্ত হুসাইন দ্বীনে পানা আস্ত হুসাইন'। অর্থাৎ দ্বীন মানেই ইমাম হুসাইন, আর দ্বীনের সুরক্ষা হয়েছে ইমাম হুসাইনের নিকট। তাই প্রতিটি মু'মিন মুসলমানকে ঈমানের পূর্ণতার জন্য ইমাম হুসাইন তথা আহলে বায়তে রাসূলকে ভালবাসতে হয়।

স্মরণ রাখতে হবে, আহলে বায়তে রাসূল-এর ভালবাসা চরিতার্থ করতে ইসলামের ত্রাণকর্তা প্রথম খলীফা হযরত সৈয়্যদানা আবু বকর সিদ্দীক্ব (রা.) ও ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ফারূক্বে আযম হযরত সৈয়্যদানা উমর (রা.) কে কিছুতেই অবহেলা করা যাবে না। "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতিমাতুজ্‌ জাহ্‌রা (রা.), হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)"-এ 'পাক পঞ্জতন' এর অন্যতম, ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত সৈয়্যদানা আলী (রা.) এর ভালবাসা প্রদর্শন করতে কাতিবে ওহী সৈয়্যদানা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) কে অসম্মান করা যাবে না।

পাকপঞ্জতন, কারবালা ট্র্যাজেডী, কারবালায় ইমাম হুসাইন (রা.) এর সপরিবার আত্মত্যাগ ও ইসলামের মৌল আদর্শের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার মহান লক্ষ্যে 'শাহাদাতে কারবালা মাহ্‌ফিল' এর প্রবর্তন। মাহ্‌ফিল পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কারবালার প্রেক্ষাপট ও এর যথার্থ ইতিহাস চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণসহ এর শিক্ষা ও আদর্শে সমাজবাসীকে উজ্জীবিত করে আসছে।

১৯৮৬ সালে জমিয়তুল ফালাহ্‌ মসজিদে পহেলা মুহাররাম হতে ১০ই মুহাররাম পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী এ মাহ্‌ফিলের মাধ্যমে চট্টগ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম 'শাহাদাতে কারবালা মাহ্‌ফিল' এর সূচনা হয়। আল্লাহ্‌পাক তাঁর হাবীবে পাকের প্রিয় দৌহিত্রের পরম আত্মত্যাগের বিশদ বর্ণনার মাহ্‌ফিলটি কবুল করায় আজ চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'শাহাদাতে কারবালা মাহ্‌ফিল' অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখে আমরা আল্লাহ্‌পাকের শুকরিয়া আদায় করছি।

এবারে ২১তম মাহ্‌ফিল উপলক্ষে 'শাহাদাতে কারবালা স্মারক' প্রকাশ করে পাঠক সমাজে উপস্থাপন করতে পেরে আল্লাহ্‌পাক এর আলীশান দরবারে বেহদ শুকরিয়া আদায় করছি।

১ মুহার্‌রাম ১৪২৮
২১ জানুয়ারী ২০০৭
৮ মাঘ ১৪১৩

প্রকাশনা
শাহাদাতে কারবালা মাহ্‌ফিল
পরিচালনা পরিষদ
জমিয়াতুল ফালাহ্‌ কমপ্লেক্স
দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

শাহাদাতে কারবালা

গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ ২০০৭
মাহফিল বর্ষ : ২১, প্রকাশনা বর্ষ : ১ম, সংখ্যা : ১ম

সূচিপত্র

- প্রসঙ্গ : শাহাদাতে কারবালা মাহ্ফিল - ৫ - ৬
  আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল্ ক্বাদেরী
- ঐতিহাসিক আশুরা দিবস : একটি পর্যালোচনা - ৭ - ১০
  ড. মোহাম্মদ আব্দুল অদুদ
- আশুরার দীপ্ত আক্বীদাহ্ - ১১ - ১৩
  ড. আব্দুল্লাহ্ আল্ মারুফ
- কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা ও এর অন্তঃসলীলা ফল্গুধারা - ১৫ - ১৮
  এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী
- ইয়াজিদ প্রসংগ - ১৯ - ৩৪
  মুফতী মোহাম্মদ আব্দুন নূর চৌধুরী
- হযরত মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মধ্যে মতানৈক্য ও ইসলামের দৃষ্টিকোণে এর সমাধান - ৩৫ - ৪৪
  মুফতী সৈয়াদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান
- শিয়া সম্প্রদায় - ৪৫ - ৫৭
  মাওলানা কাযী মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন আশরাফী
- ৭২ ফেরকা পরিচয় - ৫৯ - ৭৪
  মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্
- রক্তাক্ত কারবালা - ৭৫ - ৮১
  মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান
- খারিজী ও রাফিজী মতবাদ : একটি পর্যালোচনা - ৮৩ - ৮৮
  মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী
- বুস্তানে রিসালতের কুসুম কলি : আর ফুটন্ত দুটি পুষ্পের কথা - ৮৯ - ৯৫
  মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
- রাজনীতি নয় দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কারবালার সংঘাত - ৯৭ - ১০০
  সৈয়দ আহমদুল হক
- মাওলা আলী ও মা ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা - ১০১ - ১০৬
  মাওলানা মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন আজহারী
- আহ্লে বায়তে রাসূল (দ.) এর মর্যাদা - ১০৭ - ১১৩
  মাওলানা মুহাম্মদ শাফেয়া খান
- সংকটাপন্ন মুসলিম বিশ্ব ও কারবালার শিক্ষা - ১১৫ - ১২৪
  মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিম
- হিরন্ময় যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা - ১২৫ - ১২৭
  অধ্যাপক নূ.ক.ম. আকবর হোসেন
- শাহাদাতে কারবালা মাহ্ফিল পরিচালনা পরিষদ - ১২৯ - ১৩২

প্রসঙ্গ : শাহাদাতে কারবালা মাহ্ফিল

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল্ ক্বাদেরী*

চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম ইসলামাবাদ। প্রাকৃতিক নৈসর্গিক এ অঞ্চলে যুগে যুগে অনেক অলী বুযুর্গ আগমন করেন। আরবের বিভিন্ন স্থান ও পারস্য থেকে অনেক বণিক ও ধর্ম প্রচারকগণও আগমন করেন এ নগরে। তাদের ব্যবহৃত ও প্রচলিত কিছু শব্দ এ দেশের আঞ্চলিক ভাষায় স্থান পায়। অনেক স্থানের নামকরণও হয় তাদের ব্যবহৃত শব্দে এবং তাঁদের নামানুসারে। কদম মুবারক, শুলক বহর (শহরে যাওয়ার রাস্তা), হালিশহর (শহরের চারপাশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ঐতিহ্য ও স্মৃতি আমাদের গৌরবান্বিত করে। এ অঞ্চলের প্রাচীন-নতুন ইসলামী নিদর্শন সাধারণ মানুষকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। হযরত বায়েজিদ বুস্তামীর আস্তানা পাক, কদম মুবারক, হযরত আমানত শাহ্ (রাহ্.) এর দরগাহ্, হযরত বদর শাহ্ (রাহ্.) এর দরগাহ্ ও চাটিসহ নতুন নিদর্শনের মধ্যে কুতবুল আউলিয়া হযরত শাহ্সূফী আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রাহ্.) এর আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ এবং জমিয়াতুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ ইত্যাদি ধর্মপরায়ণ মানুষের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছে। এ জমিয়াতুল ফালাহ্ মসজিদের খতীব হিসেবে এতদঞ্চলের মুসলমানদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। সে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের তাগিদে শতধা বিভক্ত মুসলমানদের হেদায়েত তথা সত্যের পথ দেখানো আমার অভীষ্ট লক্ষ্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথ 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' তথা সিরাতে মুস্তাকীমের প্রতি মুসলমানদের আহ্বান করা এবং আল্লাহ্র নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের পথে আহ্বান করাই আমার এ প্রয়াস।

আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তাগুতি শক্তির কাছে আজ মুসলমানদের নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পন বিবেকবান মানুষকে তাড়িত করছে। সারাবিশ্বে ইহুদী-নাসারাদের নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও তাদের বিছানো জালে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মুসলমানরা ধুঁকে ধুঁকে মরছে। যে বা যারা আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার বা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাতে তৎপর, তাদের বিরুদ্ধে নির্মম নির্যাতন ও নিপীড়নের স্টীম রোলার চলছে। ক্ষেত্রবিশেষে গুপ্তহত্যা ও গণহত্যায় নিঃশেষ করে দিচ্ছে বিশ্বের প্রতিবাদী মুসলমানদের। তাগুতি শক্তি প্রয়োগকারীরা জানে, শত নির্যাতন করেও প্রকৃত মুসলমানদের ঈমান বিনষ্ট করা সম্ভব নয়। তাই তারা মুসলমানদের ঈমান হননের জন্য বেছে নিয়েছে বিভিন্ন কূটকৌশল। নারী ও ধন-সম্পদের লোভসহ নানাবিধ কৌশলের মাধ্যমে কিছু নামধারী মুসলমানকে ব্যবহার করে যুগে যুগে সাধারণ মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করার ঘটনা ইতিহাস স্বীকৃত। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে নবী করীম (দ.) ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ্র কসম! তোমরা শিরক করবে এ ভয় আমি করি না, কিন্তু তোমাদের দুনিয়াপ্রীতিই আমার ভয়'। বর্তমানে মুসলমানদের একটি বড় অংশকে পার্থিব লোভ-লালসা চরিতার্থ করার হীন মানসিকতা নিয়ে দৌড়তে দেখে নবী করীম (দ.) এর এই হাদীসটি মনের অলিন্দে বার বার ভেসে ওঠে।

দুনিয়ার লোভ-লালসা হতে বিরত হয়ে সঠিক মত ও সরল পথে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য দয়াল নবী (দ.) উম্মতের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিষ রেখে যাচ্ছি, তোমরা তা আঁকড়িয়ে ধরলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র বাণী কুরআন মজীদ, অপরটি আমার বংশধর তথা আহলে বায়ত'। অপর এক হাদীসে নবী করীম (দ.) ইরশাদ করেন, 'আমার আহলে বায়ত হল নূহ্ (আ.) এর কিস্তির ন্যায়। যে সেখানে আরোহন করবে সে নাজাত পাবে, আর যে আরোহন করবে না, সে ডুবে মরবে'। আহলে বায়তের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতখানি তা আমরা একটি ঘটনাতে দেখতে পাই, আর তা হল- একদা নবী করীম (দ.) চাদরের আঁচল প্রশস্ত করে তাতে রাসূলে পাকসহ হযরত আলী (রা.), হযরত মা ফাতিমা (রা.), হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বসে পড়লেন এবং আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে বললেন, 'হে আল্লাহ্, আমার আহলে বায়তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, যেমন আমি তাদের উপর সন্তুষ্ট আছি।' তাই যুগে যুগে সত্যিকার উলামায়ে কেরাম আহলে বায়তে রাসূল (দ.) সম্পর্কে সমাজবাসীকে নানাভাবে অবহিত ও সতর্ক করে আসছেন। মুমিন বান্দারা তাঁদের শানে কিতাব লিখে, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করে, সভা সমাবেশ ও সেমিনার-সেম্পোজিয়ামের মাধ্যমে আহলে বায়তে রাসূলের (দ.) শান, মান-মর্যাদা প্রতিফলনে ভূমিকা রেখে আসছেন। হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাত ইসলামের মূল 'টার্নিং-পয়েন্ট' হিসেবে বিবেচিত। তাই বলা হয়ে থাকে- 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কি বাদ'।

বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রামে অবস্থিত জমিয়াতুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদে বিগত ২০ বছর ধরে শাহাদাতে কারবালা মাহ্ফিলের আয়োজন করে পাক-পঞ্জতন বিশেষতঃ সৈয়্যদুশ্ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাত বিষয়ে বিষদ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১লা মুহাররাম থেকে ১০ মুহাররাম পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মাহ্ফিলের মাধ্যমে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে আশুরা দিবসের মাহাত্ম্য উপস্থাপনের ব্যবস্থা করি। আল্লাহ্পাকের দরবারে মাহফিলটি কবুল হওয়ায় বর্তমানে চট্টগ্রামসহ দেশের সুন্নী মুসলমানদেরকে নানাভাবে এ মাহ্ফিল উদ্যাপন করতে দেখে আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এ মাহফিলের বাস্তবায়নে দেশের প্রসিদ্ধ ও হাক্কানী পীর-মাশায়িখ, আলিমে দ্বীন, ইসলামী চিন্তাবিদ, ইতিহাসবিদ ও গবেষকসহ জ্ঞানী-গুণীদের পরামর্শ, উৎসাহ ও বিত্তশালী মহৎ ব্যক্তিদের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকসহ নানাভাবে আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে আসছি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। আমরা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের রূহের মাগফিরাত ও রাফ্য়ে দারাজাত কামনা করছি। আর যাঁরা এখনো এ মহৎ প্রয়াসে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁদের সার্বিক উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করছি। মহান পাকপঞ্জতন ও আহলে বায়তের শানে ধারাবাহিকভাবে আমাদের এ প্রয়াস অব্যাহত রাখতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর শাহী দরবারে ফরিয়াদ করছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকল কর্মকাণ্ড কবুল করুন। আমীন, বেহুরমতে সৈয়্যাদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাহ্বিহী ওয়াসাল্লাম।

---

* সভাপতি, শাহাদাতে কারবালা মাহ্ফিল পরিচালনা কমিটি
খতীব, জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

ঐতিহাসিক আ-শুরা দিবস ঃ একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ*

আশুরা (عاشوراء) আরবী শব্দ। এটা আশারুন (عشر) শব্দ থেকে উদ্ভূত। প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ আল্লামা তীবী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- মুহররম মাসের দশম তারিখটিই ইতিহাসে আশুরা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মানব জাতির ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে এ দিবসের একটি তাৎপর্য ও গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী শরী'আত নির্ধারিত ত্রিশ রোযা ফরয হওয়ার পূর্ব হতেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আশুরার রোযা রাখতেন এবং সাহাবীদেরকেও এ দিবসে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। পরবর্তী কালে রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর আশুরার রোযাকে মুস্তাহাব ঘোষণা করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

عن عائشة رضي الله تعالي عنها قالت كان رسول الله صلي الله عليه و سلم امر بصيام عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام و من شاء افطر(২)

অর্থাৎ হযরত আ'য়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আশুরা দিবসের রোযার নির্দেশ দিতেন, যখন রমযান মাসের রোযা ফরয হলো, তখন বললেন- এবার তোমাদের যার ইচ্ছা এ রোযা রাখতে পার আর যার ইচ্ছা নাও রাখতে পার।

বিশ্বের ইতিহাসে বড় বড় বহু ঘটনা এ আশুরা দিবসেই সংঘটিত হয়েছে। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো এ আশুরা দিবসে এবং তাঁর দেহ মুবারকে প্রাণও সঞ্চার করা হয় এ দিবসে। স্বর্গে বসবাসের নির্দেশ, ফেরেশতাদের দ্বারা তাঁকে সাজদা করানো পরবর্তীকালে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সর্বশেষ যে দিন তার তাওবা কবুল করা হয়েছিলো তা ছিলো এ আশুরারই দিন। এ আশুরা দিবসে হযরত নূহ আলায়হিস সালাম এবং তাঁর অনুগত উম্মতদেরকে তুফান হতে মুক্তি দেয়া হয়েছিলো। হযরত ইদরীস আলায়হিস সালামকে চতুর্থ আসমানের ওপরে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো এ দিবসে। অভিশপ্ত নমরূদের অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান শিখার অভ্যন্তরে ফুলের শয্যা তৈরী করে দেয়া হয়েছিল হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম এর জন্য এ দিবসে। হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালামের কোলের হারানো সন্তান হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালামকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল এ আশুরার দিবসেই। এ দিবসেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম-এর তাওবা কবুল করে বিশ্বের বুকে খিলাফতের দায়িত্বভার তার ওপরেই অর্পন করেছিলেন। হঠাৎ রাজত্ব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার পর হযরত সোলায়মান আলায়হিস সালাম স্বীয় রাজত্ব ফিরে পেয়েছিলেন এ দিবসেই। ফের'আউন ও তার বিশাল সৈন্য বাহিনীর হামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হযরত মুসা আলায়হিস সালামের নীল নদ পার হওয়া এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের আসমানে উত্থিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিলো এ আশুরার দিনেই। এমনকি আমাদের প্রিয় নবী সায়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সর্বোচ্চ মর্যাদার মুকুট পরিধান করে তাকে শাফা'আতে কুবরার মালিকানা প্রদান করা হয়েছিলো এ দিবসে। সর্বশেষ এ দিবসে বিশ্বের সাড়া জাগানো হৃদয়বিদারক যে ঘটনাটি ঘটেছিলো তা হলো- ৬১ হিজরী সনের ঐতিহাসিক কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। এ দিন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র, মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর কলিজার টুকরা, মা ফাতিমার নয়নমনি, সায়্যিদুশ শুহাদা, আহলে বায়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৭২ জন অনুসারীসহ অভিশপ্ত এয়াজিদ ও তার বাহিনীর বিরূদ্ধে জিহাদ করে ইসলামের জন্য শাহাদতের সুধা পান করেন এবং এ মহাদুর্যোগের হাত থেকে বিশ্বের মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করেন।

ইবলিশ, শয়তান ও সেইসব অপশক্তির নেপথ্য নায়ক থেকে শুরু করে প্রকাশ্য নমরূদ, ফের'আউন, হামান, আবু জেহেলদের লেলিয়ে দেয়া বাহিনী তাদের মিশন সত্যের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও শেষ পর্যন্ত চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর দ্বীন-ধর্মকে বরাবরই রক্ষা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় এয়াজিদ যখন ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও দর্শনকে বিকৃত করে নতুন ধর্মের নামে জগাখিচুড়ি এক নতুন মতবাদের দর্শন মুসলিম মিল্লাতের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে তখনই ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রতিবাদী কণ্ঠে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে বাতিলের বিরূদ্ধে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন এবং ইসলামের শাশ্বত বিধানকে সমুন্নত রাখতে সেদিন কারবালার ময়দানে নির্মমভাবে শত্রুদের হাতে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

শাহাদত বরণ করেন। সেদিনকার কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা অতীতের সকল ঘটনা-দূর্ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে। ইতিহাসে এ ঘটনাটি চিরমর্মান্তিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, আশুরার দিবস তাই, যেদিন মহান আল্লাহ্ তাঁর বড় বড় নবীদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষায় অবতীর্ণ ও উত্তীর্ণ করেছেন- হযরত ইউনুস আলায়হিস সালামকে মাছের পেট থেকে বের করেছিলেন এ দিবসে। আর বনী ইসরাঈলের জন্য নদীর বুকে রাস্তা করে দিয়েছিলেন তাও এ দিবসে। এ দিবসে যদি কেউ রোযা রাখে তার চল্লিশ বছরের পাপ মাফ হয়ে যাবে। আর আশুরার রাত্রে যে ব্যক্তি ইবাদত করবে সে যেন সপ্ত আসমানবাসীদের সমান ইবাদত করলো।[৩]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ দিবসে রোযা রাখার বিধান ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي ﷺ المدينة فراي اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجي الله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسي قال فانا احق بموسي منكم فصامه و امر بصيامه [৪]

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীরা আশুরার দিবসে রোযা পালন করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তারা বললো, এটা উত্তম দিবস, এ দিন আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তাই এ দিবসে হযরত মূসা আলায়হিস সালাম রোযা পালন করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি মূসা আলায়হিস সালাম এর জন্য তোমাদের চাইতে আরও নিকটে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেও রোযা রাখলেন এবং অন্যান্যদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

আল্লাহ্র দরবারে আশুরা দিবসের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, আসমান-যমীন, লৌহ-কলম ও আদম-হাওয়াকে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তিনি এ দিবসকেই পছন্দ করেছেন। এ দিবসেই কিয়ামত সংঘটিত হবে বলে অসংখ্য হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লামা কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- জুম'আর দিবসের অপরাহ্নে কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৫] আল্লামা নাসাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন- জনৈক ব্যক্তি কাফিরদের হাতে বন্দী হয়ে নির্যাতিত জীবন-যাপন করছিলো। আশুরার দিবস আসলে সে কৌশলে তাদের হাত ফসকে বেরিয়ে পড়লে সাথে সাথে কাফির কারারক্ষীরা চতুর্দিকে তার সন্ধানে ছুটে পড়লো। এ দিকে লোকটি অবস্থা বেগতিক দেখে মহান আল্লাহ্র দরবারে আবেদন করলো- হে আল্লাহ্! আজ আশুরার দিবস। এ দিবস তোমার কাছে অনেক প্রিয়, এ দিবসের সম্মানে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। লোকটির দু'আ আল্লাহ্র দরবারে কবুল হলো। আর মহান আল্লাহ্ কাফির পাহারাদার সবাইকে অন্ধ করে দিলেন। এদিকে লোকটি তাদের সবার সামনে বেরিয়ে গেলো। পাহারাদাররা কেউ তাকে দেখতেই পেলো না। এভাবে মহান আল্লাহ্ তার বান্দাকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি পাওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ লোকটি রোযা পালন করলেন। কিন্তু ইফতারির সময় কোন খাবারের ব্যবস্থা হলো না। তিনি হতাশচিত্তে শুয়ে পড়লেন। গভীর ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলো, একজন নূরানী ফেরেশতা তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। আর সে সেখান থেকে তৃপ্তি সহকারে পানাহার করে জাগ্রত হয়ে দেখলো যে, সত্যি সে পরিতৃপ্ত। এমনকি ঐ দিবসের পর সে আরও বিশ বছর জীবিত ছিলো। যতদিন জীবিত ছিলো ততদিন একবারের জন্যও আর খাবারের প্রয়োজন হয়নি।[৬]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

من صام يوم عاشوراء من المحرم اعطي ثواب عشرة الاف ملك [৭]

অর্থাৎ যে মুহররম মাসের আশুরা দিবসে রোযা রাখে তাকে দশ হাজার ফেরেশতার সাওয়াব প্রদান করা হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

ومن افطر مومنا ليلة عاشوراء كانما افطر عنده جميع امة محمد ﷺ و اشبع بطونهم [৮]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশুরার দিনে কোন রোযাদার মুমিনকে ইফতার করাবে, সে যেন সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীকে ইফতার করালো। অপর আরও একটি হাদীছে দেখা যায় যে, আশুরার দিবসে কেউ যদি কোন রোগীর সেবা করে সে যেন সমস্ত মানব জাতির সেবা করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি সহানুভূতির সঙ্গে নিজ হাত দ্বারা ইয়াতীমের মাথার ওপর মালিশ করবে, মহান আল্লাহ্ ঐ ইয়াতীমের মাথার চুলের সমপরিমাণ সংখ্যক সাওয়াব দান করবেন।[৯]

মুহররম মাসের আশুরার দিনটি বহু সম্মানিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ তারিখের ইবাদত-বন্দেগীর বিশেষ ফযীলত ও উপকারিতা রয়েছে।

এ দিবসের নফল নামাযের ফযীলত সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আশুরার তারিখে দুই দুই রাকআতের নিয়তে নফল নামাজ পড়ে এবং প্রতি রাকআতে সূরা ফাতেহার সাথে একবার সূরা আল যিলযাল, একবার সূরা কাফিরূন এবং একবার সূরা ইখলাস পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের দিনে তাকে বিপদ মুক্ত করবেন।[১০]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আশুরার রাত্রে সুবহি সাদিকের পূর্বাহ্নে চার রাক'আত নফল নামায নিম্নোক্ত নিয়মে পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তার যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং বহু সাওয়াবের অধিকারী করবেন, আর লোকটি বেহেশ্তের মধ্যে যাবতীয় নি'মাতের হকদার হবেন। নামাযের নিয়ম হলো- প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। নামায শেষে একবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে।[১১]

'তুহফায়ে ইয়ামানী' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, আশুরার রাত্রে যে ব্যক্তি চার রাক'আত নফল নামায আদায় করে এবং প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে পাঁচবার করে সূরা ইখলাস পাঠ করে, তার প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়, যা অনেকের নসীব হয় না।[১২]

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, মহান আল্লাহ্ বনী ইসরাইলের প্রতি সারা বছরে মাত্র একটি রোযা ফরয করেছিলেন আর সেই রোযার দিনটি হলো- আশুরার দিন। অর্থাৎ মুহররমের দশ তারিখ। সুতরাং এদিনে যে রোযা রাখবে, মহান আল্লাহ্ তার রুযি-রোযগারে যথেষ্ট বরকত দান করবেন এবং ঐ একদিনের রোযা রোযাদারের চল্লিশ বছরের গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যাবে।[১৩]

একটি বর্ণনায় একটি ঘটনা সম্পর্কে জানা যায় যে, ইরাকের রায় শহরে জনৈক বিচারকের কাছে এক ভিক্ষুক আশুরার দিন হাযির হয়ে ঐ দিনের সম্মানের উসীলা দিয়ে কিছু আবেদন করলে বিচারক কিছুটা বিরক্ত চেহরায় অন্যদিকে ফিরে গেলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী এক খ্রিষ্টান বিষয়টি লক্ষ্য করে ভিক্ষুককে তার কাছে ডেকে নিয়ে কিছু দিলেন, এতে ভিক্ষুক খুশী হয়ে চলে গেলেন। দিন গড়িয়ে রাত আসলো। আপন-আপন বাসস্থানে সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। বিচারক স্বপ্নে দেখতে পেলেন বেহেশতে স্বর্ণ ও লাল পাথরের গাঁথুনী দ্বারা নির্মিত চিত্তাকর্ষক দৃষ্টির বাড়ীর সামনে সে ঘুরা-ফেরা করছে। বিচারক জানতে চাইলেন এ বাড়ীগুলো কাদের? উত্তরে বলা হলো, এ সুদর্শন ও সুরম্য বালাখানা তোমাদের জন্যই ছিলো; কিন্তু একজন সাধারণ ভিক্ষুক তোমার কাছে হাত পাতলে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ আর সে সুযোগটা গ্রহণ করলো একজন খ্রিষ্টান মানুষ। তাই বেহেশ্তের এ দু'টি বালাখানা ঐ খ্রিষ্টান ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত হয়ে গেলো, ঘুম ভেঙ্গে গেলো। কাউকে কিছু না বলেই চুপে চুপে বিচারক (কাযী সাহেব) ঐ খ্রিষ্টান ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে হাযির হলেন, এবং আবেদন করলেন, ভাই! তুমি গতকাল ফকীর লোকটাকে দানের বিনিময়ে যে পুরস্কার লাভ করেছ তা আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমি তোমাকে এক লাখ দিরহাম দেবো। জবাবে খ্রিষ্টান লোকটি বললো, আপনি বেহেশতের এ দুটি বালাখানার দরজার চৌকটের বিনিময়ে এক লাখ দেরহাম দিলেও আমি আপনার কাছে তা বিক্রয় করবো না। বরং শুনে নিন ; আমি বিধর্মী ছিলাম। আশুরার দিবসে দান-সাদকা করার কারণে এমনকি এর ফযীলত দেখে সত্যিই আমার ভিতরে পরিবর্তন এসেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র সত্য নবী ও রাসূল। এভাবে কালিমা তায়্যিবা পাঠ করে খ্রিষ্টান লোকটি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে চিরস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করলেন।[১৪]

'রাওয়াতুল আফ্কার' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি আশুরার দিন সাত দিরহাম দান করে ঐ দিন থেকে তার বিনিময় পাওয়ার অপেক্ষায় রীতিমত অপেক্ষমান। এভাবে পরের বছর যখন আশুরার দিন পুনরায় আসলো, কোন এক ব্যক্তিকে আশুরার দিবসে দান সাদকার বর্ণনা করতে শুনে পূর্ববর্তী ব্যক্তি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো, বর্ণনাকারী বলছিলো, যে ব্যক্তি আশুরার দিন এক দিরহাম দান করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এক হাজার দিরহাম দান করবেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি এবার প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে উঠলো। সব মিথ্যা, সব ভুল। আমি কবে সেই এক বছর আগেই সাত দিরহাম দান করে দেখেছি। আজ পর্যন্ত কোন লাভ পেলাম না। এমনকি কোন আলামতও নেই। সুবহানাল্লাহ! ঐ রাতেই একব্যক্তি সাত হাজার দিরহাম নিয়ে তার সামনে হাযির করে দিয়ে বললেন, এ তো সামান্য বস্তু। তবে তুমি হৈ চৈ না করে যদি কিয়ামত পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে পারতে, তাহলে আরও অনেক ভাল হতো।[১৫]

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সৃষ্টির শুরু থেকে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যসহ ঘটনা এ আশুরার দিবসেই ঘটেছে। এমনকি আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রথম শাদী মুবারক হযরত খাদিযাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই উদযাপন করেন এ আশুরা দিবসেই। এসব

দিক বিচারে আশুরার দিবস নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য আনন্দ ও খুশী উদযাপনের দিবস, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিবস। কিন্তু ৬১ হিজরীর কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা বিশ্বের সত্যানুসারী ও সত্যাশ্রয়ী মুসলমানদের শোক-সাগরে নিমজ্জিত করে। কারবালার এ মর্মান্তিক ঘটনা থেকে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন,

১. ধর্মীয় ঐতিহাসিক দিবস পালন করা মুসলমানদের জন্য করনীয় বিষয়াদির অন্তর্ভূক্ত।

২. কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনা মুসলমানদের জন্য সত্যের পথে অটল থাকার ক্ষেত্রে একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

৩. দ্বীনী আদর্শ রক্ষার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইসলামী করণীয় কার্যাদির অন্তর্ভূক্ত।

৪. অনেকেই মনে করেন যে, হযরত আমীর মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদকে ক্ষমতা দিয়ে ভুল করেছেন। এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক সাহাবীই একেকজন মুজতাহিদ ও গবেষক। রাজনৈতিক ইজতিহাদ ও গবেষণায় এটা তার ভুল ছিলো না। কারণ তাঁরা ইজতিহাদ করলেই সাওয়াবের যোগ্য হতেন।

৫. অযোগ্য ও ধর্মহীন লোক ক্ষমতায় গেলে তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়। কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়ে ইয়াজিদের অপচরিত্রের উন্মোচন হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যোগ্য, ধার্মিক, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

৬. হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হলেন আলে বায়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তাঁদের প্রতি অসম্মান ও বিরুদ্ধাচার নামান্তরে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং শরী'আতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতিই অসম্মান, বিরুদ্ধাচারন ও অস্বীকার।

৭. ইয়াজিদের শাসন ব্যবস্থা ছিলো আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের আদর্শের পরিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির। এ ধরণের শাসন ব্যবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয়না। ফলে ইয়াজিদের ধ্যান-ধারনা মিশ্রিত উমাইয়া শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

৮. মানুষের সবচেয়ে বেশী প্রিয় বস্তু হলো তার প্রাণ। হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কারবালার ময়দানে ইসলামের জন্য শাহাদতের সুধা পান করে মুসলিম মিল্লাতকে সর্বোচ্চ ত্যাগের শিক্ষা দিয়েছেন।

৯. সাধারণ দিবসের ইবাদত ও দান-সাদকার যে প্রতিদান পাওয়া যায়, ধর্মীয় ও ইসলামের ঐতিহাসিক দিবসে ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রতিদান তার চেয়ে বেশী হয়।

১০. ঐতিহাসিক আশুরা দিবস ও ঐতিহাসিক কারবালার ঘটনার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো অন্যায়ের প্রতি মাথা নত না করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং আল্লাহ্‌র নি'মাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা মুসলিম মিল্লাতের প্রতিবাদ ও শোকের দাবানল জ্বলে উঠে। কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইনের সেই আত্মত্যাগ মুসলিম উম্মাহ্‌র ঈমানী তেজ ও শক্তি দীপ্তবলে দিন দিন বলিয়ান হচ্ছে। তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিদ্রোহের দাবানল এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আর শোক নয়; বরং শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদের মধ্যকার একটা সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করা এখন সময়ের দাবী। কেবল মুর্সিয়া-মাতম করলে আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়; বরং ত্যাগের মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শের আলোকে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে সুন্নী দর্শন ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই হবে বিশ্ব মুসলিমের মূলদাবী।

তথ্যনির্দেশ :

১. মুল্লা আলী কারী (রা.) মিরকাত আল মাফাতীহ শরহ মিশকাত আল মাসাবীহ (পাকিস্তান: মাকতাবা ইমদাদিয়া, মুলতান, তাবি), পৃ. ২৮৬।
২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, সহীহ আল বুখারী (ভারত: মাকতাবা মুস্তাফাবী, ইউপি, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮।
৩. উদ্ধৃত, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, মা-সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ।
৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮।
৫. উদ্ধৃত, আবদুর রহমান আল সাফুরী, নাযহাতুল মাজালিস, অনুদিত, (পাকিস্তান, ইসলামিক পাবলিশার্স, লাহোর, তাবি) ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৮।
৬. আবদুর রহমান. আল সাফুরী, নাযহাতুল মাজালিস, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত, মাজহার উদ্দীন, বার চান্দের ফজীলত, (ঢাকা: সোলায়মানিয়া বুক হাউজ, তাবি), পৃ. ২২।
৮. প্রাগুক্ত পৃ. ২৩।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
১১. উদ্ধৃত, তাযকিরাতুল আওয়াদ: মাজহার উদ্দীন, প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
১৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত পৃ. ২২।
১৪. আবদুর রহমান আল সাফুরী, নাযহাতুল মাজালিস প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮।
১৫. আবদুর রহমান আল সাফুরী, নাযহাতুল মাজালিস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯-৬০০।

আশুরার দীপ্ত আক্বীদাহ্‌

ড. আব্দুল্লাহ্‌ আল্‌ মারুফ*

মানব সভ্যতার চড়াই-উৎরাই আর টার্নিং পয়েন্টে আশুরা এক রেড লেটার ডে। সভ্যতার মোড় ঘুরেছে অথবা নতুন বাঁক নিয়েছে তো সেখানেই দেখি আশুরা উপস্থিত। সবগুলো আশুরাই ছিল বিজয়ের দিন, মুক্তির দিন, সৃষ্টিশীলতার আনন্দঘন খুশি-উতরোল রঙিন দিন।

কেবল শাহাদাতে কারবালার আশুরা আঁস ঝরায়। শাহাদাতের লাল খুনে এই তারিখের হরফগুলো লাল হয়ে আছে ক্যালেন্ডারের পাতায়। এ দিনটিও বিজয়ের, তাই আনন্দের। কবি নজরুল তাই বলে গেছেন- "শহীদী ঈদের সেনারা সাজ। ইসলাম ফের জিন্দা হয়েছিল এই দিন-কারবালার মরু প্রান্তরে। সত্যের বিজয় হয়েছিল এই দিন ফুরাতের তীরে। এই দিনের খোশখবর দিয়ে গিয়েছিলেন নানাজান তাঁর প্রিয় নাতিকে। মা ফাতেমা ও আলী মুরতাদা এ দিনে বেখবর ছিলেন না। মানব সভ্যতাকে সত্যনিষ্ঠার অবিনশ্বর আদর্শ উপহার দিয়েছে তাঁদের সন্তান তাই তাঁরা খুশি।

কেবল আমাদের চোখে পানি। আমাদের বুকে শোকের মাতম। আমাদের হৃদয়ে প্রতিদিন অনুরনিত হয় আকুল আহাজারী। আমরা খুশি হতে পারি না। কারন, আহলে বাইত আর কত ত্যাগ করবে। মহান আল্লাহর এত প্রিয়, মহান রাসূলের এত আদরের, বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ মুসলিম নামধারীদের হাতেই নির্মমভাবে নিহত হবেন, এ তো সহ্য করা যায় না।

আমাদের চোখে ভেসে উঠে ইরাকের লালচে মাটি। ভেসে ওঠে উষর ধূসর মরু বিয়াবান। পায়ের নিচে গরম বালুরাশি। মাথার ওপর তেজদীপ্ত সূর্য। মরুভূমির মাঝখানে কতগুলো তাঁবু খাটানো আছে। এর মধ্যে নারী-পুরুষ, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তিসহ ৭২ জন লোক। এদের নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় দৌহিত্র সাইয়েদ হোসাইন (রা.)। কিছু দূর দিয়ে ফুরাত নদী বয়ে গেছে। কিন্তু নবীজীর পরিবার পরিজন এ পানি পান করতে পারবেন না। শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধ নেই। মা পানি খেতে পারছেন না। শিশু আর্তনাদ করছে। সেই কান্না ছড়িয়ে পড়ছে দিগন্ত বিসারী মরুমাঠে। কাফেলার উট, ঘোড়া ও অন্যান্য পশুগুলোও তৃষ্ণা মেটাতে না পেরে অস্থিরভাবে পায়ের খুর দিয়ে জমিনে আঘাত করছে। হায়রে! যে নবী হচ্ছেন সকল জগতের রহমত। তাঁর বংশধরগণ আজ এক ঢোক পানি পান করার রহমত হতে বঞ্চিত। মানুষ নামক ওই প্রাণীগুলোর দিলে এতটুকু রহমত নেই!

একটু আপস করলেই আর সমস্যা হতো না। কিন্তু ইমাম হুসাইন যদি আপস করেন তাহলে ন্যায় ও সত্যের বাণী কেয়ামত পর্যন্ত কেঁদে ফিরত। তিনি অবিচল থেকেছেন। তাই তাঁকে করতে হলো সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ। কী নিদারুন সেই দৃশ্য। একজন সিমার বসে আছে বালুর ওপর চিৎ হয়ে শোয়া নবীশ্রেষ্ঠের নাতির বুকে; সে এখনই তাঁর গলায় ছুরি চালাবে। এ দৃশ্য কি কোন নবীপ্রেমিক সহ্য করতে পারে? পারে না। আর তাই কান্নার রোল ওঠে হেজাযে, কান্নার রোল ওঠে ইরানে, ইরাকে। কাঁদে বাংলাদেশের মুসলমান। কাঁদে সারা বিশ্ব। কাঁদে আল্লাহর কুল মাখ্‌লুক।

এ আশুরা সে আশুরা নয়। এ আশুরা একটি তারিখে বিলীন ইতিহাসের আটপৌরে শাড়ি নয়। এটি কোনকালের কোন বিবর্ণ জীর্ণ শীর্ণ জমির দলিল নয়। এ আশুরা নিয়ত নয়নে বারি ঝরায়, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করে। তবে মুহাররম মাসের দশ তারিখে চোখের নদীতে বান ডাকে আর কলিজার রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হয়।

শাহাদাতে কারবালার ঘটনা বিখ্যাত সব ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই শোকাবহ ঘটনা কেবল কিছুকাল মাতম করেই হারিয়ে যায়নি। কারন, এ ছিল তখনকার গোটা পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক ঘটনাও বটে। কিস্‌রা-কায়সার তথা ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো রূপকথার ড্রাগনের মত নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে নতুন বিশ্বশক্তি ইসলামকে তথা মুসলিম খলিফাদের অবস্থা ও অবস্থানকে অনুসরন করে যাচ্ছিল। তাই নানান মাধ্যমে এই বিয়োগান্ত ঘটনার রেকর্ড রয়ে গেছে সারা বিশ্বে।

কিন্তু যে সকল ইতিহাস লেখক রাজাদের মালোহারা ও ভাতার ওপর জীবন ধারন করে ইতিহাস লিখেছেন, তারা আর যা-ই লিখুন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণকারী শহীদ হোসাইন (রাঃ) এর আত্মত্যাগের কথা সঠিকভাবে লিখতে পারেননি। তারা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চেয়েছেন, সাইয়েদ হুসাইন (রাঃ) রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পথে না গিয়ে একগুয়েমি করে কুফার দিকে অগ্রসর হন। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টাদের কথা ঠেলে তিনি ইরাকের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন।

তারা ইতিহাসের কিতাবগুলোতে এও লিখেছেন যে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে খলীফা মুআবিয়ার সিদ্ধান্ত অনুসারে ইয়াযীদকে মেনে নেওয়া বাঞ্চনীয় ছিল।

* উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত ওই ঘটনাটির তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে সত্য বের হয়ে আসে যে, ইমাম হোসেন (রাঃ) শান্তিপূর্ণভাবে যোগ্যব্যক্তির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যেই এগুচ্ছিলেন। এমনকি কারবালার ময়দানে তিনি তিনটি অপশন দেন যে, হয় তাঁকে মক্কায় ফিরে যেতে দেওয়া হোক অথবা ইয়াযীদ এর নিকট সরাসরি নিয়ে যাওয়া হোক। অথবা তাকে তুর্কিস্তানের দিকে যেতে দেওয়া হোক। সেখানে তিনি তাদের সাথে আমৃত্যু যুদ্ধ করবেন। (আল-বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া, খন্ড: ৮, পৃ. ১৮৪, ১ম সংস্করন ১৯৩৩, দারুল ফিকর মিসর) কিন্তু স্থানীয় গভর্নর ইবনে যিয়াদ ও তার সেনাদল অধিনায়ক সিমার তাঁর এ প্রস্তাবের কোনটাই মেনে নিল না।

সিমার বিন যিল জাওশান ছিল একজন সাহাবীর ছেলে। (আল বেদায়া ওয়ান্-নেহায়া দ্র.)। (বিষাদ সিন্ধু উপন্যাসে তাকে অগ্নিপূজক বলা হলেও তা সঠিক নয়। মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার তো অমুসলিম হওয়ার কথা নয়।) কিন্তু মুসলিম নামধারী লোকেরা যে আকীদা দুরস্ত না হওয়ার কারনে অমুসলিম থেকে ইসলামের বড় ক্ষতি করতে পারে সে শিক্ষাই হচ্ছে শাহাদাতে কারবালার অন্যতম শিক্ষা।

ইমাম হোসেন (আরবরা হুসাইন উচ্চারণ না করে "হুসেইন" উচ্চারণ করে এবং বাংলাভাষীরা আরও সহজ করে "হোসেন' বলে থাকেন।) রাদিয়াল্লাহু 'আন্হু এ আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, মুসলমান নামধারী হলেও ইয়াযীদের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদ এর বাহিনী বাতিল আকীদার উপর আপস করার জন্য তাঁকে বাধ্য করছেন, তাই তিনি সবচে' কঠিন সময় সন্ধিক্ষণেও প্রাণে বেঁচে যাওয়ার জন্য নিজেকে বাতিল আকীদার কাছে সঁপে দেননি।

এখানেই আকীদার গুরুত্ব। আমাদের দেশে যেসব এলাকায় আকীদার চর্চা কম, সেখানকার মদ্রাসায় পড়ুয়া লোকদেরও কেউ কেউ আকীদা বলতে কিছু আমলকে বুঝে থাকে। আকীদা অর্থ যারা বিশ্বাস বুঝেন, তাদেরও অনেকে আকীদা সম্পর্কে এমন শিথিলতা দেখান যেন এটা এত ভাল করে বোঝার দরকার নেই।

আমাদের দেশের কিছু আলেম, যারা সৌদিআরব থেকে পড়ে এসে ঐ রাজতান্ত্রিক দেশের পয়সায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন, তারা তোতা পাখির মত তাদের বুলি আওড়াতে থাকেন। সৌদিআরব থেকে বিনে পয়সায় পাওয়া পুস্তিকাগুলোতে যা লেখা থাকে তা গোগ্রাসে গিলতে থাকে এ দেশের বহু লোক। এরাই মহররমের দশ তারিখ এলে বলে থাকে যে, এ তারিখটি উদ্‌যাপন করা বিদ্‌আত। কারন, এ দিনটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আহলে বায়ত এর যোগ্য লোকদেরকে বঞ্চিত করে রাজপরিবারগুলো ইসলামের কানেধরা (কর্ণধার) হয়েছে। এ দিনটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের নতজানু অবস্থার জন্য মূলত দায়ী ওই সকল মালেক, শেখ, আমীর, যারা ইসলামের দুষমনদের কথায় চলে। যদি গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকত তাহলে ইসলাম বিশ্বের বিজয়ী আদর্শ ও সবচেয়ে বড় নিয়ামক শক্তি হতো। ইসলামী গণতন্ত্র খুঁজতে হলে ইমাম হোসেন (রাঃ) এর নিকট যেতে হবে। অব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র কোন ইসলাম সম্মত গণতন্ত্র নয়। ইসলামী গণতন্ত্র বজায় থাকলে সেখানে আকীদার পরিচর্যা হয় এবং মানুষ মানবতার অনুকূল পরিবেশে বাস করতে পারে।

আব্রাহামের গণতন্ত্র অনুযায়ী ইয়াযীদের বাহিনীই সত্যপক্ষ ছিল; কারন তারা মাথার হিসাবে বেশি সংখ্যক ছিল। ওই গণতন্ত্রে ৭২ জনের কাফেলা সংখ্যালঘু ছিল। ইসলামী আকীদা মতে, সত্যের পক্ষে অল্প সংখ্যক থাকলেও সেই গ্রহণযোগ্য।

যারা যে কোন ছল চাতুরী করে ক্ষমতার মসনদে বসতে চায় তারা মুহররম এলে বড়জোর একথা বলে যে, আসুন আমরা শোককে শক্তিতে পরিণত করি। 'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।' একথা তো ঠিক। কিন্তু এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু লোক সততা বজায় রাখেনা। নবীর প্রতি যাদের মুহব্বত নেই, নবী পরিবারের প্রতিও তাদের মুহব্বত নেই। মুহব্বত যখন নেই তখন শোকও তাদের মধ্যে নেই। যখন শোকই নেই তখন তা কীভাবে শক্তিতে পরিণত হবে? শোক যার যত বেশি সে তা ততবেশি শক্তিতে পরিণত করতে পারে। এজন্যই নবীর প্রেমিক ছাড়া আশুরার মর্ম বুঝা সম্ভব নয়। নবী প্রেমিক মানে ঐ দিন রসগোল্লা খাওয়া নয়। বরং কবির ভাষায়- "দিতে পারে নিজ খুন প্রেমে নবীর, পৃথিবীতে তার সম নেই কোন বীর।" আশুরায় যদি তেহারী খাওয়ানো হয় তা হচ্ছে যোদ্ধারা ব্যারাকে যে খাবার খায় সে খাবারতুল্য। এখন যে কারবালায় প্রতিদিন মুসলমানদেরকে পাখির মত গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? এ অবস্থার জন্য প্রথম দায়ী হচ্ছে আমাদের আকীদা বিমুখিতা। প্রথম থেকেই যদি আমরা শাহাদাতে কারবালা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইরাক-ইরান যুদ্ধ না করতাম, অকারনে কুয়েত আক্রমন না করতাম এবং ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় ইসলামকে বাদ দিয়ে আরব জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী না হতাম, বরং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির পতাকা তুলে সমবেত হয়ে বিশ্বব্যাপী একই ইসলামী কৌশল গ্রহণ করতাম, তাহলে আমরা বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতাম। ইতিহাসের বড় শিক্ষা হলো-

আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না। কারবালার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আজও যদি আমরা ইয়াযীদের ইসলাম ছেড়ে ইমাম হোসেন এর ইসলাম তথা তাঁর নানাজান সাইয়্যেদুল মুরসালীনের ইসলাম এর রশি আঁকড়ে ধরি, তাহলে বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবে। আমরা মসজিদে আসি-'হাইয়্যা আলাস্-সালাহ্' শুনে। কিন্তু 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' এর জন্য কি করতে হবে তা জানি না। তাই সালাহ্ থাকলেও ফালাহ্ (সাফল্য) নেই। কেবল ভোগ আর ভোগ, ত্যাগের বাণী কারবালায় কাঁদে।

সময়ের চাহিদা অনুসারে দ্বীন ও মিল্লাতের যোগ্য নেতৃত্ব দেবার জন্য নবীপ্রেমিক মুসলমানদের আজ এগিয়ে আসতে হবে। প্রিয়নবী ও তাঁর পবিত্র পরিজনদের চলার পথেই আমাদের চলতে হবে। তবেই আসবে কাঙ্খিত ফালাহ্ ও প্রত্যাশিত শান্তি ও সমৃদ্ধি।

শাহাদাতে কারবালা হোক আমাদের চেতনার মরাগাঙ্গে উদ্দীপনার ভরা জোয়ার। আশুরা হোক আমাদের আকীদার জীবনীশক্তি আবে হায়াত। আমীন।

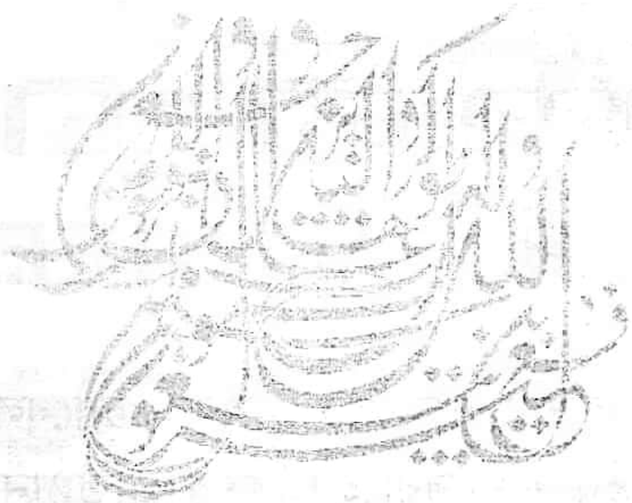

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা ও এর অন্তঃসলীলা ফল্গুধারা

এ কে এম ফজলুর রহমান মুন্‌শী*

'কারব্' এবং 'বালা' এর সমন্বয়ে গঠিত 'কারবালা' নামটি শুন্‌লে কার না মন চমকে উঠে? কার না হৃদয় বেদনার নখর পরশে প্রকম্পিত হয়? কার না নিঃশ্বাস জুড়ে যাতনায় তীব্র দহন অনুরনিত হয়? কার না দেহ-মনের গহীন কন্দরে নানাবিধ জিজ্ঞাসার উদয় হয়? কি সেই জিজ্ঞাসা? কি সেই প্রশ্ন? যার তীব্র হলাহলপূর্ন শানিত কলা অহরহ মর্দে মুমিনের কলিজাকে চৌচির করে দিচ্ছে? দুঃখ-বেদনার কুয়াশার চাঁদরকে করছে প্রশস্ত হতে প্রশস্ততর। তবে কি এটাই সেই প্রশ্ন?

মহিয়ান গরীয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয়তম বান্দা, মানব জগতের গৌরব, কুল মখলুকের অস্তিত্ব লাভের একমাত্র উসিলা, সাইয়্যিদুল মুরসালীন ও খ্যাতিমুন্নাবিয়্যীন, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত ও সত্যের দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে আল্লাহ্ পাকের কি সুগভীর প্রণয় ও প্রীতির সম্পর্ক তা এ জগতে কারও অজানার কথা নয়।

প্রিয়জনের স্বজনেরা প্রেমিকের কাছে প্রিয়জনের মতই প্রিয়। চিরন্তন ও শ্বাশ্বতঃ এ সত্য কোথাও কোনদিন তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। ব্যতিক্রম হতেও পারে না।

কিন্তু জানিনা আপাতদৃষ্টিতে কেন এর ব্যতিক্রম ঘটে গেল ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার আঁধার স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষ থেকে? যার ফলে মুসলিম জাহানের সর্বকালের সর্বাপেক্ষা করুণ ও বিয়োগান্তক ইতিহাস রচিত হল এ বিশ্ব ধরিত্রির বুকে। আল্লাহ্ পাকের প্রিয়তম বান্দা ও মহান নবীর (সঃ) দুই দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হুসাইন (রাঃ) ছিলেন তাঁর প্রাণাধিক দুহিতা হযরত ফাতিমা জোহরার (রাঃ) প্রাণের টুকরা দু'টি সন্তান। সে সুবাদে মহান নবীর (সঃ) নয়নের মণি ও কলিজার টুকরা ছিলেন এ দু'জন। সত্য বলতে কি তিনি তাঁর এ প্রিয়তম দু'দৌহিত্রকে এতখানি ভালবাসতেন; সে ভালবাসার তুলনা দু'জাহানের কোনখানে আছে কিনা সন্দেহ। তাঁদের প্রতি তাঁর সে অনুরাগ ও ভালবাসার বিচিত্র ঘটনাবলী ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে।

নিছক আত্মীয়তা, বংশধারা ও রক্তের সম্পর্কই যে এ গভীর ভালবাসার কারণ ছিল তা নয়। মহান নবীর (সঃ) হৃদয়ের ভালবাসা লাভের জন্য যে দ্বীনী যোগ্যতা তথা আল্লাহ্র আনুগত্য, ইবাদত, তাকওয়া, পরহেজগারী ও চারিত্রিক যোগ্যতার প্রয়োজন, সেদিক থেকেও তাঁর দৌহিত্রদ্বয় মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। এতদসত্ত্বেও কেন এ দুঃসহ পরিণতি ও মর্মান্তিক ঘটনার অবতারণা করা হল? যে ঘটনা মুসলিম জাহানের প্রতিটি মানব বক্ষে শেলাঘাত সম আঘাত হেনে তাদের কলজেগুলোকে চুরমার, চক্ষুগুলোকে অশ্রুসিক্ত এবং অন্তরগুলোকে শোকাপ্লুত ও বিষাদ ভারাক্রান্ত করে দিয়েছে?

কেন, কি কারণে, কোন্ রহস্যের যবনিকা উন্মোচনে মুসলিম জাহানের বেদনা-বিধূর করুণতম ও চরম নিষ্ঠুর এ ঘটনাটি সংঘটিত হল? এ প্রশ্নটি প্রত্যেকটি মানুষের মনে প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খাচ্ছে।

কে দেবে তার জবাব?

এমন অনেক কথা ও এমন অনেক প্রশ্ন আছে, যার জবাব পাওয়া খুবই মুশকিল। কেউ তার সুষ্ঠু জবাব দিতে পারে না। জিজ্ঞাসার হাজার বীনা মনের অতল তলে ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু সমাধান পাওয়া যায় না। উত্তর মিলে না।

আমরা জানি, আল্লাহ্ পাকের দ্বীনের আলো বহনকারীগণ যুগে যুগে বিরুদ্ধবাদী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। সত্যানুরাগী বহু প্রাণ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গ হয়েছেন। অনেকের ধমনী নিঃসৃত তাজা রক্ত ঝড়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে সত্যকে রক্ষা করার জন্য। অতীতের সে ভাবধারা বর্তমানেও জারী আছে এবং ভবিষ্যতেও জারী থাকবে। কিন্তু কেন এই আত্মাহুতি? কেন এত রক্ত দান? কেন এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা?

মরু কারবালায় আওলাদে রাসূলদের উপর শুধু কেবল টাকার বিনিময়ে যারা অস্ত্র ধারণ করেছিল, তারা কি চিন্তা করেছিল যে, কি কাজটা তারা এখন করছে? কেনই বা তারা এমন একটা অঘটন ঘটাতে যাচ্ছে? তারাও তো মুসলমানই ছিল। তাদের মুখেও তো কালেমার বাণীই শোনা যেত। তবে কেন তারা এমন করতে উদগ্রীব হল? কেন তারা ভাইয়ের রক্তে নিজেদের হাত রাঙ্গাতে বদ্ধপরিকর হল? কেন তারা একটিবারের জন্যও পরিণামের কথা চিন্তা করল না, ভেবে দেখল না ভবিষ্যতে কি হবে? ইসলাম জগতে কি অপূরণীয় ক্ষতি হবে?

দিন, কাল, সময় ও পরিবেশের প্রভাবে কখনো কখনো এমন কিছু ঘটে যায়, বুদ্ধিতে যা বুঝা যায় না, যুক্তিতে যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘটনা প্রবাহ আপন গতিতে ঘটেই যায়, এর কার্যকারণ ও হেতু নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে

---

* বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক

হয়তো বা কেউ চিন্তা-ভাবনা করে নতুন দিক নির্দেশনার প্রয়াস পায়, নতুন তথ্যের অবতারণাও ঘটে। কিন্তু মূল অবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোক স্পর্শ লাভে তারা সক্ষম হয় কি? আজ হতে প্রায় ১৩৬৭ বছর পূর্বে বিশ্বের বুকে কারবালা প্রান্তরে যে ঘটনার অবতারণা হয়েছিল, আজও তার রেশ কাটেনি। আজও জগৎ তাকে ভুলে যায়নি, ভুলে যায়নি সে হৃদয় বিদারক ঘটনা। তবে কেন এমন হয়? কেন মন আকুলী-বিকুলী করে? কে দেবে তার জবাব? না, জবাব পাওয়া যাবে না। নীরব প্রকৃতি নিথর সাক্ষী হয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস টিকে থাকবে, কিন্তু সাক্ষ্য দেয়ার ভাষা যে তার নেই। সে দেখছে, ভাবছে, অনুভব করছে, যাতনায় কাঁদছে, কিন্তু সবকিছুই অব্যক্ত বেদনার নিঃশব্দ অনুশোচনা মাত্র।

একটি চিরন্তন আলামত

আবদুল মালেক ইবনে ওমায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি কুফা নগরীর শাহী দরবারে প্রত্যক্ষ করেছি ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সামনে হযরত ইমাম হুসাইনের (রাঃ) খণ্ডিত পবিত্র মস্তক। তারপর সেই একই জায়গায় আবার দেখেছি মোখতারের সামনে সেই ঘৃণিত নরাধম ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের অপবিত্র খণ্ডিত মস্তক। তারপর আবার দেখেছি সেই মোখতারের খণ্ডিত শির একই স্থানে মাসআব ইবনে জোবায়েরের সামনে। অতঃপর দেখেছি মাসআবের খন্ডিত শির ঐ স্থানেই আবদুল মালেকের সামনে।

আবদুল মালেক ইবনে ওমায়ের বলেন, আমি যখন আবদুল মালেকের কাছে এ কথাটি বললাম, সম্ভবতঃ তিনি মনে মনে কি কথা ভেবে শিউরে উঠলেন এবং অবিলম্বে সেই অলক্ষুণে শাহী দরবার ভবন পরিত্যাগ করে অন্য ভবনে তা স্থানান্তরিত করলেন।

এ কথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে আত্মাহুতিদানকারী ও প্রাণোৎসর্গকারীদের রক্ত কখনও বৃথা যায় না বরং তার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া সদা সক্রিয় থাকে। আর তা' বহু জালিমের ধ্বংসের কারণ হয়।

সত্যি বলতে কি, ইরাকের পাশব প্রবৃত্তির জঘন্য লোকদের কার্যক্রমের ফলে কারবালায় হযরত ইমাম হুসাইনের শাহাদতের মধ্য দিয়ে যে রক্তের ধারা প্রবাহিত হতে শুরু হয়েছিল, আল্লাহ তাআলার অমোঘ বিধানে সেই রক্তের ধারা আর বন্ধ হয়নি বরং দীর্ঘকাল ধরে একই ভাবে চলে এসেছে। ইরাকের মৃত্তিকা কত শাসকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে ও এখনও হচ্ছে ইতিহাস পাঠকেরা তা অবশ্যই জেনে থাকবেন। নিশ্চয় আল্লাহর অভিশাপের ফলেই এরূপ হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যত জালিম শাসক পার্থিব স্বার্থের মোহে স্বার্থান্ধ অন্য জালিমের হাতে ধ্বংস হয়েছে তাদের নাম ধাম জগতের বুক থেকে কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে। কেউ ভুলেও একবার তাদের নাম উচ্চারণ করে না।

পক্ষান্তরে ঈমান ও ধর্মের বলে বলীয়ান, সত্য ও ন্যায়ের সাধক হযরত ইমাম হুসাইন, যিনি অন্যায় ও অসত্যের সাথে আপোষ না করে বরং তার বিরুদ্ধে নির্ভীক চিত্তে প্রাণোৎসর্গ করেছেন, তিনি সৎ সাহসী বীরের ন্যায় স্বীয় প্রাণ দান করলেও ধরিত্রি বক্ষে চির অমর হয়ে রয়েছেন এবং যতদিন এ জগতে আকাশ-বাতাস ও চন্দ্র-সূর্য থাকবে, ততদিনই তাঁর নাম ও অক্ষয় কীর্তি সারা বিশ্বজুড়ে ঘোষিত হতে থাকবে। ন্যায়ের সংগ্রামে ইমাম হুসাইন প্রাণ দান করেছেন সত্যি। কিন্তু তাতে সত্য ও ন্যায় অন্যায় ও অসত্যের কাছে বিজীত হয়নি বরং প্রকৃতপক্ষে সত্য ও ন্যায়ই বিজয়ী হয়েছে। ইমামের শাহাদত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ন্যায় ও সত্য কখনও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না, মাথা উঁচু করে আত্মদান করে আর তার দ্বারা জগতের বুকে তা চির অম্লান উজ্জ্বল থাকে। এর দ্বারা বিশ্ব-মানবের সামনে অক্ষয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যায়। আর তা শাশ্বত আদর্শ হিসেবে চির জাগরূক থাকে। কারবালার হৃদয়-বিদারক ঘটনার মাধ্যমে তাই হয়েছে।

কারবালার এই অবিস্মরণীয় ঘটনা এবং সমকালীন দুর্যোগ দুর্বিপাকের মর্মান্তিক আভাস সম্ভবতঃ প্রবীণ ও বুযর্গ ছাহাবী হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তি বলে বহু পূর্বেই পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি বৃদ্ধ বয়সে প্রায়শঃ আল্লাহর দরবারে এরূপ দোয়া করতেন, হে মাবুদ! আমি তোমার নিকট ভাবী ষাট হিজরী এবং নবীন যুবকের শাসন ক্ষমতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। বলা বাহুল্য যে, সেই হিজরী ষাট সনেই যুবক ইয়াজিদ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা থেকেই কারবালার লোমহর্ষক ঘটনার সূচনা হয়েছিল।

উপসংহার

প্রিয় সুধী পাঠক পাঠিকা! আমরা অত্র নিবন্ধের প্রারম্ভে একটি "বিশেষ প্রশ্ন" এবং "কে দেবে তার জবাব" শীর্ষক দুটি করুণ বেদনা বিধুর ও মর্মান্তিক জিজ্ঞাসার অবতারণা করেছি এবং উল্লেখ করেছি কেন এরূপ হল ও কে এর জবাব দেবে? নিবন্ধের মূল বিষয়গুলো বর্ণনার শেষে উপসংহারে এবার আমরা উল্লেখিত সেই প্রশ্ন দুটোর দিকেই আবার ফিরে যাচ্ছি। মনে নতুন প্রশ্নের উদয় হচ্ছে, সত্যিই কি সেই জিজ্ঞাসার কোন সঠিক উত্তর নেই?

আমরা এ নিয়ে বেশ কিছু চিন্তা ও ভাবনা করেছি। এ নিয়ে প্রভু আল্লাহর বিধান বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছি। ফলে

একটি জবাব আমাদের সামনে বেশি পরিস্কারভাবেই ফুটে উঠেছে। তা-ই এখানে উল্লেখ করে এই প্রবন্ধের বর্ণনা সমাপ্ত করব।

একটি ধ্রুব সত্য হল এই যে, মহান আল্লাহ্ তায়ালার কোন একটি কার্যই ইনছাফহীন, উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক নয়। তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে গুঢ় রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। সাথে সাথে এ কথাও সত্যি যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে পার্থিব জগতের সুখ-সম্পদ, ধন-ঐশ্বর্য, দীর্ঘায়ু, বাদশাহী, শান-শওকত অপার্থিব জগতের তুলনায় নেহায়েতই অকিঞ্চিৎকর। আল্লাহর কাছে গুরুত্বপ্রাপ্ত পারলৌকিক জীবন! যেহেতু তা অনন্তকালীন ও চিরস্থায়ী, তাই সে অনন্তকালীন জীবনের পাওয়াটাই হল জীবনের প্রকৃত পাওয়া। সেই প্রাপ্তিতে যে বা যারা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, সে বা তারাই সমগ্র মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব।

এখন এই মর্যাদা কে বা কারা পাবে? পাবে সে বা তারা, যে বা যারা আল্লাহর দ্বীন-ধর্মের সেরা অনুসারী, ন্যায় ও সত্যের ধারক, শ্রেষ্ঠ পরহেজগার এবং সত্যিকার খোদাভীরু এবং আল্লাহর হাবীব রাসূলের প্রদর্শিত পথে অটল ও অবিচল। এই সব দিক থেকে নবী দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রাঃ) শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তদুপরি পারলৌকিক সেরা পুরস্কার এবং শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভের জন্য আর একটি বিষয় রয়েছে, তা হল, দুনিয়ায় যারা সর্বাধিক বঞ্চিত, সর্বাধিক মজলুম এবং যাঁদের ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি অন্যায় ও অত্যাচার করা হয়। তবে যদি তারা এই অবস্থার শিকার হয়েও আল্লাহর মর্জির ওপর রাজী থাকে ও তাদের ঈমান অবিচল থাকে, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে জাগতিক প্রতিকূল অবস্থার বিনিময়ে পারলৌকিক জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত করবেন, এটা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি। আর মহান ন্যায় বিচারক আল্লাহ্ তায়ালার জন্য শোভনীয়ও তাই।

আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে স্বীয় প্রিয় হাবীব শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সর্বাধিক ভালবাসতেন এবং ভালবেসে থাকেন। এরূপ ভালবাসার পাত্র যাকে বা যাদেরকে ভালবাসেন তাকে বা তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসতেন এবং ভালবেসে থাকেন। শেষ নবীর শ্রেষ্ঠ ভালবাসার পাত্র ছিলেন তাঁর প্রিয় দৌহিত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাঃ)। এই ভালবাসা শুধু রক্তের সম্পর্কিত নয় বরং দ্বীনধর্ম, আচরণ, কার্যকলাপ, রীতি-নীতি এবং চারিত্রিক যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমেও তাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর অতুলনীয় ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। নবী হৃদয়ের অন্তস্থলের সুগভীর ভালবাসার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা। এই সুবাদেই আল্লাহ্ তায়ালাও নবীর শ্রেষ্ঠ ভালবাসার পাত্র ইমামদ্বয়কে সর্বাধিক ভালবাসতেন এবং তারই নিদর্শন হিসেবে পারলৌকিক জীবনে তাঁদেরকে সেরা মর্যাদা ও পুরস্কারে সম্মানিত করবেন, এটা তাঁর পূর্ব নির্ধারিতই ছিল। তবে তার কারণ হিসেবে যতগুলো দিক আছে, সবগুলোকেই বাস্তবায়িত করে নেয়ার জন্য তিনি ইমামদ্বয়কে দুনিয়াবী জীবনে উল্লেখিতরূপ কঠোর পরীক্ষায় লিপ্ত করার পথ অবলম্বন করেছিলেন। এই পরীক্ষা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমাদের কাছে অবিচার, অহেতুক ও অবিবেচনাসুলভ বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। বরং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে আল্লাহর গূঢ় রহস্য। আর তা উদঘাটিত হয়েছে জগতের বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে। আল্লাহর নবী হযরত আইউব (আঃ) আল্লাহর এত অনুগত, বাধ্যগত, আবেদ ও প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, যার দৃষ্টান্ত বিরল। অথচ আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে মানবকুলের সামনে একটি অপূর্ব শিক্ষা এবং আদর্শ স্থাপনের লক্ষ্যে তাঁকে কোন কারণ ছাড়াই এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত করলেন, যেমন কঠিন ব্যাধি তিনি তাঁর কোন প্রধান শত্রুকেও দেননি।

শুধু তাঁর কথাই বা বলি কেন, খোদ মহানবী যিনি মানবকূলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়, যিনি নবী রাসূলদের সর্দার, কাফিরদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও অমানুষিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দেশত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়েছে। তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছে, পাষণ্ড শত্রুর প্রচণ্ড হামলায় অচেতন হয়ে পড়তে হয়েছে। অথচ তিনি এসেছিলেন সেই অজ্ঞ ও মূর্খ মানবদেরকে মুক্তির পথ দেখাতে, তাদের ইহপারলৌকিক জীবনকে সার্থক এবং সুন্দর করে তুলতে।

এই অবস্থা মর্তভূমির সাধারণ রীতি। সুজন ও সৎলোক যে হবে, যত দুর্ভোগ, দুর্যোগ, দুঃখ-কষ্ট তারই অদৃষ্টে। আর জয় জয়কার, ধনৈশ্বর্য, আরাম আয়েশ অসৎ ও পাপীদের জন্য। কিন্তু সেজন্য সুজন এবং দ্বীনদার লোকগণ কস্মিনকালেও হতাশ হয়ে পড়ে না। দ্বীনের জিহাদে দ্বীনি মুজাহিদগণ বিজয় লাভ করলে তা ভাল কথা, আর যদি বেদ্বীন লোকেরা জয়লাভ করে, দ্বীনি মুজাহিদগণ দ্বীনের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করে, তা তাদের পক্ষে আরও ভাল কথা। কেননা শহীদের মর্যাদা গাজী মুজাহিদ অপেক্ষা অনেক বেশি। কেননা, সে দ্বীনের জন্য আল্লাহর পথে প্রাণোৎসর্গ করেছে। শাহাদতের এই মহামর্যাদা সবার নছীব হয় না। যারা মহাভাগ্যবান, তারাই কেবল এই সেরা মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। নবী-সহচরদের বহু বুযর্গ শুধু এই কারণেই শাহাদত বরণের প্রবল আকাঙ্খা পোষণ করতেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা শহীদগণকে বেহেশতের মধ্যে সর্বোত্তম স্থান দান করবেন। শাহাদত বরণের সেই প্রতিদান এতই মূল্যবান ও এমনই দুষ্প্রাপ্য যে, তার সাথে পার্থিব

জগতের যে কোন বস্তু অতি নগণ্য। বিশ্বজগত ও জগতের সব কিছু বিসর্জন দিয়েও যদি বেহেশতের একটি ক্ষুদ্র কুঠরি লাভ করা যায় তাহলেও জীবনকে সার্থক এবং ধন্য মানতে হবে।

এবার সবাই একবার ভেবে দেখুন, একজন সাধারণ শহীদের প্রতিদান যদি এই ধরনের হয়, তবে যে বা যারা মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ শহীদ, আল্লাহর দরবারে সে বা তাদের প্রতিদান কোন্ পর্যায়ে হবে। মহান প্রভু আল্লাহর বিচারে নবী দৌহিত্র ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) শহীদগণের শ্রেষ্ঠ শহীদ, আর সেই কারণেই আল্লাহ্ তাঁদেরকে বেহেশতীদের নেতৃত্বের মর্যাদা দান করেছেন। এর প্রধান কারণ হল, তাঁরা দু'ভাই জগতে অতি করুণ মর্মান্তিকভাবে শহীদ হয়েছেন। সে করুণ ঘটনা মনে জেগে উঠলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নের উদয় হয় যে, কেন এমনটি হল? কিন্তু সাথে সাথে যদি তাঁদের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত পরিণতি ও প্রতিদানের কথা ভেবে দেখা হয়, তাহলে অবশ্যই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তাঁদেরকে পারলৌকিক জীবনে ঐরূপ মহা মর্যাদায় ভূষিত করার লক্ষ্যেই পার্থিব জীবনে তাঁদের জন্য এরূপ ঘটনাকে নির্ধারণ করে রেখেছেন। দুনিয়ায় এসে কোন মানুষ কখনও স্থায়ী জীবন লাভ করেনি, সবারই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে যে মৃত্যুর দ্বারা মানুষের পরকাল মহাকল্যাণময় ও পরম ধন্য হয়, সে মৃত্যু কার না কাম্য? কিন্তু সবার কামনা সফল হয় না। যারা সৌভাগ্যবান তাদেরকে আল্লাহ্ তেমন মৃত্যু প্রদান করেন। এদের মধ্যে ইমামদ্বয়ের স্থান হল সকলের উর্ধ্বে, যেহেতু তাঁরা মানব জগতে মহাভাগ্যবান।

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

ইয়াজিদ প্রসংগ

মুফতী মোহাম্মদ আব্দুন নুর চৌধুরী *

কুখ্যাতির জন্য যে সকল লোক ধিকৃত, ইয়াজিদ তাদের মধ্যে অন্যতম। ধিকৃত ব্যক্তিদের নিয়ে ইতিহাসে সমালোচনা কম হয়নি কিন্তু ইয়াজিদের ন্যায় সমালোচিত ব্যক্তি খুব কমই আছে বলা যায়। ইয়াজিদ এমনই এক কলঙ্কময় নাম যার প্রতি আজো বিশ্বের কোটি কোটি ঈমানদার মুসলমান অভিসম্পাত করে। তার মত অত্যাচারী (জালেম) ঘৃনিত, জঘন্যতম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ইতিহাসে বিরল।

ইয়াজিদের মনোনয়ন ঃ ৬৭৯ খৃষ্টাব্দে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তদীয় পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে অনুসৃত নির্বাচন পদ্ধতিতে যে আমূল পরিবর্তন আনেন তার ফলেই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বসরার শাসনকর্তা মুগীরার প্ররোচনায় তিনি ইমাম হাসানের (রা) সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির অবমাননা করে নিজ ও গোত্রীয় স্বার্থে ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। মক্কার ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এ মনোনয়নের তীব্র বিরোধিতা করেন। বিশেষ করে, হুসাইন ইবনে আলী (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) বিরোধীদের অন্যতম ছিলেন। ইয়াজিদকে মনোনীত করার পর মুয়াবিয়া (রাঃ) ৬৮০ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

ইয়াজিদের সিংহাসনে আরোহন ঃ ইমাম হাসানের (রা.) সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিতে মুয়াবিয়া (রা.) এর পর ইমাম হোছাইন (রা.) এর খেলাফত লাভের শর্ত সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হলেও মুয়াবিয়া (রা.) তা লঙ্ঘন করে স্বীয় অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে ৬৭৯ খৃঃ উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ৬৮০ খৃঃ মুয়াবিয়ার (রা.) মৃত্যু হলে প্রথম ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহন করে। খিলাফতে অভিষিক্ত হয়ে পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফে যাঁরা আনুগত্য প্রদর্শনে অনীহা প্রদর্শন করেন তাদেরকে বশ্যতা স্বীকার করার জন্য পত্র প্রেরণ করে। প্রথমদিকে অনেকেই অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে মেনে নেন। আবার কেহ কেহ অস্বীকার করে মদীনা শরীফ ত্যাগ করেন।

ইয়াজিদের সাথে ইমাম হোছাইন (রা.) এর বিরোধ ঃ মহানবী (দ.) এর দৌহিত্র এবং হযরত আলী (রা.) এর কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোছাইন (রা.) ছিলেন ধর্মপরায়ন, ন্যায় নিষ্ঠ, উদার, নম্র, সৎ ও অকপট। অপর দিকে মুয়াবিয়া (রা.) এর পুত্র ইয়াজিদ পাপাসক্ত, অত্যাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ন নীতিজ্ঞানহীন, মদ্যপায়ী ও হৃদয়হীন ছিল। ভনক্রেমারের মতে, "মুয়াবিয়া (রা.) এর মত জ্ঞানী ও বিচক্ষন পিতার পক্ষে তাঁর অযোগ্য ও পাপাসক্ত পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ঐতিহাসিকদের নিকট সত্যিই দুর্বোধ্য। ইয়াজিদের উত্তরাধিকারকে আরব গোত্র এবং ইমাম হোছাইন (রা.) সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অন্যায় বলে অভিহিত করেন। তাঁরা দামেস্কে প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুয়াবিয়া (রা.) এর চুক্তি ভঙ্গ এবং ইয়াজিদের উত্তরাধিকারকে মানবতা বিরোধী ও নীতিজ্ঞানহীন পদক্ষেপ বলে প্রতিবাদ করেন। অকৃত্রিম ও মৌলিক ইসলামী আদর্শের ব্যত্যে মক্কা ও মদীনায় মহানবী (দ.) এর দৌহিত্রের খেলাফত লাভ ন্যায়সঙ্গত বলে জনমত গঠন করা হয়। ইসলামী গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য অধার্মিক ও দুরাত্মা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) এর সমর্থকগণ ইমাম হোছাইন (রা.) কে সমর্থন করতে লাগলেন, এর ফলে হিট্টির ভাষায় "মৃত আলী (রা.) জীবিত আলী (রা.) অপেক্ষা বেশি কার্যকরী প্রমাণিত হল"।

দুর্নীতিপরায়ন অত্যাচারী ও পাপিষ্ঠ ইয়াজিদের শাসনে কুফাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং নিজেদের স্বার্থে ইমাম হোছাইন (রা.) কে সমর্থন জ্ঞাপন করে। চঞ্চল, চপলমতি ও অস্থির মতিত্ব ইরাকীদের প্রতি আস্থা না রাখার জন্য ইমাম হোছাইন (রা.) এর বন্ধু ও শুভাকাঙ্খিগণ তাঁকে অনুরোধ করেন। কুফার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইমাম হোছাইন (রা.) তাঁর চাচাত ভাই মুসলিম বিন আকিল (রা.) কে প্রেরণ করলে কুফাবাসীগণ মুসলিম (রা.) কে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইমাম হোসাইন (রা.) কে কুফায় আগমন করার জন্য পত্র দিয়ে অনুরোধ জানান। ইত্যবসরে চঞ্চলমতি ও বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসী তাদের শাসনকর্তা ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের পক্ষে সমর্থন করে এবং মুসলিম (রা.) কে শহীদ করে।

ইয়াজিদ কর্তৃক কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার কারণ ঃ প্রথমতঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইমাম হাসানের (রা.) সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম হোছাইন (রা.) কে খিলাফত প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন কিন্তু তিনি সে চুক্তি ভঙ্গ করেন উপরন্তু ৬৭৯ খৃঃ স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

দ্বিতীয়তঃ মদিনা হতে দামেস্কে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে ধর্মভীরু মুসলমানগণ ভীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে অনৈসলামিক কার্যকলাপ যেমন- সিংহাসন, হারেম প্রথা, মদ্যপান প্রভৃতি তাদের বিচলিত করে।

* উপাধ্যক্ষ, আল্ আমিন বারিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২২১।

তৃতীয়তঃ মুয়াবিয়া (রা.) এর মত যোগ্যতা ও দক্ষতা ইয়াজিদের ছিল না। অধার্মিক ও কপট ইয়াজিদ প্রথম বৎসর ইমাম হোছাইন (রা.) কে ষড়যন্ত্র করে শহীদ করে। দ্বিতীয় বৎসর মদিনা শরীফ লুণ্ঠন করে। তৃতীয় বৎসর কাবা শরীফের পবিত্রতা নষ্ট করে।

চতুর্থতঃ ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ।

পঞ্চমতঃ কুফাবাসীদের কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় ইমাম হোছাইন (রা.) এর জীবন বিপন্ন হয়।

ইমাম হোছাইন (রা.) ও ইয়াজিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ভিন্নতা ঃ

ইমাম হোছাইন (রা.) যে একমাত্র আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম ও মহানবী (দ.) এর জীবনাদর্শ সঠিকরূপে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইয়াজিদের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। তাঁদের উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্যের মধ্যেও যে যথেষ্ট ভিন্নতা ছিল, তা নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারা পাঠক সমাজ যথার্থরূপে অনুধাবন করতে পারবেন।

হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) এর উদ্দেশ্য ছিল- পবিত্র কুরআনের সম্মান রক্ষা করা আর ইয়াজিদের উদ্দেশ্য ছিল- কুরআনকে নিলাম দেয়া বা খোলা বিক্রি করা।

হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) উদ্দেশ্য হচ্ছে- সত্যের আওয়াজ উচ্চ করা, ইয়াজিদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের আওয়াজ বন্ধ করে দেয়া।

ইমাম হোছাইন (রা.) পবিত্র ইসলামের মধ্যে কুফরী মেনে নিতে পারেন না।

ইয়াজিদ মনে করেছিল- হযরত হোছাইন (রা.) তার অনৈসলামিক কার্যকলাপ মেনে নেবেন।

ইয়াজিদ মনে করেছিল- হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) তার অপবিত্র কার্যকলাপের সমর্থনে হ্যাঁ বলবেন তখন তার সব কাজই সফল হবে।

ইমাম হোছাইন (রা.) ভাবলেন, যদি তাই-ই-হয়, তাহলে পবিত্র ইসলামের সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে।

ইয়াজিদের ইচ্ছা ছিল বলপূর্বক হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে।

হযরত ইমাম হোছাইন (রা.)র ইচ্ছা ছিল, আদল ইনসাফ অর্থাৎ ন্যায় নীতির ভিত্তিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা।

ইয়াজিদের ইচ্ছা ছিল, তার শয়তানী হুকুমতকে খোদায়ী হুকুমত বলে চালিয়ে দেয়া।

ইমাম হোছাইনের (রা.) ইচ্ছা ছিল, তার ঐ সব ধোঁকা জগতের কাছে উন্মোচিত করে দেয়া।

ইয়াজিদের ইচ্ছা ছিল, কেবল দেহের উপর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা।

হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) এর ইচ্ছা ছিল, আত্মার উপর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা।

ইয়াজিদের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ ঃ

ইয়াজিদের তিন বৎসরের শাসনামলে এমন তিনটি ঘটনা সংঘটিত হয়, যা পুরো মুসলিম বিশ্বকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে এবং তার ঈমান-আক্বীদা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। যেমন -

প্রথমত ঃ সাইয়্যেদেনা ইমাম হোছাইন (রা.) এর শাহাদাত বা কারবালার ঘটনা।

দ্বিতীয়ত ঃ হাররা যুদ্ধসহ মদীনা শরীফের পবিত্রতা বিনষ্ট।

তৃতীয়ত ঃ পবিত্র কাবাগৃহে আগুন দেয়া সহ নানা অপরাধমূলক কার্যকরন।

ইয়াজিদের প্রথম কূ-কর্ম ঃ কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা ঃ হযরত মুসলিম বিন আকিল (রা.) এর ইতিবাচক ও আশ্বাসপূর্ন পত্র পেয়ে হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) ২০০ (দুইশত) ভক্ত অনুচর ও আত্মীয়-স্বজনকে সাথে নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি পথিমধ্যে হযরত মুসলিম বিন আকিলের শাহাদতের সংবাদ পান। হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) কুফার নিকটবর্তী হলে তামীম গোত্রের আল হোরের পরিচালনাধীন অশ্বারোহী বাহিনী কর্তৃক প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। ফোরাত নদীর (ইউফ্রেটিস) পশ্চিম তীর ধরে ইমাম হোছাইন (রা.) সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলে ইয়াজিদ কর্তৃক ওমর বিন সাদের নেতৃত্বে প্রেরিত (৪০০০) চার হাজার সৈন্যের আরেকটি দল তাঁকে অবরোধ করে। এমতাবস্থায় কুফার ২৫ মাইল উত্তরে ফোরাত তীরবর্তী কারবালার প্রান্তরে তাঁরা তাবু ফেলেন। হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) ইয়াজিদীদেরকে তাঁর তিনটি শান্তি প্রস্তাবের মধ্য থেকে যে কোন ১টি প্রস্তাব গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনটি শান্তি প্রস্তাব নিম্নরূপ ঃ

১। আমি যে স্থান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যেতে দেয়া হোক।

২। ইয়াজিদের সাথে কথা বলার জন্য দামেস্কে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক।

৩। অথবা তুর্কী সীমান্তের দূর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক।

কিন্তু কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ তাঁর শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখান করে নিঃশর্ত ভাবে ইয়াজিদের প্রতি বশ্যতা স্বীকারের নির্দেশ দেয়। অন্যথায় সীমারের প্রতি ইমাম হোছাইন (রা.) কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় কুফায় নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়।

হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) ওবায়দুল্লাহর এই অপমানজনক প্রস্তাব গ্রহণের চেয়ে শাহাদত বরণ করা শ্রেয় মনে করে জিহাদের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ৬৮০ খৃষ্টাব্দে ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরী, ১০ মোহাররম) ময়দানে কারবালায় মাত্র ৭২ জন যুদ্ধক্ষম আত্মীয় স্বজন নিয়ে পাঁচ হাজারের অধিক ইয়াজিদী সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে অন্যান্যরা সহ অবশেষে ইমাম হোছাইন (রা.) শাহাদত বরণ করেন। এ অসম যুদ্ধে হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) রুগ্ন সন্তান ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা.) ব্যতীত নবীকূলশিরমনির বংশে আর কোন পুরুষ জীবিত ছিলেন না। তারা ইমাম হোছাইন (রা.) এর পবিত্র দেহ থেকে শির মোবারক বিচ্ছিন্ন করে খন্ডিত মস্তক মোবারক দামেস্কে ইয়াজিদের নিকট প্রেরণ করে। এতে করে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবনাবসান ঘটে।

ইয়াজিদ বিপ্লবের ভয়ে ইমাম হোছাইন (রা.) এর পবিত্র খন্ডিত মস্তক ভগ্নি হযরত জয়নব (রা.) ও পুত্র জয়নুল আবেদীন (রা.) এর হাতে সমর্পন করলে তাঁরা তা দেহ মোবারকসহ কারবালাতে সমাধিস্থ করেন। কারবালার এ শোক বিহ্বল বিয়োগান্তক ঘটনার করুণ দৃশ্য জগতের প্রতিটি মুসলমান, নবী প্রেমিকের হৃদয়ে আজো জীবন্ত ও ভাস্বর হয়ে আছে। ঐতিহাসিক গিবন এর মতে "সে দূরবর্তী যুগেও কারবালায় হোছাইন (রা.) এর মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম পাঠকের অন্তরেও সমবেদনা সঞ্চার করে।"

উল্লেখ থাকে যে, হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) এর সঙ্গী-সাথীরা যখন প্রত্যেকে শাহাদত বরণ করলেন তখন কেবল তিনিই ছিলেন একা। এমতাবস্থায় তাঁকে আক্রমন করার কিংবা শহীদ করার প্রয়োজন ছিল না। তাঁকে সহজেই গ্রেপ্তার করা যেতো এবং শেষ সময় পর্যন্ত তিনি ইয়াজিদীদেরকে পূর্বোল্লেখিত তিনটি শান্তি প্রস্তাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তথাপি ইয়াজিদী হায়নার দল মানবতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে নিষ্ঠুরতার সর্বশেষ পরাকাষ্ট দেখিয়ে ইমাম হোছাইন (রা.) কে শহীদ করে।"

হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) এর লোম হর্ষক শাহাদাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাবারী, ইবনুল আসীর ও আল বেদায়া গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন "ইমাম হোছাইন (রা.) ইয়াজিদী বাহিনীর আক্রমনে আহত হয়ে মাটিতে লুঠিয়ে পড়লে তাঁকে জবাই করা হয়। তাঁর কাছে যা ছিল সবই খুলে নেয়া হয় এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত। এরপর তাঁর এবং অন্য সকল শহীদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে কুফায় নিয়ে যাওয়া হয়।

হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) ও অন্যান্য শহীদদের ছিন্ন মস্তক ইবনে জিয়াদ কেবল প্রদর্শনই করেনি বরং জামে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেঃ الحمد لله الذي اظهر الحق و اهله و نصر امير المؤمنين يزيد و حزبه و قتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي و شيعته

অর্থাৎ বেঈমান ইবনে জিয়াদ বলেঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সত্য (হক) এবং হকের অনুসারীকে সুস্পষ্ট করেছেন আমিরুল মূমিনীন ইয়াজিদ এবং তার দলকে বিজয়ী করেছেন আর মিথ্যাবাদীর পুত্র মিথ্যাবাদী হোছাইন ইবনে আলী এবং তার সমর্থকদের হত্যা করেছেন।

আল্লাহপাক মুমিনদেরকে ঐসব উক্তি থেকে রক্ষা করুন। আত তাবারী ৪র্থ খন্ড ৩৫২ পৃষ্ঠায় এবং ইবনুল আসীর ৩য় খন্ডে আছে, ইমাম হোছাইন (রা.) এর পবিত্র খন্ডিত মস্তক ইয়াজিদের সামনে আনা হলে সে যে উক্তি করে তার বিবরণ হলো "ইয়াজিদ বলে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম তাহলে হোছাইন (রা.) কে ক্ষমা করে দিতাম। সে আরও বলে ইবনে জিয়াদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। ইয়াজিদের এসব উক্তি ছিল লোক দেখানো। জনগণ বিদ্রোহী হবে এ ভয়ে সে এসব উক্তি করছিল। তার এ সকল উক্তি আন্তরিকতা পূর্ণ হলে গর্ভনরকে (ইবনে জিয়াদকে) এ জঘন্যতম কার্যের জন্য শাস্তি দিতে পারত, তাকে কোন শাস্তি না দেয়ার কারনে প্রমাণিত হল, ইয়াজিদের এসব উক্তি ছিল লোক দেখানো।

হাফেজ ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, সে ইবনে জিয়াদকে শাস্তি দেয়নি বরখাস্তও করেনি কিংবা নিন্দা জানিয়ে পত্র লিখেনি। (আল বেদায়া ৮ম খন্ড ২০৩ পৃষ্ঠা)

ইয়াজিদের কাছে ঈমানী ইসলামী ভদ্রতা দূরে থাক মানবিক ভদ্রতার যদি লেশমাত্র থাকতো তাহলে সে চিন্তা করে দেখতো যে, মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (দ.) তার গোটা খান্দানের সাথে কি ধরনের সহৃদয়পূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন আর আমি (ইয়াজিদ) আজ রাহমাতুল্লিল আলামীনের দৌহিত্রের প্রতি কি ধরনের আচরন করছি?

ইয়াজিদের দ্বিতীয় কু-কর্ম ঃ হাররা যুদ্ধ (মদীনা শরীফ আক্রমণ) ঃ

ইয়াজিদের দ্বিতীয় কু-কর্ম ঃ হাররা যুদ্ধ (মদীনা শরীফ আক্রমণ) ঃ তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া ৬৩ হিজরী সনের শেষের দিকে ইয়াজীদের জীবনের শেষ অধ্যায়ে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো। পবিত্র মদীনাবাসীগণ ইয়াজিদকে ফাসেক, কাজেব ও মহা অত্যাচারী আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁরা মদীনা শরীফ হতে ইয়াজিদের গভর্নরকে বিতাড়িত করে আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা.) কে গভর্নর নিযুক্ত করেন।

ইয়াজিদ এ সংবাদ জানতে পেরে মুসলিম ইবনে ওকাবা আল মুররীকে (যাকে সলফে সালেহীন মুশরেক ইবনে ওকাবা বলে অভিহিত করেন) ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা শরীফ আক্রমনের জন্য প্রেরণ করে এবং তাকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, মদীনাবাসীদেরকে ৩ (তিন) দিন যাবৎ আনুগত্য প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হোক। তাঁরা আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হোক। বিজয়ী হলে তিন (৩) দিন পর্যন্ত মদীনা শরীফকে ইয়াজিদী সৈন্যদের জন্য মোবাহ করে দেয়া হবে। ইয়াজিদের নির্দেশানুযায়ী সৈন্যরা কাজ করল এবং প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সৈন্যরা তিন (৩) দিন পর্যন্ত মদীনা শরীফে যা ইচ্ছা তা-ই করল।

শহরের সর্বত্র লুটতরাজ চলতে থাকে। পাইকারি হারে হত্যার (শাহাদতের) ন্যায় নিষ্ঠুরতম কার্য দ্বিধাহীন চিত্তে চলতে লাগল। হযরত ইমাম যুহুরীর বর্ণনানুযায়ী ৭ (সাত) শত খুবই সম্মানিত এবং ১০ (দশ) হাজার সাধারণ (তাঁরা ছিলেন সাহাবী ও তাবেঈ) লোক শাহাদত বরণ করেন। ইয়াজিদের বর্বর সৈন্যরা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে নির্বিচারে মহিলাদের শ্লীলতাহানী করে। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন " حتي قيل انه حبلت الف امرأة في تلك الايام من غير زوج "

অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে, এ সময় এক হাজার মহিলা ব্যভিচারের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। (তাবারী ৩য় খন্ড ৩৭২-৭৯, ইবনুল আসির ৩য় খন্ড ৩১০-৩১৩, আলবেদায়া ৮ম খন্ড ২১৯-২২১ পৃষ্ঠা)

ইয়াজিদের দৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ যেই মদীনা শরীফের প্রতি, তার মর্যাদা ইসলামে কতটুকু ঃ

মহানবী (দ.) এর হিজরতস্থল মদীনা শরীফের প্রতি আন্তরিক আকর্ষন প্রতিটি ঈমানদারের অন্তরে বিদ্যমান। ঈমানদার হচ্ছেন তিনি যিনি শর্তহীনভাবে নবী করিম (দ.) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং আবেগপূর্ণ হৃদয়ে মদীনার প্রতি আকর্ষিত হয়। প্রেমের এই অনুভূতি যত গভীরে প্রোথিত হয় ঈমানের উজ্জ্বলতা তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই মদীনা শরীফ প্রতিটি ঈমানদারকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ পবিত্র ভূ-খন্ডকেই মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.) এর বাসস্থান এবং দুনিয়ার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্রামস্থান রূপে নির্ধারিত করেছেন। এই পবিত্র ভূ-খন্ডের উপরই মহানবী (দ.) সকাল সন্ধ্যা পদাচরণ করেছেন। তাঁরই পদস্পর্শে ধন্য নগরীর অলিতে-গলিতে, আকাশে-বাতাসে হুজুর (দ.) এর সুঘ্রান ছড়িয়ে আছে। এ জনপদের বাসিন্দা, বৃক্ষলতা এমনকি পাহাড়-পর্বতের সাথেও মহানবী (দ.) এর অটুট বন্ধন ও ভালবাসা ছিল। হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন "উহুদ পাহাড় আমাকে ভালবাসে আমিও উহুদ পাহাড়কে ভালবাসি"।

যার নাম অধিক তার মাহাত্ম্য ও সম্মান অত্যাধিক। ভূ-পৃষ্ঠে মদীনা তাইয়্যেবার মত এত অধিক নাম বিশিষ্ট জনপদ আর একটিও নেই। এ পবিত্র নগরীর প্রায় একশটি নাম রয়েছে। যেমন, হুজুর (দ.) এর নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয় নাম হচ্ছে তাবাহ-তাইবাহ যার অর্থ পবিত্র হওয়া। হাদীছ শরীফে আছে- قال صلي الله عليه و سلم ان الله امرني ان اسمي المدينة طابة

অর্থাৎ "আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন মদীনার নাম রাখি তাবাহ।

মালেকী মাযহাব মতে, "যে ব্যক্তি মদীনার ভূমিকে পাক নয় বলে অভিহিত করে এবং এর আবহাওয়া প্রতিকূল মনে করে সে দন্ড পাওয়ার যোগ্য। বিশুদ্ধ তাওবা না করা পর্যন্ত সে ব্যক্তি বন্দী অবস্থায় থাকার যোগ্য অপরাধী"।

জাহেলিয়া যুগে মদীনা শরীফের নাম ছিল ইয়াসরিব বা আসরিব। ইমাম বোখারীর ইতিহাস গ্রন্থে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি মদীনাকে একবার ইয়াসরিব বলবে সে যেন এর ক্ষতিপুরন স্বরূপ দশবার মদীনা মদীনা উচ্চারণ করে। ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন, যে মদীনাকে ইয়াসরিব বলে তার উচিত আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থণা করা। এ শহরের নাম তাবাহ। ইয়াসরিব শব্দটি আরবী 'সারব' শব্দ থেকে উৎকলিত যার অর্থ ফ্যাসাদ ও অনর্থ। আরবী 'তাসরিব' শব্দ থেকে উদ্ভুত ধরে নিলে অর্থ হয় 'ধর পাকড় ও শাস্তি'। প্রাক ইসলামী যুগে ইয়াসরিব নাম অনুযায়ী সেখানে সর্বদা ফিৎনা ফ্যাসাদ লেগেই থাকত। মহানবী (দ.) এর শুভাগমনে ইয়াসরিব মদীনা তাইয়্যেবায় পরিণত হয়ে বিশ্বের মধ্যে অদ্বিতীয় শান্তি নগরীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মদীনার অপর নাম 'ঈমান'। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন و الذين تبوء الدار و الايمان

অর্থাৎ যারা গৃহ ও ঈমানে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে ঈমান অর্থ মদীনা শরীফ।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) রেওয়াত করেন, নবী করিম (দ.) বলেন, যে ফেরেস্তা ঈমানদারের অন্তরে ঈমান এলহাম করেন সে ফেরেস্তা বলেন আমি মদীনার বাসিন্দা, কখনো এ শহর ত্যাগ করব না। এ কথা শুনে লজ্জার ফিরিস্তা বলেন, আমিও আপনার সঙ্গে আছি আপনার সঙ্গ ত্যাগ করব না। বলা বাহুল্য যে ঈমান ও লজ্জা এ দুটি গুণ মদীনা শহরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন বলা হয় الحياء من الايمان লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

মদীনার অপরাপর নাম যেমন খাইয়িরাহ ও খায়রাহ। হাদীছে পাকে আছে المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون মদীনা তাদের জন্য কল্যানময় যদি তারা জানত।

দারুল আবরার ওয়াল আখইয়ার (সৎ ও কল্যাণকামী লোকদের গৃহ), দারুল ঈমান ওয়াস সুন্নাহ (ঈমান ও সুন্নাতের গৃহ) দারুল ইসলাম (ইসলামের গৃহ), দারুল ফাতাহ (বিজয়ের গৃহ)

মদীনাপাকের এ রকম আরো অনেক নাম হাদীছের গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান। যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, মদীনা কেবল একটি শহরের নামই নয় বরং মহা মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় নগরী।

ছহীহ হাদীছে ওহুদ পাহাড়ের কথা বলার ঘটনা বর্ণিত আছে। অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত আছে- و الذي نفسي بيده تربتها المومنة "আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ, মদীনার মাটিও ঈমানদার"। আরো বর্ণিত আছে যে, তাওরাতে মদীনার নাম "মুমিনাহ"। ছহীহ বুখারী সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে আছে, আল্লাহর প্রিয় মাহবুব (দ.) এরশাদ করেছেন ঃ

اللهم حبب علينا المدينة كحبنا مكة او اشد হে আল্লাহ! আমাদের কাছে মদীনাকে মাহবুব তথা প্রিয় করে দিন যেমন মক্কা আমার কাছে প্রিয়, বরং তার চেয়ে অধিক।

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (র.) রচিত কিতাব "জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব" এ বর্ণিত আছে যে, মদীনা শরীফের হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মক্কার মতই কর্তব্য।

রাসুলে খোদা (দ.) অছিয়ত করেছেন যে, মদীনার বাসিন্দাদের সম্মান করা মুসলমানদের কর্তব্য এবং তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিত। এসব দাবীর প্রমাণ হুজুর (দ.) এর নিম্নোক্ত বাণীতে পাওয়া যায়। যেমন-

قال رسول الله صلي الله عليه و سلم المدينة مهاجري و فيها مضجعي و فيها مبعثي حقيقي علي امتي حفظ جيراني ما اجتنبوا الكباير من حفظهم كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامة و من لم يحفظهم سقي من طينة الحبال

অর্থাৎ মাহবুবে খোদা (দ.) এরশাদ করেছেন, "মদীনা আমার হিজরতের স্থান, এখানে আমার নিদ্রাকক্ষ (মাযার শরীফ) হবে, এখান থেকে আমার পুনরুত্থান, আমার উম্মতের উপর কর্তব্য আমার প্রতিবেশীদের হেফাজত ও সম্মান করা যে পর্যন্ত তারা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যে তাদের সম্মানের হেফাজত করবে আমি কিয়ামতের দিন তার সাক্ষ্য দাতা অথবা শাফায়াতকারী হব। আর যে তাদের হেফাজত করবে না তাকে 'তীনতে হিবাল' পান করানো হবে। (দোযখীদের রক্ত পুঁজের চৌবাচ্ছা থেকে পান করানো হবে) হুজুর (দ.) যখন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করেন তখন আল্লাহর দরবারে এই বলে দোয়া করেন- اللهم ان اخرجتني من احب البقاع الي فاكسني في احب البقاء اليك

অর্থাৎ হে আল্লাহ যদি আমাকে আমার সর্বাধিক প্রিয় ভূমি থেকে বাইরে নিয়ে যাও তবে আমার বসবাসের জন্য এমন একটি জায়গা নির্ধারণ করুন যা আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। এ দোয়ার ফল হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বাধিক প্রিয় স্থান মদীনা শরীফকে তাঁর মাহবুব (দ.) এর জন্য নির্ধারণ করেছেন। এতে প্রমাণিত হল, আল্লাহ ও রাসুল (দ.) নিকট মক্কা ও মদীনা শরীফ এ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ পর্যন্ত মদীনা পাকের শান-শওকত, মান-মর্যাদা সম্পর্কে হুজুর (দ.) এর অমীয় বাণী দ্বারা সম্যক ধারণা লাভ করেছেন। মদীনা শরীফের মান-মর্যাদা রক্ষা করা যেখানে প্রত্যেক ঈমানদারের নৈতিক কর্তব্য সে মদীনা পাকের সাথে ইয়াজিদ কি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণই না করেছে। যে হেরেমের মর্যাদা মক্কার হেরেমের সমতুল্য সেই হেরেমকে ইয়াজিদ বাহিনী ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়েছে। এমনকি যেখানকার বাসিন্দাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কিয়ামত দিবসে হুজুর (দ.) এর শাফায়াতের উপায় হিসেবে বর্ণনা দিয়েছেন, সেই মদীনাবাসীদেরকে ইয়াজিদ বাহিনী নির্বিচারে শহীদ করেছে। উল্লেখ্য যে, শহীদদের মধ্যে একহাজার সাতশত মুহাজির, আনছার, তাবেয়ী আলেম ও ফাজেল রয়েছে। এছাড়া নারী ও শিশু বাদ দিয়ে আরো দুহাজার সাধারণ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন যাদের মধ্যে সাতশত হাফেজে কুরআন ও সাতানব্বই (৯৭) জন কোরাইশ নেতৃবৃন্দ ছিলেন। এতসব কুকর্মের হোতা ইয়াজিদের উপর শরীয়তের কি দন্ড আরোপিত হওয়া উচিত তা পাঠক সমাজই বিচার করবেন।

ওয়াকেদী (র.) এর বর্ণনা মতে, হুজুর (দ.) কোন এক সফরে যাওয়ার সময় হাররা যাহরায় পৌছে দাড়িয়ে যান এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মনে করলেন যে, সম্ভবতঃ আমাদের এ সফরের পরিণাম শুভ নয়। তখন হযরত ওমর (রা.) ইন্না-লিল্লাহ পাঠের কারন কি জানতে চাইলেন। তদুত্তরে হুজুর পাক (দ.) বললেন, "তোমাদের এ সফরের সাথে আমার ইন্নালিল্লাহ পাঠের কোন সম্পর্ক নেই, বস্তুত আমি ইন্নালিল্লাহ পাঠ করেছি এ কারনে যে, আমার উম্মতের অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এ হাররায় শাহাদাত বরণ করবেন।" এই মর্মে অনেক হাদীছ রয়েছে।

এজিদের নির্দেশ সেনাপতি মুসলিমকে বিদায় দেয়ার সময় ঃ

قال يا مسلم لا تردن اهل الشام عن شئ يريدون يعدوهم و اجعل طريقك علي المدينة فان حاربوك فحاربهم فان ظفرت بهم فابحهم ثلاثا (اوجز المسالك ج٣ص٤٨٢)

হে মুসলিম! শাম দেশের এ বাহিনী তাদের শত্রুদের সাথে যে আচরণই করতে চাইবে তুমি কখনও তাতে বাধা দেবে না। তুমি মদীনার পথ ধরে যাত্রা করবে। তারা যদি লড়াই করে তুমি তাদের বিরুদ্ধে লড়বে। তাদেরকে পদানত করতে পারলে তিন দিনের জন্য মদিনাকে (অপকর্ম ও রক্তপাত ইত্যাদি করার জন্য) হালাল করে দেবে। (আওজাযুল মাসালিক ৩য় খন্ড ৪৮২)

ইয়াজিদের তৃতীয় কু-কর্মঃ মক্কা শরীফ আক্রমণ ঃ

মক্কা নগরীতে অবস্থিত কাবা শরীফের পবিত্রতা (মর্যাদা) রক্ষা করা যে কোন ঈমানদারের ঈমানী, ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। ঐ স্থানে রক্তপাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ইয়াজিদী বাহিনী সে পবিত্রতা ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে যে জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত করেছে তার কাহিনী হযরত হাসান বসরী (রা.) এর বর্ণনা থেকে শোনা যাক তিনি বলেন, ইয়াজিদ বাহিনী রাসুল (দ.) এর হেরেম মদীনা শরীফ ধ্বংস করে অতঃপর ইব্নে যুবাইরের (রা.) সাথে যুদ্ধ করার নিমিত্তে পবিত্র মক্কায় আক্রমন করে এবং কামান দ্বারা খানায়ে কাবার উপর প্রস্তর বর্ষণ করে। ফলে কাবাতুল্লাহর একখানা দেয়াল ভেঙ্গে যায়। এমন কি তারা কাবা শরীফে অগ্নি সংযোগও করেছে। (আততাবারী ৪র্থ খন্ড ৩৮৩ পৃষ্ঠা, ইবনুল আসীর ৩য় খন্ড ৩১৬ পৃষ্ঠা, আলবেদায়ী ৮ম খন্ড ২২৫ পৃষ্ঠা)

ইয়াজিদ কর্তৃক যে কাবা শরীফের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়, সেই কাবাতুল্লাহর মান-মর্যাদা ইসলামী শরীয়তে কিরূপ?

কাবা শরীফের মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন ঃ

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا و هدي للعالمين- فيه ايات بينات مقام ابراهيم و من دخله كان امنا (ال عمران ٩٦-٩٧)

অর্থাৎ নিশ্চয় সর্ব প্রথম ঘর যা সকল মানবজাতির ইবাদতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতময় এবং সমগ্র বিশ্বের পথ প্রদর্শক। যার মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশনাদি রয়েছে, ইব্রাহীম (আ.) এর দাঁড়াবার স্থান এবং যে ব্যাক্তি তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে। (আল ইমরান ৯৬-৯৭)

কাবা ঘরের জিয়ারতে বাধা প্রদানের পরিণতি প্রসঙ্গে ঃ

সহীন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله و المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه و الباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم (الحج ٢٥)

অর্থাৎ নিশ্চয় ঐ সব লোক যারা কুফরী করে এবং নিবৃত্ত রাখে আল্লাহর পথ ও ঐ সম্মানিত মসজিদ থেকে যাকে আমি সমস্ত লোকের জন্য স্থির করেছি যে, তাতে সমান অধিকার রয়েছে সেখানকার অধিবাসী ও বহিরাগতদের জন্য। আর যে কেউ তাতে যে কোন সীমা লংঘনের অসৎ ইচ্ছা করে আমি তাকে কষ্টদায়ক শাস্তির আস্বাদন করাবো। (১৭ পারা সুরা হজ্ব ২৫নং আয়াত) 'ইলহাদ বিজুলমিন' অর্থাৎ 'অন্যায়ভাবে সীমা লংঘন' প্রত্যেক নিষিদ্ধ কথা ও কাজ।

কাবা ঘর সম্পর্কে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আরো এরশাদ করেছেন ঃ

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس (المايدة٩٧)

আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত কাবা ঘরটিকে মানুষের ঠিকে থাকার অবলম্বন বানিয়েছেন। (মায়েদা ৯৭)

মহানবী (দঃ) দীপ্ত কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঘোষণা করেন ঃ

انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها و له كل شئ و امرت ان اكون من المسلمين (نمل ٩١)

অর্থাৎ আমাকে তো এ-ই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি ইবাদত করি এই শহরের প্রতিপালকের। যিনি সেটাকে সম্মানিত করেছেন এবং সব কিছু তাঁরই। আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত হই।

কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় পবিত্র হাদীছ শরীফে নিম্নরূপে বর্ণনা দেয়া হয়েছে-

قوله حرمها لا يسفك فيها دم و لا يظلم فيها احد و لا يهاج صيدها و لا يختلي خلاها و تخصيص مكة بهذه الاوصاف تشريف لها و تعظيم لشانها (بخاري ج١ص ٢١٦ الهامش رقم ٥)

আল্লাহর বাণী "হাররামাহা" (নিষিদ্ধ করেছেন) এর অর্থ হল, ঐ নগরীতে রক্তপাত করা যাবে না, ওখানে অবস্থানকারী জন্তুকুলকে উৎপীড়ন করা যাবে না, ওখানে ঘাস-লতা-পাতা কাটা যাবে না। কাবাতুল্লাহর প্রতি সম্মান ও তাযিম দেখানোর উদ্দেশ্যে মক্কা নগরীর এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। (বুখারী শরীফ ২১৬/১ টিকা ৫)

মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (দ.) যে ভাষণ দান করেন তাতে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন- কিয়ামত পর্যন্ত মক্কা শান্তির নগরী রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সুরা আল ইমরানের ৯৭নং আয়াতে বলা হয়েছে- و من دخله كان امنا "ওখানে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদে থাকবে"। মহানবী (দ.) এ প্রসঙ্গে বলেন- لا يحل لاحدكم ان يحمل بمكة السلا ح তোমাদের কারোর জন্য মক্কায় অস্ত্র বহন করে চলা বৈধ হবে না। (মুসলিম ৪৩৯/১)

মহানবী (দ.) আরো এরশাদ করেন ঃ

ان مكة حرمها الله فلم يحرمها الناس لا يحل لامرأ يومن بالله و اليوم الاخر ان يسفك بها دما (بخاري ج٢ص٦١٥)

নিশ্চয় মক্কা নগরীকে আল্লাহ নিষিদ্ধ নগরী করেছেন এটা কোন মানুষের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়নি। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের বিশ্বাসী তার জন্য মক্কা নগরীতে রক্তপাত বৈধ হবে না। (বোখারী ৬১৫, ২য় খন্ড)

মক্কা নগরী ও কাবা শরীফের মান-মর্যাদা কিরূপ তা আল্লাহ ও রাসুল (দ.) এর বাণী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। যে ঘর সমগ্র বিশ্বের পথ প্রদর্শক, যে ঘরে প্রবেশ করলে পূর্ণ নিরাপত্তা পাওয়া যায়, যেখানে রক্তপাত, জন্তু জানোয়ারের উৎপীড়ন, ঘাস লতা পাতা কাটা বৈধ নয়, সে ঘরের প্রতি এবং সেখানকার বাসিন্দাদের প্রতি ইয়াজিদ কি জঘন্যতম কর্মকান্ড করেছে তার বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মদিনার বাসিন্দাদের প্রতি ইয়াজিদের নিষ্ঠুর আচরণ এবং কাবাতুল্লাহর উপর আক্রমন তার ঈমানহীনতার পরিচয়।

সাধারন মুমিনের মর্যাদা ঃ

عن نافع نظر ابن عمر يوما الي البيت او الي الكعبة فقال ما اعظمك و اعظم حرمتك و المومن اعظم حرمة عند الله منك (ترمذي ج٢ ص٢٤)

হযরত নাফে (রা.) বলেন একদিন হযরত ইবনে উমর (রা.) বায়তুল্লাহ বা কাবা শরীফের দিকে দৃষ্টি দিলেন, অতঃপর বললেন, (হে আল্লাহ্র ঘর) তুমি কতই না মর্যাদার অধিকারী ও তুমি কতই না সম্মানের অধিকারী! কিন্তু একজন মুমিন আল্লাহর নিকট সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তোমার চেয়ে অনেক মর্যাদাবান (তিরমিজী ২য় খন্ড ২৪ পৃঃ)

باب الحب في الله و من الله عن عايشة قالت قال رسول الله صلي الله عليه و سلم الارواح جنود مجندة فما تعارف فيها ايتلف وما تناكر منها اختلف(بخاري , مسلم)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, রুহ্ এর জগতে সকল রুহ সারিবদ্ধ সৈনিকের ন্যায়, সেখানে যার সাথে সুপরিচয় হয়েছে তারা ইহজগতেও পরস্পরের মুহব্বতের সাথে ঝুকে পড়বে এবং যাদের সাথে সুপরিচিত হয়নি তারা ইহজগতে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে । (বোখারী ও মুসলিম)

ইয়াজিদ যাকে শহীদ করেছে পবিত্র ইসলামে সেই ইমাম হোছাইন (রাঃ) এর মর্যাদা ঃ

মহান রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন- قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربي(الاية)

অর্থাৎ আপনি বলুন আমি সেটার জন্য (রিসালতের প্রচার, উপদেশ দান ও সৎ প্রদর্শন) তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না কিন্তু নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা চাই।

ব্যাখ্যা ঃ একজন মুসলমান অপর একজন মুসলমান ভাইয়ের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন "মূমিন নর-নারীগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ও সাহায্যকারী"। হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, "মুসলিম জাতি একটা প্রাসাদের মতো, এক অংশ অপর অংশকে শক্তি যোগায়"। মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর ভালবাসা রাখা (ফরজ) অপরিহার্য। যেখানে একজন সাধারণ মুসলমানের প্রতি অপর একজন মুসলমানের ভালবাসা অপরিহার্য সেখানে নবীকূল সর্দার ও তাঁর নিকটাত্মীয়ের (দৌহিত্রের) প্রতি ভালবাসা কেবল অপরিহার্যই নয়, সেটি ঈমানও বটে। যেমন- হুজুর (দ.) ও তাঁর নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা দ্বীনের ফরজসমূহের অন্যতম। (জুমাল ও খাযিন ইত্যাদি)

মহানবী (দ.) নিকটাত্মীয় বলতে কাদেরকে বুঝিয়েছেন সে সম্পর্কে তাফসীর ও হাদীস শরীফের আলোকে কতিপয় অভিমত ঃ

হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "আত্মীয়গণ দ্বারা হুজুর (দ.) এর পবিত্র বংশধরকে বুঝানো হয়েছে" (বোখারী শরীফ)।

প্রথম অভিমত ঃ হুজুর (দ.) এর নিকটাত্মীয় বলতে যাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে তাঁরা হলেন- হযরত আলী (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোছাইন (রা.)।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ হযরত আলী (রা.), হযরত আক্বীল (রা.), হযরত জাফর (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.) এর বংশধরগণ।
তৃতীয় অভিমত ঃ হুজুর (দ.) এর ঐ সব নিকটাত্মীয়গণ যাঁদের জন্য জাকাত গ্রহণ হারাম।

قالوا يا رسول الله من قرابتك هولاء الذين وجبت علينا مودتهم فاجاب النبي صلي الله عليه و سلم علي و فاطمة و الحسن و الحسين و ابناهما رضي الله عنهم (تفسيرابن عربي ج٢ ص٢١٢)

قالوا يا رسول لله صلي الله عليه و سلم من قرابتك و الذين نزلت فيهم الاية قال علي و فاطمة و ابناهما جلالين مصري (ج٢ ص٣٢ مدارك ج٤ ص١٠٥)

অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরামগণ জানতে চাইলেন যে, হে আল্লাহর রাসুল (দ.)! আপনার ঐ সব নিকটাত্মীয়গণ কারা যাঁদের প্রতি আমাদের ভালবাসা ফরজ বা যাদের ভালবাসার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আয়াত অবতীর্ন হয়েছে? তদুত্তরে হুজুর (দ.) বললেন- আলী (রা.), ফাতেমা (রা.), হাসান (রা.), হোছাইন (রা.) ও তাঁদের সন্তানগণ।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন " انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا
অর্থাৎ হে নবীর (দঃ) পরিবারবর্গ! আল্লাহপাক তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন। এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হল, যে পরিবারের পবিত্রতার রক্ষা কবচ স্বয়ং রাব্বুল আলামিন সেই পরিবারবর্গ কতই মহান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তা সহজেই অনুমেয়।

তিরমীজি শরীফের ২য় খন্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে

فدعا النبي صلي الله عليه و سلم علي و فاطمة و الحسن و الحسين رضي الله عنهم فقال اللهم هولاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهيرا و نزلت الاية المذكورة في بيت ام سلمة رض و جائت امام النبي صلي الله عليه و سلم و قالت انا معهم يا رسول الله قال صلي الله عليه و سلم انت علي مكانك انت علي الخير (ترمذي ج٢ ص٢٢٧)

উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হুজুর (দ.) হযরত আলী (রা.), ফাতেমা (রা.), হাসান (রা.) ও হোছাইন (রা.) কে একত্রিত করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! এরা সব আমার আহলে বাইত। তাঁদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন এবং তাদেরকে খুব পরিচ্ছন্ন করুন।

উক্ত আয়াতখানা হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর ঘরে অবতীর্ণ হয়। ঐ সময় হযরত উম্মে সালমা (রা.) এসে হুজুর পাক (দ.) এর দরবারে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (দ.)! আমিও তাঁদের সাথে আছি। হুজুর (দ.) বললেন, তুমি তোমার স্থানে, তুমিও কল্যাণের উপর আছ। (তিরমীজি শরীফ ২য় খন্ড ২২৭ পৃঃ)

হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন

عن ابي هريرة قال نظر النبي صلي الله عليه و سلم الي علي و الحسن و الحسين و الفاطمة فقال انا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم (البداية و النهاية ج٢ ص ٢٠٥)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন "হুজুর পাক (দ.) একদা আলী (রা.), হাসান (রা.), হোছাইন (রা.) এবং ফাতেমা (রা.) দিকে দৃষ্টি দিলেন অতঃপর বললেন, যারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ করবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব, যারা তাঁদের সাথে শান্তি চুক্তি করবে আমিও তাই করব।

انس بن مالك يقول سئل رسول الله صلي الله عليه و سلم اي اهل بيتك احب اليك قال الحسن و الحسين (الاستيعاب ج١ ص ٣٨٠)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসুল (দ.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে "আপনার আহলে বাইতের মধ্যে কে আপনার অধিক প্রিয় ?" হুজুর (দ.) বললেন, হাসান (রা.) ও হোছাইন (রা.)।

قال رسول الله صلي الله عليه و سلم من احبهما فقد احبني و من ابغضهما فقد ابغضني (يعني حسنا وحسينا رض)
مشكوة ج٢ ص٢٤٤ - مسند احمد ج٢ ص ٢٨٨ - ترمذي ج٢ ص٢٤١

হুজুর (দ.) আরো বলেন যে ব্যক্তি উভয়কে ভালোবাসেন নিশ্চয় সে আমাকে ভালবাসল এবং যে উভয়ের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করল সে বস্তুতঃ আমার সাথেই ঈর্ষা পোষণ করল (অর্থাৎ হাসান ও হোছাইন রা.)

عن علي قال الحسن اشبه رسول الله صلي لله عليه و سلم ما بين الصدر الي الرأس و الحسين اشبه النبي صلي الله عليه و سلم ما كان اسفل من ذالك (مشكوة ج٢ ص٦٤٠ , ترمذي ج٢ ص٢٤٣ , مسند احمد)

আলী (রা.) বলেন, হাসান (রা.) বক্ষ থেকে মাথা পর্যন্ত রাসুল (দ.) এর সাদৃশ্য এবং হোছাইন (র.) বক্ষ থেকে নিচের দিকে পরিপূর্ণ রাসুল (দঃ) এর সদৃশ্য।

قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ان الحسن و الحسين هما ريحانتان من الدنيا ٠ (مشكوة)

হুজুর (দ.) এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে হাসান ও হোছাইন (রা.) দুনিয়াতে আমার বেহেস্তী দু'টি ফুল (মিসকাত)
ব্যাখ্যা ঃ ফুলের রূপ, বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি মূল থেকে উৎসরিত। ঐ মূলই হচ্ছে হুজুর সৈয়্যদে আলম (দ.), যাঁদেরকে হুজুর (দ.) কাঁধে উঠাতেন, নামাযরত অবস্থায় হুজুর (দ.) এর কাঁধে ছড়ে বসলে রুকু সিজ্দা বিলম্বিত করতেন, যাঁদের কান্না মহানবী (দ.) এর কাছে একেবারে অসহ্য ছিল, যাঁদেরকে 'বেহেস্তী যুবকদের সর্দার' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যাঁদের স্মরণ আল্লাহর যিকির। (২৮নং আয়াত ছুরা রাদ)

ইমাম হোছাইনের (রা.) মস্তক মুবারকের প্রতি ইবনে যিয়াদ ও সিনানের আচরণ ও কটুক্তি ঃ

আল্লামা ইবনে কাছির (র.) বর্ণনা করেন-

لما قتل ابن زياد الحسين رض ومن معه بعث بروسهم الي يزيد فسر بقتله اولا و حسنت بذلك منزلة ابن زياد عنده ثم لم يلبث الا قليلا حتي ندم و قد لعن ابن زياد علي فعله ذلك و شتمه في ما يظهر و يبدأ و لكن لم يعز له علي ذلك و لا اعقبه و لا ارسل احدا يعيب عليه ذلك و الله اعلم (البداية و النهاية ج٨ص٢٠٣, ٢٣٢)

অর্থাৎ ইবনে জিয়াদ যখন ইমাম হোছাইন (রা.)সহ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের শহীদ করে তাঁদের মস্তক মোবারক ইয়াজিদের নিকট প্রেরণ করল, এতে ইয়াজিদ প্রাথমিকভাবে আনন্দিত হল এবং তার নিকট ইবনে জিয়াদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু তার ঐ আনন্দ স্থায়ী হলো না। অল্প সময় পর সে লজ্জিত হল। ইবনে জিয়াদকে তার এ কাজের জন্য অভিসম্পাত ও গালি দিল। যা ছিল তার প্রকাশ্য দিক। (ইবনে জিয়াদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করা এবং তিরস্কার করা ছিল লোক দেখানো) সত্যিকারভাবে তিরস্কার করা হলে তাকে পদচ্যুত করা হত কিংবা শাস্তি দেয়া হত। যেহেতু এসব কোন কিছুই করা হয়নি, সেহেতু গালি দেয়া বা অভিসম্পাত দেয়া ছিল জনগণের রোষানল থেকে নিজেকে বাঁচানোর একটি রাজনৈতিক কুট-কৌশল মাত্র। পরিশেষে বলা যায়, এ বিষয়টির আসল রহস্য আল্লাহই ভাল জানেন। (আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খন্ড ২০৩-২৩২ পৃষ্ঠা)

আহলে বাইতের কাফেলাকে বন্দী করে ইবনে জিয়াদের নিকট প্রেরণ করে এবং শহীদগণের মস্তক মোবারক তার দরবারে উপস্থাপন করে সিনান ইবনে নখঈ নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করে-

املا ركابي فضة و ذهبا -- اني قتلت السيد المحجبا
قتلت خير الناس ابا و اما -- و خيرهم اذ يذكرون نسبا

অর্থাৎ আমার পাত্র (বরতন) স্বর্ণ-রৌপ্যে পরিপূর্ণ হল। নিশ্চয় আমি সম্মানিত সর্দারকে কতল করেছি। আমি হত্যা করেছি এমন একজন ব্যক্তিকে যিনি মা-বাবা উভয় দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে উত্তম। বংশ বিবেচনায়ও তাঁরা সর্বোত্তম।

ইবনে জিয়াদ সিনানের মুখে এ ধরনের প্রশংসামূলক কবিতা শুনে ইমাম হোছাইন (রা.) এর প্রশংসাগীতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে সাথে সাথেই তাকে (সিনানকে) হত্যা করল। এতে বুঝা যায় যে, হোছাইন (রাঃ) কে হত্যা করার নির্মম পরিণতি স্বরূপ সেও এ হত্যার সম্মুখীন হল। এতে ইমাম হোছাইন (রা.) এর হত্যাকারীর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক গযবের দৃষ্টান্ত মেলে। অতঃপর ইবনে জিয়াদ দরবারপূর্ণ লোকজনের সামনে হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) এর দাঁত মোবারকের উপর নিজ লাঠি দ্বারা আঘাত করতে লাগলো। এ সময় দরবারে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে হুজুর (দ.) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জায়েদ বিন আরকাম (রা.) উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাবরানীর বর্ণনা-

و للطبراني من حديث زيد بن ارقم فجعل يجعل قضيبا في يده و في عينيه و انفه فقلت ارفع قضيبك فقد رايت فم رسول الله صلي الله عليه و سلم في موضعه و له من وجه اخر عن انس رض نحوه (فتح الباري ج٧ص٧٥)

তাবরানীর বর্ণনায় যায়েদ বিন আরকমের হাদিস এটাই যে, ইবনে জিয়াদ নিজ হাতে লাঠি দ্বারা ইমাম হোছাইন (রা.) এর চোখ, নাক, মুখ আঘাত করতে লাগল। আমি বললাম, "তোমার লাঠি উঠাও, নিশ্চয় আমি রছুল (দ.) এর মুখ মোবারক এসব স্থানে চুমু খেতে দেখেছি"। ঐ ধরনের একটা হাদিস হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। 'ফতহুল বারী' ৭ম খন্ড ৭৫ পৃ.) আরও বিস্তারিত বর্ণনা আছে- 'আইনী শরহে বোখারী' ৭ম খন্ডের ৬৭৫ পৃষ্ঠায়।

ইয়াযিদের আচরণ ও কটুক্তি ইমাম হোছাইনের প্রতি ঃ

কুফা থেকে দামেস্কে ইয়াজিদের দরবারে ইমাম হোছাইন (রা.) এর মস্তক মোবারক রাখা হলে ইয়াজিদও ইবনে জিয়াদের ন্যায় হোছাইন (রা.) এর দাঁত মোবারকে স্বীয় লাঠি দ্বারা আঘাত করে বলতে লাগল-

ابي قومنا ان ينصفون و انصفت -- قواضب في ايماننا تقطر الدماء
نفلق هاما من رجال اعزة -- علينا و كانوا هم الحق و اظلما (شرح مسلم غلام رسول سعيدي ج٣ص٦٢١)

বিদায় নিয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও হযরত দাউদ (আ.) এর উম্মতগণ আমাকে অসীম তাজীম ও সম্মান করে থাকে। অথচ তোমরা তোমাদের নবী (দ.) এর দৌহিত্রকে মর্যাদা তো দিতে পারলে না, উপরন্তু তাঁকে শহীদ করলে। (আস্সাওয়ায়েকুল মুহরিকাহ, পৃষ্ঠা-১৯৯)

ইয়াজিদ সম্পর্কে মহানবী (দ.) এর হাদীছ ঃ

قال ابو هريرة سمعت الصادق المصدوق ﷺ هلكة امتي علي ايدي غليمة من قريش (صحيح البخاري ج٢ص١٠٤٦)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (দ.) এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের ধ্বংস কোরাইশ বংশের এক যুবকের হাতে। (বোখারী- কিতাবুল ফিতন, ২য় খন্ড ১০৪৬ পৃষ্ঠা)

অন্যত্র রাছুল (দ.) এরশাদ করেছেন,

لا يزال امر هذه الامة قائما بالقسط حتي يكون اول من يثلمه رجل من بني امية يقال له يزيد (البداية و النهاية ج٨ص٢٣١)

আমার উম্মতের কাজ, হুকুম-আহকাম ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে চলতে থাকবে। সর্বপ্রথম যে বরবাদ করবে, সে বনি উমাইয়া বংশের লোক, তাকে 'ইয়াজিদ' বলা হবে। (তার সনদে দূর্বল দিক রয়েছে) (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৮ম খন্ড ২৩১ পৃঃ)

ইয়াজিদ ইমাম হোছাইন (রা.) এর হত্যার নির্দেশ দাতা কিনা এবং তার উপর লা'নত দেয়া বৈধ কিনা? ঃ

ইয়াজিদ কর্তৃক তিনটি অপরাধ অনবরত বা ক্রমাগত ছিল। ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে ইমাম হোছাইন (রা.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাবার সময় ইয়াজিদ হোছাইন (রা.) এর উচ্চমর্যাদা সর্ম্পকিত কোন উপদেশ যে দেয়নি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হোছাইন (রা.) কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে কিনা বা তাঁর (রা.) হত্যার সংবাদ শুনে খুশি হয়েছে কিনা এ রকম আরো নানা কথা যে গুলো ইয়াজিদের পক্ষ থেকে পাওয়া যায় সে বিষয়ে এখতেলাফ বা অনৈক্য রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন এখতেলাফ নেই যে, ইয়াজিদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হোছাইন (রা.) এর হত্যাকারী জালেমদের কোন প্রকার শাস্তি দেয়নি। এতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম হোছাইন (রা.) এর হত্যা ইয়াজিদের নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছিল এবং তাতে তার সম্মতিও ছিল। তাই ইমাম আহমদ (র.), আল্লামা ইবনে জুযী (র.), আল্লামা তাফতাজানী (র.) এর ন্যায় বিশ্ব বিখ্যাত মুসলিম মনিষীগণ ইয়াজিদকে অভিসম্পাত দেয়া বৈধ বলেছেন।

যদি কোন প্রশ্নকর্তা এ প্রশ্ন করে যে, হযরত ইমাম হোছাইন (র.) এর হত্যাকারী হিসেবে ইয়াজিদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করা ঠিক হবে কিনা?

তদুত্তরে আমরা বলতে পারি যে, হযরত মাসউদ বিন ওমর বিন আবদুল্লাহ তাফতাজানী (র.) রচিত বিশ্বখ্যাত আকায়েদের কিতাব 'শরহে আকাইদুন নাসাফী'র মধ্যে রয়েছে-

وبعضهم اطلق اللعن عليه لما انه كفر حين امر بقتل الحسين رض و اتفقوا علي جواز اللعن علي من قتله او امر به او اجازه و رضي به و الحق ان رضا يزيد بقتل الحسين و استبشاره بذلك و اهانة اهل بيت النبي صلي الله عليه و سلم لما تواتر معناه و ان كان تفاصيله احادا فنحن لا نتوقف في شانه بل في ايمانه لعنة الله عليه و علي انصاره و اعوانه

অর্থাৎ "আর কেহ কেহ ইয়াজিদের উপর লানত করেছেন। কেননা, সে হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) কে শহীদ করার নির্দেশ যখন দিয়েছে তখনই সে কাফির হয়ে গেছে এবং সমস্ত আলেমগণ ঐ ব্যক্তিকে লা'নত দেয়া বৈধ হওয়ার উপর একমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ইমাম হোছাইন (রা.) কে শহীদ করেছে অথবা হত্যার আদেশ দিয়েছে কিংবা এ হত্যার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

মোদ্দাকথা হলো এই, ইয়াজিদ যদি হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) এর শাহাদতের ব্যাপারে রাজী থাকে, তাহলে তার উপর লা'নত দেয়া বৈধ হবে।

তাঁর শাহাদতে (অর্থাৎ ইমাম হোছাইন (রা.) এর) ইয়াজিদের আনন্দিত হওয়া, রাসুলে খোদা (দ.) এর বংশধরদেরকে ঘৃণা করা বা অপমান করার বিষয়ে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যা অর্থের দিক দিয়ে মোতাওয়াতেরের (ধারাবাহিকতার) পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যদিও পৃথক পৃথক ভাবে খবরে ওয়াহেদ।

ইয়াজিদের ব্যাপারে আমরা কোন প্রকার নীরবতা পালন করব না বরং সে ঈমানদার কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণকারী। আল্লাহ তার উপর, তার সাহায্যকারীদের উপর এবং তার দলের উপর লা'নত বর্ষণ করুন।

ইয়াজিদের ঈমানের উপর নীরব থাকা এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, হযরত ইমাম হোছাইন (রা.) এর শহীদ হওয়ার সংবাদে যে আনন্দিত হয়েছে যা মুতাওয়াতের (ক্রমাগত) সুত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু সেই অপরাধমূলক কর্মকান্ডের জন্য সে পরবর্তীতে তাওবা (অনুশোচনা) করেছে কিনা তা অজানা রয়েছে।

অর্থাৎ, আমাদের গোত্র তাদের (বনু হাশেম) ব্যাপারে তাদের নিকট থেকে (হাশেমী বংশ থেকে) ইনসাফ করতে অস্বীকার করেছে। এমতাবস্থায় আমাদের ডানহস্তে ধারনকৃত রক্তঝরা তীরসমূহ তাদের ব্যাপারে ইনসাফ করেছে। আমরা তাদের মস্তকের অগ্রভাগ ভাংতেছি যে, তারা কখনও আমাদের উপর জয়লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা হত্যাকারী ও জালেম।

ইয়াজিদ আরো বলে- ليت اشياخي ببدر شهدوا -- جرع الخزرج من وقع الاسل

অর্থাৎ, যদি এমন হতো অর্থাৎ জীবিত থাকতো বদরযুদ্ধে মৃত্যু বরণকারী আমাদের বাপ দাদারা, তাহলে তারা বর্শা-বল্লম-গুলির আক্রমনের কারণে খাজরায বংশের চিৎকারের দৃশ্য দেখত। সে আরও বলে-

قد قتلنا الضعف من اشرافهم -- و عدلنا ميل بدر فاعتدل

অর্থাৎ, আমরা তাদের সর্দারদের দু'গুণ চারগুণ হত্যা করেছি এবং বদরের দিনে যে জুলুমের কাজ হয়েছে তার পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিয়েছি বা নিচ্ছি।

لما بدت تلك الحمول و اشرفت -- تلك الروس علي شفا جيرون

تعب الغراب فقلت قل او لم تقل -- قد اقتضيت من الرسول ديوني

অর্থাৎ যখন ইয়াজিদ বাহিনী ঐ সব হোছাইনী (রা.) বন্দীসহ শহীদগণের মাথা (মুবারক)গুলো নিয়ে তাদের ঘোড়া 'জায়রুন' নামক পাহাড়ের চূড়ায় প্রকাশ পায়, তখন কাকের দল অশুভ লক্ষণ হিসেবে কা' কা' করে চিৎকার করতে থাকে। তখন আমি (ইয়াজিদ) বলতে থাকি, "কা' কা' কর কিংবা নাই কর তাতে কোন পরওয়া নেই, আমি রাসুল (দ.) হতে আমার পুরাতন কর্জ পরিশোধ করেছি।"

মুফ্তি আমিমুল ইহসান (র.) রচিত "তারিখুল ইসলাম" এর মধ্যে কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (র.) বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন-

امروز بران محمد ﷺ انتقام كرده ام از روز بدر اخران ابيات ايں بيت است

ولست من جندب ان لم انتقم -- من بني احمد ما كان قد فعل

অদ্য মুহাম্মদ (দ.) এর নিকট থেকে বদর দিনের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। আমি জুনদুব বংশ থেকে নই, যদি আমি হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর বংশধররা যা করেছে (বদর দিবসে), তার বদলা তাদের থেকে না নিয়ে থাকি।

শরীয়তে মুহাম্মদীয়ায় ইয়াজিদের হস্তক্ষেপ ঃ

و اخرج الواقدي من طرق ان عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال و الله ما خرجنا علي يزيد حتي خفنا ان ترمي بالحجارة من السماء انه رجل ينكح امهات الاولاد و البنات والاخوات و يشرب الخمر و يدع الصلواة ـ

ওয়াকিদী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ফেরেস্তা কর্তৃক গোসলপ্রাপ্ত হযরত হানযালা (রা.) এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেন ঃ খোদার কসম, আমাদের উপর আসমান হতে পাথর বর্ষণের ভয় পরিলক্ষিত হলেই আমরা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি। সে উম্মূল আউলাদ নারী, বোন ও নিজ কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ করে দেয়, মদ পান করে, নামায ছেড়ে দেয়।

و ايضا قال الذهبي و لما فعل يزيد باهل المدينة ما فعل مع شرب الخمر ----

আল্লামা যাহাবী (র.) বলেন, ইয়াজিদ মদীনাবাসীদের সাথে যথেচ্ছাচার করার পর উপরন্তু মদ খাওয়া ও অবৈধ কর্ম করার দরুন জনগণ তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়, তার সাথে বিদ্রোহ করে। (তারীখে খোলাফা ঃ ২০৯ পৃষ্ঠা)

মুফতী আমিমুল এহসান (র.) তাঁর 'তারীখে ইসলাম' এর ১৭৭ নং পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

وخمر را حلال گفت

فان حرمت يوما علي دين احمد ﷺ -- فخذها علي دين مسيح ابن مريم

ইয়াযিদ বলে- যদিও বর্তমানে শরীয়তে মুহাম্মদী (দ.) অনুযায়ী এ শরাব হারাম, তবে তা তুমি ঈসায়ী ধর্ম হিসাবে গ্রহণ কর। (সে শরাব বৈধ বলছে এবং বৈধ হিসাবে পান করছে।)

ইয়াজিদের অন্যায় নির্দেশে শামী পৈশাচিক বাহিনী গণহত্যা ও নারী নির্যাতনে মেতে উঠে। পথে-ঘাটে যাকে পায় হত্যা করে। এজিদী সেনারা শহীদ করেছে- ওহুদের ময়দানে শাহাদতপ্রাপ্ত হযরত হানযালা (রা.) এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা.) এবং মুহাজির-আনসারদের সাতশত জনকে।

ইয়াজিদের কু-কর্মের জন্য এক ইহুদীর অভিশাপ দান ঃ

ইমাম হোছাইন (রা.) এর মস্তক মোবারকের প্রতি ইয়াজিদের তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের সময় তার দরবারে এক ইহুদীও উপস্থিত ছিল। সে এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বলল, আমি হযরত দাউদ (আ.) এর বংশের একজন। আমার পূর্বে ৭০ পূর্বপুরুষ

উপরোক্ত আলোচনার কিছু ব্যাখ্যাদান আবশ্যক। যেমন- গর্হিত (গুনাহের) কাজ যদি খুশী ও আনন্দচিত্তে করা হয়, তাহলে কুফরী আবশ্যক হয়। কিন্তু দুনিয়াবী ব্যাপারে শত্রুতা পোষণ করে যদি আনন্দ উপভোগ করে, তাহলে কুফরী আবশ্যক হয় না। কিন্তু ইয়াজিদের মধ্যে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত আরো অনেক কুফরী বাক্য ও কর্ম বিদ্যমান ছিল, যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অনুশোচনা (তাওবা) করেছে এরকম কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারা ও মক্কা মুয়াজ্জমায় আক্রমনের ন্যায় গর্হিত কাজ করার ফলে তার মধ্যে ঈমানের গন্ধ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন মনে হয়।

হাদীসের আলোকে ইয়াজীদের প্রতি লানতের প্রমাণ ঃ মদীনা শরীফের উপর জুলুমকারীর উপর লা'নতঃ

عن عبادة بن الصامت رض عن رسول الله ﷺ انه قال اللهم من ظلم اهل المدينة و اخافهم فاخف و عليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين لانقبل منه صرف و لا عدل (رواه الطبراني في الاوسط)

হযরত উবাদা বিন ছামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত রাসূলে করীম (দ.) থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর পাক (দ.) এরশাদ করেন, হে আল্লাহ! যে মদীনাবাসীর প্রতি অত্যাচার করে এবং তাঁদের প্রতি ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তুমিও তার প্রতি ভীতি প্রদর্শন কর এবং তার উপর আল্লাহ, ফেরেস্তা এবং সর্ব-সাধারণের অভিসম্পাত (লানত) রয়েছে। হুজুর পাক (দ.) আরো বললেন, তার কোন নফল এবং ফরজ ইবাদত গৃহীত হবে না।

عن عبد الله بن عمرو رض ان رسول الله ﷺ قال من اذي اهل المدينة اذاه الله و عليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين لايقبل منه صرف و لا عدل (ذكره ابو النعيم في معرفة الصحابة)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে কষ্ট দিবে আল্লাহ পাক তাকে ইহ ও পরকালে কষ্ট দিবেন এবং তার উপর আল্লাহ, ফিরিস্তা ও সর্ব-সাধারনের লানত রয়েছে। তার কোন নফল ও ফরজ ইবাদত কবুল হবেনা।

অনুরূপ অনেক হাদীস তাবরানী, কাবীর, আওসাত এবং নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে।

মুছান্নেফে আবদুর রাজ্জাকসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে অনুরূপ অর্থে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। নাসির উদ্দিন আলবানীও তাঁর লিখিত হাদীসগ্রন্থ 'সিলসিলাতুল আহাদিছিস সহীহা' এর মধ্যে এ জাতীয় হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

আল কোরআনের আলোকে সাধারন লানত ঃ

ان الذين كفروا و ماتوا و هم كفار اولئك عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين

নিশ্চয়ই ঐসব লোক যারা কুফরী করেছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেস্তাকুল এবং মানবকুল সাধারণের অভিসম্পাত (লা'নত) রয়েছে । (ছুরা বাকারা আয়াত নং- ১৬১)

মুমিনতো কাফেরদের উপর লা'নত করবেনই। কেয়ামতের দিন কাফেরগণও পরস্পর লা'নত করবে।

মুসলমানকে হত্যাকারীর উপর লা'নত ঃ

و من يقتل مومنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعد له عذابا عظيما (النساء ـ ٩٣)

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে জেনে বুঝে হত্যা করে, তবে তার পরিণাম হল জাহান্নাম। সে তাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে এবং আল্লাহ তার উপর রুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে অভিসম্পাত করেছেন আর তার জন্য তৈরী করে রেখেছেন মহান শাস্তি। (সূরা নেসা আয়াত নং ৯৩)

আহলে বাইত নয় বরং একজন সাধারণ মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা মহাপাপ এবং জঘন্যতম কবিরা গুনাহ। হাদীস শরীফে আছে, সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহর নিকট একজন মুসলমানকে হত্যা করা থেকে অধিক হালকা। এ হত্যা যদি ঈমানের শত্রুতার কারনে হয় কিংবা হত্যাকে হালাল জেনে করে তা কুফরী। চাই রাজনৈতিক কারনে হোক বা অন্য কোন কারনে হোক।

আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্টদানকারীর উপর লা'নত ঃ

ان الذين يوذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الاخرة و اعد لهم عذابا مهينا (الاحزاب ـ ٥٧)

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর অভিসম্পাত (লা'নত) রয়েছে এবং আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আহজাব, আয়াত নং-৫৭)

و الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار (الرعد ـ ٢٥)

অর্থাৎ, ঐসব লোক যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে তা পাকাপাকি হওয়ার পর (গ্রহণ করার পর) ভঙ্গ করে এবং যা জুড়ে রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং জমিনে (কুফর ও পাপাচার দ্বারা) ফ্যাসাদ ছড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত (লা'নত) এবং তাদের ভাগ্যে জুটবে মন্দ ঘর (জাহান্নাম)। (সুরা রাদ, আয়াত নং ২৫)

ইয়াজিদের ফ্যাসাদ সাধারণ জমিনে নয় বরং খোদায়ী জগতের সবচেয়ে উত্তম জমিন মক্কা-মদিনা শরীফসহ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনগণ (রা.) এর উপর। অতএব, উপরোক্ত আয়াতের আলোকে ইয়াজিদের উপর লা'নত অবধারিত।

ইয়াজিদের উপর লা'নত দেয়ার হুকুম ঃ

হযরত মুফতী আমিমুল এহসান (রহঃ) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'তারীখে ইসলাম' এর ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

کفر بر یزید از روایات معتبره ثابت می شود ـ پس او مستحق لعن است اگر چه در لعن کفتن فائده نیست لیکن الحب في الله و البغض في الله مقتضي آنست و الله اعلم (تاريخ اسلام مفتي عميم الاحسان ص ١٧٨)

ইয়াজিদের প্রতি লা'নত করা গ্রহণযোগ্য বর্ণনাসমূহের দ্বারা প্রমাণিত। সে লা'নতের পুরোপুরি হকদার। যদিও জাহান্নামী হওয়ার কারনে তার উপর লা'নত কোন উপকারে আসবে না। তবে "আল হুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগজু ফিল্লাহ" এর দাবী হচ্ছে তার প্রতি লা'নত করা। আল্লাহই ভাল জানেন।

হাদীছ শরীফে আছে-

قال ﷺ من احب في الله و ابغض في الله و اعطي لله و منع لله فقد استكمل الايمان (مشكواة المصابيح)

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে কোন কিছু দেয় বা দেয়া থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয়ই সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করল।

যে সব কারনে কাফের বলা যায় ঃ

قال في البحر عن الخلاصة ـ من اعتقد الحرام حلالا او علي القلب يكفر اذا كان حراما لعينه و ثبت حرمته بدليل قطعي ـ اما اذا كان حراما لغيره بدليل قطعي او حراما لعينه باخبار الاحاد لا يكفر اذا اعتقده حلالا و مثله في شرح العقائد النسفي (فتوي شامي ج ١ ص ٢٩٧)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হারামকে হালাল বিশ্বাস করে বা রাখে যদিও মনে মনে হোক সে কাফের হয়ে যায়, যদি ঐ হারামটি (আইনী) প্রকৃত হয়, নিশ্চিত দলিল দ্বারা প্রমানিত হয়। যদি হারাম নিশ্চিত প্রকৃত না হয়ে অন্য কারনে হয়, তাহলে দলীলে কৃতয়ী বা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হলেও কাফির হবে না। অথবা হারাম প্রকৃত কিন্তু খবরে আহাদ দ্বারা প্রমানিত, তবেও কাফের হবে না, যদিও সে হারামকে হালাল মনে করে। অনুরূপভাবে শরহে আকাঈদে নাসাফী'র মধ্যেও বর্ণিত আছে।

ইয়াজিদের কুফরীর ব্যাপারে হুকুম ঃ

ইয়াজিদই সর্বপ্রথম কোরআন-সুন্নাহর নীতিমালা ও আদর্শ পশ্চাতে ফেলে অবৈধ হারাম প্রথায় শাসনে নেমেছিল। এটা তার কুফরীর উপর উজ্জ্বল প্রমাণ। যেমন আল্লাহ বলেন-

من لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون ـ (الظالمون ـ الفاسقون)

যে ব্যক্তি কোরআন মজিদকে বিদায় দিয়ে দেয় সে কাফের (জালিম, ফাসিক)।

তাই ইয়াজিদ ইতিহাসবিখ্যাত জালিম, ফাসিক, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কাফের বলার ব্যাপারে নীরব থাকতে হচ্ছে। তবে হালালকে হারাম করা, হারামকে হালাল বলা যদি সত্য হয় এবং তার তাওবার কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়, তবে সে কাফের।

ইয়াজিদের কুফরী ঃ সাহাবীদের মান-মর্যাদা তুচ্ছ করা ঃ

عن زرعة يقول اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله ﷺ فاعلم انه زنديق و ذالک ان الرسول ﷺ عندنا حق و القران حق و انما ادي الينا هذا القران و السنن اصحاب رسول الله ﷺ و انما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب و السنة و الجرح بهم او لا و هم زنادقة (كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ٤٩)

হযরত আবু জুরআহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি তুমি কাউকে দেখ যে হুজুর (দ.) এর সাহাবাগণ হতে কারো মান-মর্যাদা কম করতে, তাহলে বুঝে নাও সে জিনদিক (কাফের)। তা এজন্য যে, আল্লাহর রছুল (দ.) আমাদের নিকট হক (সত্য) এবং কোরআনও হক। এই কোরআন এবং ছুন্নাহ আমাদের নিকট সাহাবায়ে কেরামগণই (রা.) পৌছিয়েছেন।

এই জিন্দিকরা (কাফের) চাচ্ছে যে, আমাদের প্রকৃত সাক্ষীগণকে (সাহাবাগণকে) ক্ষত করে দিবে, যাতে কুরআন-সুন্নাহ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। অথচ ক্ষত হওয়া তাদের উপরই বর্তায় বা তাদের শানেই সাজে, তারাই বেশি হকদার এবং তারা জিন্দিক (কাফের)।

ঈমান ও ইসলামের পরিচয় এবং কাউকে কাফির, মুমিন-মুসলিম বলার মূলনীতি ঃ

'আল ফিকহুল আকবর' গ্রন্থে রয়েছে ঃ ইমাম আযম (র.) বলেন-

و الاسلام هو التسليم و الانقياد لاوامر الله تعالي فمن طريق اللغة فرق بين الايمان و الاسلام

অর্থাৎ ইসলাম হল- আত্মসমর্পন ও আল্লাহ তা'আলার আদেশের আনুগত্য। তবে আভিধানিক দিক থেকে ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

و لكن لا يكون ايمان بلا اسلام ولا يوجد اسلام بلا ايمان و هما كالظهر مع البطن

বস্তুতঃ ঈমান কখনও ইসলাম ছাড়া হয় না এবং ইসলামও ঈমান ছাড়া পাওয়া যায় না। এ উভয়ের তুলনা যেন পিঠ ও পেট। ইমাম আযম (র.) বলেছেন-

و لا نكفر مسلما بذنب من الذنوب و ان كانت كبيرة اذا لم يستحلها

কোন পাপের কারনে আমরা কোন মুসলিমকে কাফের বলব না, যদিও সেই পাপ বড়পাপ (কবিরা গুনাহ) হয়, যতক্ষণ না সে তা হালাল মনে করে।

ইমাম আযম (র.) বলেন ঈমান, ইসলাম ও শরীয়তের যাবতীয় আহকামের সমন্বয় হলো দ্বীন। সুতরাং বুঝা যাবে- অন্তরের বিশ্বাস, প্রকাশ্য স্বীকৃতি ও আহকাম কবুল করার নামই হলো দ্বীন। যেমন বলেছেন-

الدين اسم واقع علي الايمان و الاسلام و الشرائع كلها

অর্থাৎ দ্বীন হলো ঈমান, ইসলাম ও যাবতীয় শরীয়তের সমন্বয়ের নাম।

من شتم امرء من اهل العلم بكلمة الجماع يكفر و تطلق امرائته طلاقا بائنا عند محمد و عند اهل الفقه و قال صدر الشهيد في فتاوي بديع الدين . من استخف بالعالم يكفر و تطلق امرائته بائنا

ইমাম মুহাম্মদ ও অন্যান্য ফকিহদের মতে, কেহ আহলে ইলমকে যেনার বাক্যে গালি দিলে কাফের হয়ে যায় এবং তার স্ত্রী তালাকে বায়েন হয়। ছদরুশ শহীদ ফতোয়ায়ে বদিউদ্দিন গ্রন্থে বলেছেন, আলেমকে হালকা অর্থাৎ তাঁর ইজ্জত সম্মান ছোট করে দেখলেও কাফের হয় এবং তার স্ত্রী তালাক হয়। (দুররাতুন নাছেহিন, পৃষ্ঠা-২৫)

ইয়াজিদের কুফরী সম্পর্কে আ'লা হযরত (র.) এর অভিমত ঃ

ইমাম আলা হযরত (র.) তাঁর মতামত 'ফতোয়া রেজভীয়া' ৬ষ্ঠ খন্ড ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ইয়াজিদের অপকর্ম, ফিসকি-ফুযুরী মুতাওয়াতের অর্থাৎ এত অধিক সংখ্যক লোকই বর্ণনা করেছেন যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু কুফরী ঐভাবে মুতাওয়াতের নয় বরং আহাদ। তাই তার কুফরীর ব্যাপারে চুপ থাকার মধ্যেই সতর্কতা বেশি।

ইয়াজিদের ব্যাপারে সমাপনী মন্তব্য ঃ

আমার কথা হচ্ছে- তার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা যদি সত্যিকারভাবে তার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে সে নিশ্চিত কাফের। তবে মৃত্যুর পূর্বে হুঁশ থাকা অবস্থায় যদি তওবা করে থাকে, তবে তাকে কাফের বলার ব্যাপারে আমারও নীরবতা রয়েছে। তার ব্যাপারে আমার মূলকথা হচ্ছে, সে মানবের মধ্যে সবচেয়ে ঈর্ষিত, ঘৃণিত ছিল। সে হোছাইন (রা.) কে শহীদ করেছে, আহলে বাইতকে অসম্মানিত-অপমানিত করেছে, মদীনা শরীফে ধ্বংসাত্মক কর্ম-কান্ড চালিয়েছে, মক্কাশরীফে পাথর নিক্ষেপ করেছে ও আগুন লাগিয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) কে কতল করার নির্দেশ দিয়েছে এ অবস্থায় সে জাহান্নামে চলে গেছে। তার তওবার ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। এ মতটি শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (র.) এর। (তাকমিলুল ঈমান ৭০-৭১ পৃষ্ঠা)

ইয়াজিদ প্রেমিকদের পক্ষ হতে সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ও তার উত্তর ঃ

প্রশ্নঃ ইয়াজিদ তো 'আহলে কেবলা', সুতরাং তাকে কাফের বলা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ ইয়াজিদ কেবলার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরন করেছে এবং আল্লাহর ঘরে পাথর নিক্ষেপ করা, আগুন দেয়া, তিন দিনের জন্য মসজিদে নববী শরীফে নামায বন্ধ করা ইত্যাদি কর্ম-কান্ডসমূহ তার আহলে কেবলা হওয়ার পরিচায়ক নয়। যেমন-

العقيدة الطحاوية للامام ابي جعفر الطحاوي الحنفي طبع و نشر الرياسة العامة لادارات البحوث العلمية و الافتاء و الدعوة و الارشاد الرياض المملكة العربية السعودية (١٤٠٤)

و لا نكفر احدامن اهل القبلة بذنب ما لم يستحله

و نسمي اهل قبلتنا مسلمين مومنين ما داموا بما جاء به النبي صلي الله عليه و سلم معترفين و له بكل ما قاله و اخبر مصدقين

ইমাম তাহাবী আল হানাফী (র.) তাঁর 'আল আকাঈদুত্ তাহাবী' নামক কিতাবে লিখেছেন- আমরা আহলে কেবলাকে গুনাহের কারনে কাফের বলিনা ঐ পর্যন্ত যে, তা হালাল জেনে করবে এবং আমরা আহলে কেবলাকে মুমিন-মুসলিম বলি যখন সে হুজুর (দ.) যা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করে এবং হুজুর (দ.) যা বলেছেন কিংবা খবর দিয়েছেন তা সত্যায়ন ও স্বীকার করে।

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইয়াজিদ আহলে কেবলার অন্তর্ভূক্ত নয়।

প্রশ্ন ঃ হাদীছ শরীফে আছে- নবী (দ.) কসতুনতুনিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য 'মাগফুর' (ক্ষমাপ্রাপ্ত) ঘোষণা করেছেন। ইয়াজিদ ঐ যুদ্ধের আমীর ছিল। সুতরাং সেও কি ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত নয় ?

উত্তরঃ তার উত্তরে হাদীছের ব্যাখ্যাকরকগণ বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন-

প্রথমতঃ 'মদীনায়ে কায়সার' বা 'কসতনতুনিয়া' যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণকে 'মাগফুর বা ক্ষমাপ্রাপ্ত বা বেহস্তী' বলেছেন, এর দ্বারা হুজুর (দ.) উক্ত হাদীস বর্ণনার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন মূলতঃ তাদেরকে উৎসাহিত করাই উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষতঃ সাহাবাদের মধ্যে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হুজুর (দ.) সাধারণভাবে বলেছেন- "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ" বলে বা বলবে, সে বেহস্তী। তার অর্থ এই নয় যে, মূরতেদ বা ধর্মদ্রোহী হলেও সে জান্নাতে যাবে। অনুরূপভাবে বলা যায়, ইয়াযিদের কুফরী কর্মকান্ড ও বক্তব্যসমূহ দ্বারা তার ধর্মদ্রোহীতার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই সে ঐ হাদিসের সুসংবাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

তৃতীয়তঃ উক্ত হাদিছের উত্তরে কেহ কেহ বলেছেন, এই হাদিছখানার সনদ সঠিক নহে। রাবীগণ 'হামস' এবং 'দামেস্ক' এর অধিবাসী। এই এলাকার লোক নবীবংশের এবং হযরত আলী (রা.) এর বিপক্ষের লোক। দ্বিতীয়তঃ এই হাদিসের কিছু রাবী 'কদরী' অর্থাৎ তকদীর অবিশ্বাসকারী। (হাফিজ ইবনে হাজার মৃত্যু ৮৫২ হি. তাহজীবু তাহজীব খণ্ড ১১ পৃ. ২০০ হাফিজ আব্দুর রহমান বিন আবী হাতেম রাজী মৃ. ৩২৭ হি. কিতাবুজ জরহে ওআত্ তা'দিল খন্ড-২ পৃ. ৪৬৯, হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী মৃঃ ৭৪৮ হি. মিজানুল এতেদাল খন্ড-১ পৃ. ১৫১)

চতুর্থতঃ অনেকেই উক্ত হাদিসের জবাবে বলেছেন, হাফিজ ইবনে কাছির বর্ণনা করেছেন, ৪২ হিজরীতে মুসলমানরা রোমে হামলা করেছেন। তাঁদের অনেক আমীর ইত্যাদি কতল হয়েছে। মূসলমানরা প্রচুর পরিমাণ গনীমতের মাল হাছিল করেছেন এবং নিরাপত্তার সাথে ফিরে এসেছেন। হুজুর (দঃ) এর সুসংবাদ ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারেও হতে পারে। যদি হাদীছের ইঙ্গিত রোমের যুদ্ধের প্রতি হয়, তাহলে ইয়াজিদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খন্ড ২৪ পৃ.)

আবার কেহ কেহ বলেছেন, উক্ত জবাবখানা ছহীহ-শুদ্ধ নয়। কেননা রাছুল (দ.) এর সুসংবাদ 'মদিনা কায়সার' এর উপর আক্রমনকারীদের ব্যাপারে। সাধারনভাবে রোম রাজ্যের উপর আক্রমনকারীদের ব্যাপারে নয়।

পঞ্চমতঃ এ হাদীছের ব্যাখায় কেহ কেহ বলেছেন- রাসুল (দ.) এর এই সুসংবাদ যে যুদ্ধ ৫২ হিজরীতে ঘটেছে, সেই যুদ্ধ সম্পর্কেই ছিল। সাধারনভাবে ইয়াযিদও তার মধ্যে গণ্য হওয়ার কথা, তবে পরবর্তীতে তার নিকট থেকে কুফরী কাজ-কর্ম প্রকাশ পেয়েছে। তাই সে হুজুর (দ.) এর সাধারন সুসংবাদ থেকে বাদ পড়ে গেছে। হুজুর (দ.) এর উক্ত সুসংবাদ 'ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া' বা 'বেহস্ত ওয়াজিব হওয়া' ঐ সকল ভাগ্যবান ব্যক্তিদের জন্য যারা ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। বদরুদ্দিন আইনী (র.) বলেন, মাগফুর (তাদের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া) এর এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য কিছু শর্ত নিশ্চয় আছে। তবে ঐ শর্তসমূহ পাওয়া না গেলেও কি ঐ সুসংবাদের অধিকারী হবে? নিশ্চয়ই না। (ওমদাতুল ক্বারী ১৪তম খন্ড, পৃঃ ১৯৮, ১৯৯) (উল্লেখ্য, অনুরূপ ব্যাখ্যা ও আলোচনা রয়েছে- ফতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা, আল বেদায়া ওয়াননেহায়া ৭ম খণ্ড পৃঃ ৫২, আল্লামা ইবনে আছীর আল জজরীর 'আল কামেল ফিত্ তারীখ' ২য় খণ্ড ৩৪১-৩৪২ পৃঃ, এরশাদুস্সারী শরহে বোখারী ৫ম খণ্ড ১০১ পৃষ্ঠা)।

ইয়াজিদ প্রেমিকগণের উক্তি ঃ

যুগে যুগে ঐ বদ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিটিকে খলিফাতুল মুসলিমীনের সম্মানিত আসনে বসানোর চেষ্টা আরম্ভ করে দেয় কু-চক্রী উমাইয়্যাগণ ও কিছু কিছু ইয়াজিদ প্রেমিক।

যেমন- হাবিবুর রহমান খায়রাবাদী মুফতী জামেয়া আরবীয়া হায়াতুল উলুম মুরাদাবাদ তাং ৫ই মার্চ ১৯৭৫ ইং। সে ইয়াজিদ সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলে, "ইয়াজিদ জান্নাতী। তাকে মন্দ বলা রাফেজীদের লক্ষণ। সে মু'মেন মগফুর, তার প্রতি সম্মান করা ওয়াজিব। তার প্রতি ইছালে ছাওয়াব বৈধ। তার শানে আমীরুল মু'মেনীন, খলিফাতুল মুসলেমীন বলা বৈধ হবে। তার নামের পর আলাইহিচ্ছালাম এবং রাদিআল্লাহু আনহু বলাও বৈধ। কারবালার ময়দানে ইয়াজিদ ও ইমাম হোছাইন (রা.) উভয়ই হকের উপর ছিলেন। কারবালার ঘটনা জিহাদ ছিল না একটা লড়াই ছিল।" উপরোক্ত বক্তব্যগুলো দ্বারা তাদের এজিদপ্রেম ফুটে উঠে। রাসুল (দ.) এর আওলাদগণের প্রতি ইয়াজিদ ও তার দোসরদের নির্মম আচরণ ও চরম বেয়াদবীর পরও তার প্রতি যাদের এত দরদমাখা বক্তব্য, তারা সত্যিকারের ঈমানদার নাকি মুনাফিক তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

উপরোক্ত আলোচনার শেষান্তে বলা যায় যে, ইমাম হোছাইন (রা.) ও ইয়াজিদের মধ্যকার দ্বন্দ ও যুদ্ধ ছিল- হক ও বাতিলের যুদ্ধ। ইমাম হোছাইন (রা.) তাঁর সপরিবারে শাহাদাতের মাধ্যমে ইসলামকে জীবিত রেখেছে। তাইতো বলা হয়েছে- "ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কি বাদ"। মুসলমানরা কিয়ামত পর্যন্ত ইমাম হোছাইন (রা.) কে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে, পক্ষান্তরে ইয়াজিদ হবে মলউন-মরদুদ (চির অভিশপ্ত ও পরিত্যাজ্য)।

পরিশিষ্ট ঃ

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) হুজুর (দঃ) এর সাহাবী ও বংশের আত্মীয়ও বটে। ইমাম আযম (র.) বলেন, ওনাদেরকে আমরা প্রশংসার সাথে স্মরণ করি। মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেন, বাহ্যতঃ দেখতে কিছু কিছু বিষয় মন্দ মনে হলেও মূলতঃ ওগুলো সব ইজতেহাদের কারণে ছিল, বিবাদের কারণে নয়। হযরত গাউছে পাক (রা.) গুনিয়াতুত ত্বালেবীন ১৭১ পৃঃ তাঁর অনেক গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। হযরত দাতা গনজ বখশ লাহোরী (র.) কশফুল মাহজুবের ৫৮ পৃষ্ঠায় এবং হযরত জালালুদ্দীন রুমী মসনবী শরীফের ১৪ পৃষ্ঠায় অনেক প্রশংসাসহ তাঁকে 'খালুল মুছলেমীন' অর্থাৎ "মুসলমানদের মামা" আখ্যায়িত করেছেন। মোটকথা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইজাম তাঁর প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মূলতঃ সাহাবায়ে কিরাম সকল প্রকার সমালোচনার উর্ধ্বে। খারেজী, রাফেজী, শিয়া ও জ্ঞানহীন নামধারী সুন্নীদাবীদারগণ তাঁকে মন্দ বলে এবং তাঁর সমালোচনা করে।

হযরত মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মধ্যে মতানৈক্য ও ইসলামের দৃষ্টিকোণে এর সমাধান

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান*

ভূমিকাঃ ইসলামের ইতিহাসে হযরত মওলা আলী শেরে খোদা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একাধারে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামাতা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী। অপরদিকে বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, সুদক্ষ শাসক, সুনিপূণ রণকৌশলী হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সুন্নী মুসলমানদের নিকট বিশিষ্ট সাহাবী হিসেবে স্বীকৃত। ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার বলে তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ওফাতের পর তিনি মুসলিম জগতের প্রথম সুলতান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখনকার জীবিত সাহাবা ও তাবেঈনদের মধ্যে কেউ তাঁর শাসনের বিরোধীতা করেন নি। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য, চৌদ্দশ বছর পর শিয়া, রাফেজী, মিঃ আবুল আলা মওদুদী ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদের পূজারী একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মধ্যে যে ইজতেহাদী মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তার যথাযথ ও সঠিক বিশ্লেষণ না করে সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনায় উঠে পড়ে লেগে যায়। ক্ষেত্র বিশেষে তারা এমন সব আষাঢ়ে গল্পের অবতরণা করে যা বিবেকবানদের বিবেককে নাড়া দেয়। ইতিহাসের বর্ণিল পাতায় হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে মতানৈক্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যার সঠিক সমাধান অনুসন্ধানে অধমের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

প্রথমে সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের শান-মান ও মর্যাদার বর্ণনার মাধ্যমে লেখার যাত্রা শুরু করছি।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ঃ

মহান আল্লাহপাক প্রিয়নবী রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশাপাশি তাঁর প্রিয় সহচর সাহাবায়ে কেরামদের যে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা সমুজ্জল হয়ে রয়েছে। অসংখ্য অগণিত আয়াত ও হাদীস শরীফ দ্বারা তাঁদের মর্যাদা সহজেই অনুমেয়। নিম্নে তন্মধ্য হতে কতিপয় আয়াত উপস্থাপনের প্রয়াস পাব। মহান আল্লাহ-তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا وكلا وعد الله الحسني الاية

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐসব লোক যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় ও জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় ঐসব লোক অপেক্ষা বড়, যারা মক্কা বিজয়ের পর (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় ও জিহাদ করেছেন এবং তাদের সবার সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। (সূরা হাদীদ আয়াত-১০)

و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء و لكن لا يعلمون

অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয়, ঈমান আনো যেমন অপরাপর লোকেরা ঈমান এনেছে, তখন তারা বলে আমরা নির্বোধদের মতো ঈমান নিয়ে আসবো? জেনে রাখ তারাই হলো নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত নং-১৩)

এ আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, যার ঈমান সাহাবার ঈমানের মত নয়, সে মুনাফিক এবং বড় বোকা। এ আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন সাহাবী ফাসিক, কাফির হতে পারে না এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের বেলায় আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। এটাও প্রমাণিত হল যে, নেক্কার বান্দাদেরকে মন্দ বলা মুনাফিকদের কু-প্রথা। যেমন- রাফেজী (শিয়া) সম্প্রদায় সাহাবায়ে কেরামকে, খারেজীগণ 'আহলে বাইতকে', গায়রে মুকাল্লিদগণ ইমাম আবু হানীফাকে এবং ওহাবীগণ আল্লাহর প্রিয় ওলীদেরকে মন্দ বলে।(১)

পবিত্র হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ঃ

সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্য থেকে সংক্ষেপে নিম্নে কয়েকটি বর্ণিত হল-

عن ابي سعيد الخدري رض قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم و لاتسبوا اصحابي فلو ان احد كم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم و لا نصيفه (بخاري ص٥١٨ ج١ , ترمذي ٢٢٥ ج٢)

* প্রধান ফকীহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'আমার কোন সাহাবীকে মন্দ বল না। তোমাদের পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ খয়রাত করা ওদের সোয়া সের যব সদকা করার বরাবর হতে পারে না, এর অর্ধেকেরও বরাবর হতে পারে না।[২]

عن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم الله الله في اصحابي لاتتخذوهم عرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم و من ابغضهم فببغضي ابغضهم (الحديث)

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার সাহাবার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, ওদেরকে ভর্ৎসনা ও বিদ্রুপের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত কর না। যে আমার সাহাবাকে মহব্বত করল, সে আমার মহব্বতে তাঁদেরকে মহব্বত করল এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো।[৩]

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله علي شركم

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমরা এ ধরণের লোক দেখবে যারা আমার সাহাবাকে মন্দ বলে, তখন ওদেরকে বলে দিও, 'তোমাদের অন্যায়ের উপর আল্লাহর অভিশাপ'।[৪]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পরিচয় ঃ নাম- আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, উপনাম- আবুল হাসান, উপাধি আসাদুল্লাহ। পিতা আবু তালেব। বাল্যকাল থেকে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তত্ত্বাবধানে বড় হন। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাতো ভাই এবং হুজুরের কন্যা মা ফাতিমার স্বামী ছিলেন। তিনিই কিশোরদের মধ্যে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাবুক অভিযান ব্যতিত সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন। ৩৫ হিজরী সনের ২৪ শে জিলহজ্ব তিনি ইসলামের ৪র্থ খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর এবং বেলায়তের সম্রাট হিসাবে খ্যাত। আহলে বায়তের অন্যতম সদস্য হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাপারে পবিত্র কোরানে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا الاية

অর্থাৎ হে আহলে বাইত, আল্লাহই চান যে, তোমাদেরকে অপবিত্রতা থেকে দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে একান্ত পূতঃ পবিত্র রাখতে।[৫]

এ ব্যাপারে স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

ان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لايحب عليا منافق و لايبغضه مومن

অর্থাৎ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মুনাফিক আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ভালবাসবে না এবং কোন মুমীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ঘৃণা করতে পারে না।[৬] সাদীরে খুম-এ রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাওলা আলীর হাত ধরে এরশাদ করেন- من كنت مولاه فعلي مولاه অর্থাৎ আমি যার মাওলা, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তার মাওলা। (তিরমিযী শরীফ পৃঃ নং ২১৩, ২১৪)।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মর্যাদা ঃ

তাঁর নাম- মুয়াবিয়া, (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উপনাম- আবু আবদুর রহমান। তাঁর পিতা- হযরত আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু । মাতার নাম- হিন্দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা । তিনি পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকে পঞ্চম পুরুষে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মিলে যান। ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য সূত্রানুসারে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু সুফিয়ানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দের সাথে ৮ম হিজরী মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্ম কবুল করেছেন।[৭] অপর বর্ণনা মতে, হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৬ষ্ঠ হিজরী হোদায়বিয়া সন্ধির সময় ইসলাম কবুল করেছেন, তবে প্রকাশ করেছেন ৮ম হিজরী মক্কা বিজয়ের সময়) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে হযরত আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হিন্দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কখনও স্বয়ং রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী বা মুমীনের মর্যাদা থেকে খারিজ করেননি এবং কোন সাহাবীই তাঁদের শানে কটুক্তি করেননি। বরং হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহী লেখকগণের মধ্যে গণ্য করে এক বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। (মোদারেজুন্নবুয়ত কৃতঃ শেখ আঃ হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহঃ)

ইমাম আহমদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'মসনদে আহমদে' বর্ণনা করেছেন যে, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর জন্য এভাবে করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ করেছেন-

اللهم علم معاوية الكتاب و الحساب رواه احمد في مسنده

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! মুয়াবিয়াকে পবিত্র কোরআন ও অংক শাস্ত্রের জ্ঞান দান কর। (মসনদে আহমদ ও আন-নাহিয়া আন তায়া'নে মুয়াবিয়া, কৃতঃ আল্লামা আব্দুল আজিজ রহঃ পৃঃ ১৪)

তিরমিযি শরীফে বর্ণিত হাদিসে রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এভাবে দোয়া করেছেন- اللهم اجعله هاديا مهديا و اهد به الناس

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি মুয়াবিয়াকে হাদী এবং মাহদী বানিয়ে দাও এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষকে হেদায়াত দান কর। এতদসত্ত্বেও তাঁর শানে 'সাহাবা বা মুমীনের মর্যাদা দেয়া যায় না' মর্মে শিয়া-রাফেজীদের কটুক্তি করা সাহাবায়ে রসুলের প্রতি জঘন্যতম বেয়াদবী ও কুফরীর শামিল।

উভয়ের মাঝে মতানৈক্যের কারণঃ

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মধ্যে মতানৈক্যের ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ী বিদ্রোহীরা ঘেরাও করেছিল। তিনদিন বা এর থেকে অধিক সময় পানি অবরোধ করে রেখেছিল, অতঃপর ঘরে প্রবেশ করে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং অপর তের জন বিদ্রোহী তাঁকে নির্দয়ভাবে শহীদ করে। তাঁর শাহাদাতের পর আমিরুল মুমেনীন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির ও আনসারগণের সর্বসম্মত রায়ে বরহক খলীফা মনোনীত হন। কিন্তু কয়েকটি কারণে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন নি। এ খবর সিরিয়ায় আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কানে পৌছে। তিনি সংবাদ পাঠালেন যে, মুসলমানদের খলীফাকে স্বয়ং মদীনা শরীফে শহীদ করে দেয়াটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার। সুতরাং সবার আগে হত্যাকারীদের উপর কিসাসের হুকুম কার্যকরী করা হোক। কিন্তু কয়েকটি প্রতিরোধ্য অবস্থার কারণে হত্যার বদলা (কিসাস) নিতে পারেন নি। ওদিকে কুচক্রিমহল আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মনে এ ধারণাটি বদ্ধমূল করে দেয় যে, আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইচ্ছাকৃতভাবে কিসাস কার্যকরী করতে গড়িমসি করছেন এবং সেই হত্যাকাণ্ডে (নাউযু বিল্লাহ) তাঁর হাত রয়েছে। আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর তরফ থেকে বারবার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দাবী জানানো হয়। তখনও খেলাফতের অস্বীকার বা স্বীয় রাজত্ব পৃথক করার কোন খেয়াল ছিল না, কেবল উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রক্তের প্রতিশোধের দাবী ছিল।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মনে করতে লাগলেন যে, আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের উপযুক্ত নন এবং তিনি খেলাফতের দায়দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করতে পারছেন না। কেননা তিনি এতবড় একটি হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে পারলেন না, তিনি অন্যান্য দায়িত্ব কিভাবে আদায় করতে পারবেন। মতবিরোধের মূল কারণ ছিল এটাই। অন্যান্য সমস্ত মতভেদ ছিল এ মূলেরই শাখা-প্রশাখা। অন্যান্যদের বিরোধীতার কারণও ছিল এটাই।[৮]

এ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সাহাবায়ে কেরাম তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন, ওনারা কারো পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ। একদল হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে যান, যেমন- হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুহাম্মদ ইবনে তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ। আর একদল হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ অবলম্বন করেন।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু তাঁর আপন ভাই আব্দুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সেনা বাহিনীর সদস্য ছিলেন। আবার স্বয়ং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ভাই হযরত আকীল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেই যুদ্ধের (জঙ্গে জমল) সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতি নিয়ে আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে মেহমান হয়ে থাকেন। অর্থাৎ তা ছিল হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদগত ভুল, যা ইসলামের দৃষ্টিকোণে গুনাহ তো নয় বরং ইজতিহাদগত ভুলেও একটি পুরস্কারের শুভ সংবাদ বর্ণিত আছে। (শরহে মাওয়াকেফ, শরহে আকাঈদে নসফি ও নিবরাস, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পৃঃ ৬৬)

আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি ঃ

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তন্মধ্য হতে কতিপয় উল্লেখযোগ্য অভিযোগ এবং তার দাঁতভাঙ্গা জবাব নিম্নে উপস্থাপনের প্রয়াস পাব-

১ম আপত্তি ঃ

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ আবুল আলা মওদুদী শিয়া ও রাফেজীর ন্যায় সাহাবায়ে কেরামগণের সবচেয়ে বড় সমালোচক। সে তার বহুল বিতর্কিত " خلافت و ملوكيت " (খেলাফত ওয়া মলুকিয়াত) গ্রন্থে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বেদাতী আখ্যা দিয়ে উল্লেখ করেছে যে, "হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং নিজে এবং তাঁর প্রাদেশিক গভর্ণরগণ তাঁর আদেশক্রমে জুমার খোতবায় মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিত (নাউজুবিল্লাহ) । এ ছাড়াও মসজিদে নববীতে মিম্বরে রসূলের উপর দাঁড়িয়ে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়জনদের গালি দিত" ।[৯]

উত্তর ঃ এ ধরণের উক্তি শিয়া-রাফেজী ও আবুল আলা মাওদুদীর পক্ষ থেকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি জঘন্য অপবাদের শামিল।

মিঃ মওদুদী তার দাবীর সমর্থনে যে তিনটি কিতাবের রেফারেন্স উল্লেখ করেছে (তাফসীরে তাবারী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা/ ইবনে আসীর ৩য় খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা/ আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৯ম খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা) দেওবন্দী মাযহাবের অন্যতম পুরোধা ডঃ তকী ওসমানী সাহেব বলেছেন, আমি তার উল্লেখিত রেফারেন্সগুলো পর্যালোচনা করেছি গভীরভাবে। কিন্তু কোথাও এ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি যে, তিনি (হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে গালি-গালাজ করতেন।[১০]

উপরন্তু ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মতভেদ থাকার পরও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যেমন- হাফেজ ইবনে কাছীর রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

لما جاء خبر قتل علي الي معاوية جعل يبكي فقالت له امراته اتبكيه و قد قاتلته فقال

ويحك انك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل و الفقه و العلم

অর্থাৎ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যখন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদাতের সংবাদ পৌছল তখন তিনি কান্না করতে লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি কি আলীর শাহাদাতে ক্রন্দন করছেন? অথচ আপনি সারা জীবন তাঁর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। প্রতি উত্তরে হযরত মুয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি নিশ্চয় জাননা যে, আজ মানব সমাজ অসংখ্য কল্যাণ, ইলমে ফিকাহ্ এবং জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।[১১]

উল্লেখ্য, এখানে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছে যে, "আপনি তাঁর সাথে জীবনে অগণিত যুদ্ধ করেছেন"। কিন্তু তিনি একথা বলেননি যে, "আপনি তাঁকে অনেকবার গালিগালাজ করেছেন, সুতরাং আজকে তাঁর শাহাদাতের সংবাদে কেন ক্রন্দন করছেন?"

২য় আপত্তি ঃ একবার হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় কাঁধে ইয়াজীদকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে এরশাদ করলেন, জাহান্নামীর উপর চড়ে জাহান্নামী যাচ্ছে। এতে বোঝা গেল যে, ইয়াযীদও দোযখী এবং আমীরে মুয়াবিয়াও (নাউযুবিল্লাহ)

উত্তর ঃ এ আপত্তিটি একেবারেই ভিত্তিহীন। জামে ইবনে আছীর, কিতাবুন নাহিয়া ইত্যাদি ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র যুগে আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাঁধে ইয়াযীদের অবস্থান কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।[১২]

৩য় আপত্তি ঃ হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে, যখন তোমরা মুয়াবিয়াকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আমার মিম্বরের উপর দেখ, তখন তাঁকে 'হত্যা করে ফেল' এই হাদীসটি ইমাম যাহাবী উদ্ধৃত করেছেন এবং বিশুদ্ধ বলেছেন। এতে বুঝা গেল যে, আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হত্যার উপযোগী ছিল।

উত্তর ঃ মিথ্যাবাদীদের উপর খোদার অভিশাপ' এটা বলা ছাড়া এ আপত্তির আর কি জবাব দেয়া যায়? কোন এক মিথ্যাবাদী হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামে মিথ্যা বলেছে এবং অপবাদটা ইমাম যাহাবীর উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। সরকারে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, "যে আমার ব্যাপারে জেনেশুনে মিথ্যা বলে সে যেন দোযখকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" আল্লাহকে ভয় করা দরকার ইমাম যাহাবী রদ করার জন্য এ জাল হাদীসটি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন এবং ওখানে সাথে সাথে বলে দিয়েছেন যে, এটি মওযু হাদীস, এর কোন ভিত্তি নেই। চিন্তার বিষয়, হুজুরের এটা বলার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি তো নিজেই কতল করাতে পারতেন। আর সমস্ত সাহাবী, তাবেঈন ও আহলে বায়ত এ হাদীস শুনলেন কিন্তু কেউ পাত্তা দিলেন না বরং ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরে খেলাফত থেকে ইস্তফা দিয়ে আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য রসূলের মিম্বরকে একেবারে খালি করে দিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মুয়াবিয়ার ইলম ও আমলের প্রশংসা করলেন, ওনাকে দ্বীনের মুজতাহিদ আখ্যায়িত করলেন। ওনাদের কারো কাছে এ হাদীসটি পৌছল না। চৌদ্দশত বছর পরে ওদের কাছে এ হাদীসটি পৌছে গেল এছাড়াও আরো অসংখ্য বিভ্রান্তিকর আপত্তি করা হয়েছে কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশংকায় তা এখানে আলোকপাত করা হলো না।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ঃ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একদিন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দরবারে উপস্থিত সবাইকে বললেন, যে ব্যক্তি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর প্রশংসায় যথাযোগ্য কবিতা আবৃত্তি করবে, আমি তাকে প্রতিটি কবিতার বিনিময়ে হাজার দিনার দান করব। উপস্থিত কবিগণ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে কবিতা আবৃত্তি করে প্রচুর পুরস্কার লাভ করল। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রতিটি কবিতা ও ছন্দ শ্রবণ করার পর বলতেন- علي افضل منه

অর্থাৎ তোমরা কবিতায় হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যা কিছু প্রশংসা করেছ, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার চাইতে আরো অনেক উত্তম। অতঃপর উক্ত মজলিসে আমর বিন আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসায় এমন একটি কবিতা পাঠ করলেন যা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পছন্দ হল, ফলে উক্ত কবিতার বিনিময়ে উক্ত কবিকে আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাত হাজার দিনার পুরস্কার প্রদান করলেন।[১৪]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিফফীন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ইরশাদ করেন- ايها الناس لا تكره امارة معاوية فانكم لو فقدتموه رايتم الروس تندر عن كواهلها كانما الحنظل

অর্থাৎ হে লোকসকল! তোমরা আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসন এবং নেতৃত্বকে অপছন্দ করো না। যদি তোমরা তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দাও, তবে তোমরা দেখবে ধড় থেকে মাথা এমনভাবে কেটে পড়ছে, যেভাবে হানজল ফল (এক প্রকার লেবু জাতীয় ফল) গাছ থেকে পতিত হয়।[১৫]

বিশিষ্ট ইসলামী মনীষীদের অভিমত ঃ

হযরত আলী এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে মতপার্থক্যের ব্যাপারে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণ প্রণিধানযোগ্য ও গবেষণামূলক মতামত প্রদান করেছেন। নিম্নে তন্মধ্য হতে কয়েকটি মতামত সংযোজন করা হল-

ফারুকে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত ঃ হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোক সকল! আমার পরে তোমরা গোত্রবিভেদ থেকে বেঁচে থাক! যদি তোমরা এমন করে থাক, তবে মনে রেখ- হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় আছেন।[১৬]

গাউছে পাকের অভিমত ঃ হুযুর গাউছে পাক আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'গুনিয়াতুত তালেবীনে'র ১৭৫ পৃষ্ঠায় আমীরে মুয়াবিয়া ও আলী মুরতাজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যে যুদ্ধ-বিদ্রোহ সম্পর্কে ইরশাদ করেন- و اما قتاله لطلحة و الزبير و عائشة و معاوية فقد نص الامام احمد علي الامساك عن ذلك و جميع ما شجر بينهم من منازعة و منافرة و خصومة لان الله تعالي يزيل ذلك من بينهم يوم القيامة كما قال عز و جل و نزعنا الخ

অর্থাৎ হযরত আলীর সাথে হযরত তালহা, যুবায়ের, আয়েশা সিদ্দীকা ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর যুদ্ধ সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধের ব্যাপারে বাদানুবাদ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা আল্লাহ তায়ালা ওনাদের সমস্ত কালিমা কিয়ামতের দিন দূরীভূত করে দিবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং ইরশাদ ফরমায়েছেন, আমি জান্নাতীদের অন্তর থেকে ঈর্ষা-বিদ্বেষ বের করে দিব। আর এ জন্য যে, হযরত আলী মুরতাজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওসব সাহাবায়ে কেরামের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে হকের উপর ছিলেন এবং যারা তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে, ওদের সাথে এ যুদ্ধ ওনার দিক থেকে বৈধ হয়েছে। আর যে সব সম্মানিত ব্যক্তিগণ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যেমন

আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওনারা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রক্তের বদলা দাবী করেছিলেন। যিনি বরহক খলীফা ছিলেন এবং যাঁকে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছে এবং উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীরা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। সুতরাং ওনাদের দাবীও সঠিক ছিল। গাউছে পাক রহমতুল্লাহি আলাইহি এর উপরোক্ত বক্তব্য শুনে সত্যিকার কোন মুসলমান ও কোন পীর বুজুর্গের অনুসারী আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কটুক্তি করে স্বীয় ঈমান বিনষ্ট করবে না, ইনশাআল্লাহ।

ইমামে আযম রহমতুল্লাহি আলাইহির মতামতঃ

ইমামে আজম হযরত ইমাম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব "ফিকহে আকবরে" সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নতের আকীদা প্রসঙ্গে বলেন- نتولاهم جميعا و نذكر الصحابة الا بخير অর্থাৎ আমরা আহলে সুন্নাত সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণ করি এবং ওনাদেরকে প্রশংসার সাথে স্মরণ করি। এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী 'শরহে ফিকহে আকবরে' এ রকম বলেন-

و ان صدر من بعضهم بعض ما صدر في صورة شر فانه كان عن اجتهاد و لم يكن علي وجه فساد

অর্থাৎ যদিও বা কতেক সাহাবা থেকে ও সব বিষয়সমূহ প্রকাশ পেয়েছে যেগুলো বাহ্যতঃ দেখতে মন্দ মনে হয়। কিন্তু ওগুলো সব ইজতিহাদের কারণে ছিল, ঝগড়া বিবাদের কারণে নয়।

অতএব তার অবস্থান আমাদের নিকট সহজেই অনুমেয় যে নিজেকে হানাফী বলে অথচ আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বেলায় কটুক্তি করে। সে স্বয়ং স্বীয় ইমামের বিরোধীতা করল।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমতুল্লাহি আলাইহির বাণীসমূহ ঃ

কুতুবে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি আকাবেরে আউলিয়ার অন্তর্ভূক্ত। তাঁর রচিত মকতুবাত শরীফের প্রথম খন্ডের ৫৪ ও ৮৫ পৃষ্ঠায় শেখ ফরিদকে লিখিত চিঠিতে বলেন- সমস্ত বিদাতী ফেরকার মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট ফেরকা সেটা, যেটা হুজুরে আকরমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবার প্রতি বিদ্বেষ- পোষণ করে। আল্লাহ তায়ালা সেই ফোরকাকে কাফির বলেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনুল করীমে এরশাদ ফরমান- ليغيظ بهم الكفار (যাতে কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি হয়)। কুরআন এবং শরীয়তের প্রচার সাহাবায়ে কেরাম করেছেন। যদি স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম ভৎর্সনার পাত্র হয় তাহলে কুরআন ও শরীয়তের ভৎর্সনা করা হবে।

হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব সেই মকতুবাতে আরও এরশাদ ফরমান, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে ঝগড়াও যুদ্ধসমূহ হয়েছে, সেটা মনোপ্রবৃত্তির কারণে ছিল না। কেননা সাহাবায়ে কেরামের আত্মাসমূহ হুযূরের সংশ্রবের বরকতে পবিত্র হয়ে গিয়েছিল। আমি এতটুকু জানি যে, ওসব যুদ্ধে হযরত আলী হকের উপর ছিলেন এবং উনার বিরোধীতাকারীগণ ভুল ধারণায় ছিল। কিন্তু এটা এজতেহাদী ভুল যা পাপের পর্যায়ে পড়ে না। তাছাড়া এখানে দোষারোপ করারও কোন অবকাশ নেই। কেননা মুজতাহিদ ভুলের জন্যও একটি সওয়াব লাভ করেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী সেই মকতুবাত শরীফের ২য় খন্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় খাজা মুহাম্মদ নকী সাহেবকে লিখিত মকতুবে (চিঠিতে) মাযহাবে আহলে সুন্নতের হাকীকত সম্পর্কে লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরাম কতেক ইজতেহাদী বিষয়ে স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অভিমতের বিপরীত অভিমত দিতেন। ওনাদের এ অভিমত, না দোষণীয় ছিল না নিন্দনীয়। ওনাদের বিরুদ্ধে কোন ওহীও নাযিল হয়নি। তাহলে ইজতেহাদী বিষয়ে হযরত আলীর বিরোধীতা কি করে কুফরী হতে পারে এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধীতাকারীগণের প্রতি ভৎর্সনা ও নিন্দা কেন? হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণের মধ্যে অনেকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। ওনাদের কাফির বলা বা নিন্দা করা সহজ ব্যাপার নয়।[২৭]

উপসংহারঃ

সুতরাং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এর মাঝে যে ইজতেহাদী মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তার জন্য হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে আক্রমণ করা জঘন্যতম অপরাধ ও গোমরাহীর শামিল। কেননা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একাধারে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় সাহাবী এবং কাতেবে ওহীর অন্তর্ভূক্ত। শিয়া, রাফেজী ও আবুল আলা মওদুদী ব্যতীত এ যাবৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোন ইমাম হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র শানে কটুক্তি করার দুঃসাহস দেখায়নি। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সকল মুসলমানের ঈমান আক্বীদাকে হেফাজত করুন।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. তাফসীরে নুরুল ইরফানঃ কৃতঃ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৬।
২. বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৫১৮, তিরমিযী ২য় খন্ড ২২৫ পৃ.।
৩. তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড ২২৫ পৃ.।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. আহযাব আয়াত- ৩৩।
৬. মসনদে আহমদ।
৭. তারিখে ইসলাম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা - ১৪৬, কৃতঃ মুফতি আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)
৮. হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, কৃতঃ মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী, পৃষ্ঠা- ৬৫।
৯. খেলাফত ওয়া মলুকিয়াত, কৃতঃ আবুল আ'লা মওদুদী।
১০. হযরত আমীরে মুয়াবিয়া ওয়াতারিখি হাক্বায়েক, কৃতঃ ডঃ তক্বী ওসমানী, পৃষ্ঠা - ৮১।
১১. আল বেদায়া, খন্ড - ৮, পৃষ্ঠা ১৩০।
১২. হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, কৃতঃ মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী, পৃষ্ঠা- ৮১।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৪।
১৪. আননাহিয়া, কৃতঃ হযরত আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৫. আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩১।
১৬. হযরত আমীরে মুয়াবিয়া, পৃষ্ঠা- ২৬৪।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৬।

পরিশিষ্ট

প্রবন্ধের পরিশিষ্ট হিসেবে লেখকের এ বিষয়ে আরেকটি গবেষণামূলক লেখা পাঠকদের অবগতির জন্য প্রশ্নোত্তর আকারে নিম্নে প্রদত্ত হল।

প্রশ্ন ঃ আবু সুফিয়ান, হিন্দা, মুয়াবিয়া, মারওয়ান চক্রকে সাহাবী বা মুমিনের মর্যাদা দেয়া যায় না। তারা দীর্ঘ তেইশ বৎসর ইসলামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? ঐতিহাসিক ও কোরান-হাদীসের আলোকে মূল্যবান জবাব দানে ধন্য করবেন।"

উত্তর ঃ এ উক্তিটি অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তাগণের ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের মতাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বরং হযরত আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মত দু'জন বুজুর্গ সর্বসম্মতঃ সাহাবার শানে হামলা ও কটুক্তি স্বরূপ। অথচ ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু সুফিয়ানসহ- পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দের সাথে ৮ম হিজরী মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্ম কবুল করেছেন। (তারিখে ইসলাম উর্দূ ১ম খণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা কৃতঃ মুফতি আমিমুল ইহছান রহমতুল্লাহি আলাইহি।

অপর বর্ণনা মতে, হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৬ষ্ঠ হিজরী হোদায়বিয়া সন্ধির সময় ইসলাম কবুল করেছেন, তবে প্রকাশ করেছেন ৮ম হিজরী মক্কা বিজয়ের সময় (তারিখুল খোলাফা)। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে হযরত আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হিন্দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কখনো স্বয়ং রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সাহাবী ও মুমিনের মর্যাদা থেকে খারিজ (বহিস্কার) করেননি এবং ছিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ফারুকে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু সুফিয়ানও হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার বেলায় এ ধরণের কটুক্তি করেননি। বরং হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অহী (ঐশীবাণী) লেখকগণের মধ্যে গণ্য করে এক বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি 'মসনদে আহমদে' বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এভাবে করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ করেছেন- اللهم علم معاوية الكتاب و الحساب -- رواه احمد في مسنده অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! মুয়াবিয়াকে কোরান এবং অংক শাস্ত্রের জ্ঞান দান কর। (আন নাহিয়া আন তা'য়ানে মুয়াবিয়া পৃষ্ঠা ১৪ কৃতঃ আল্লামা আব্দুল আজিজ ফরহারভী-রহ) তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করিম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এভাবে দোয়া করেছেন-

اللهم اجعله هاديا و مهديا به الناس الحديث অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি মুয়াবিয়াকে হাদী এবং মাহদী বানিয়ে দাও এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষকে হেদায়াত দান কর। (মেশকাত শরীফ ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

তদুপরি আবু বকর ছিদ্দিকের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের সময় থেকে হযরত ওসমান গণীর খেলাফত কাল পর্যন্ত বিশ বছর হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হাকেম বা গভর্ণরের গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আনজাম দিয়েছেন। (তারিখুল খোলাফা ১৩৮ পৃষ্ঠা, কৃতঃ ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী র.)

এতদসত্ত্বেও তাঁর শানে "সাহাবী বা মুমিনের মর্যাদা দেয়া যায় না" মর্মে কটুক্তি করা ছাহাবায়ে রাসূলের প্রতি জঘন্যতম বেয়াদবী নয় কি? তবে মারোয়ানকে সাহবীর মর্যাদা দেওয়া যাবেনা। (তারিখে ইসলাম ১ম খণ্ড কৃতঃ মুফতি আমিমুল ইহসান রহঃ)

ইমাম আব্দুল আজিজ বিন আহমদ ফারহারভী রহমতুল্লাহে আলাইহি মারওয়ান সম্পর্কে বলেন, ইতিহাসবেত্তাগণ মারওয়ানের সুকর্ম ও কুকর্ম উভয় দিক ব্যক্ত করেছেন কিন্তু সুকর্ম থেকে কুকর্মের সংখ্যা বেশী বলে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন। তারপরও এ যাবৎ কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং কোন ইমাম মারওয়ানের বেলায় "মুমিনের মর্যাদা দেয়া যাবে না" মর্মে উক্তি করার দুঃসাহস করেননি। যদিও মারওয়ানকে প্রিয় নবীর ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম গণ্য করেননি। (আন নাহিয়া আন তায়ানে মুয়াবিয়া পৃঃ ৪৫-৪৬)

সুতরাং "আবু সুফিয়ান, হিন্দা, মুয়াবিয়া ও মারওয়ান চক্রকে সাহাবী বা মুমিনের মর্যাদা দেয়া যায়না।" এ জাতীয় উক্তি করা বা পেপার পত্রিকায় প্রকাশ করা দ্বীন ধর্মকে হেয় করার সমতুল্য এবং সুস্পষ্ট সীমা লঙ্ঘন।

প্রশ্ন ঃ ৪১ হিজীতে মুয়াবিয়ার আদেশে মাওলা আলীকে জুমার খোতবায় গালিগালাজ দেওয়ার প্রথা চালু হয়" এ তথ্যটি ঠিক কিনা? মন্তব্য করুন।

উত্তর ঃ এ ধরণের উক্তি শিয়া-রাফেজী ও ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষ হতে বিকৃত করে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অপবাদের শামিল। বরং ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় দেখা যায় যে, একদা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থিত সবাইকে বললেন, যে ব্যক্তি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসায় যথাযোগ্য কবিতা আবৃত্তি করবে, আমি তাকে প্রতিটি কবিতার বিনিময়ে হাজার দিনার প্রদান করব। উপস্থিত কবিগণ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে কবিতা আবৃত্তি করে প্রচুর পুরস্কার লাভ করল। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রতিটি কবিতা ও ছন্দ শ্রবণ করার পর বলতেন علي افضل منه অর্থাৎ তোমরা কবিতায় হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যা কিছু প্রশংসা করেছে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার চাইতে আরো অনেক আফজল। অতঃপর উক্ত মজলিসে কবি আমর বিন আস হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসায় এমন একটি কবিতা পাঠ করলেন যা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট নেহায়াত পছন্দ হল, ফলে উক্ত কবিতার বিনিময়ে উক্ত কবিকে আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাত হাজার দিনার পুরস্কার প্রদান করলেন- (আন নাহিয়া আন তায়ানে মুয়াবিয়া ২৯ পৃষ্ঠা কৃতঃ হযরত আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহি)।

তবে ইমাম তাবারীর বর্ণনা মতে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশক্রমে মিম্বরে ও জনসম্মুখে মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধীতা করা ও মন্দ বলার প্রথা চালু হওয়ার যে বিবরণ পাওয়ার যায় তা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অথবা উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্ধ ও ভুল বুঝাবুঝি বিশেষতঃ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইজতেহাদগত ভুলের কারণে। অর্থাৎ এটা ছিল হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নেতৃত্ব তাঁর অনুকূলে রাখার জন্য একটি কৌশল-মাত্র। আসলে মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শান-মান ও অসাধারণ মর্যাদা-বুজুর্গীর ব্যাপারে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আন্তরিক শ্রদ্ধা-বিশ্বাসে বিন্দু মাত্র ফরক ছিলনা। যেমন বর্ণিত আছে যে, একদা মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর একনিষ্ঠ এক বন্ধুকে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- তুমি আমাকে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মহত্ব ও গুণাগুণ বয়ান কর। যখন তিনি মওলা আলীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শান-মান ও সুমহান মর্যাদাসমূহ বর্ণনা করে শুনালেন, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অনেক কাঁদলেন এবং বললেন, আল্লাহর রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক আবুল হাছান অর্থাৎ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপর। আল্লাহর কছম, তিনি এ রকমই ছিলেন। (তারিখে ইসলাম ১ম খণ্ড উর্দূ কৃতঃ মুফতি আমিমুল ইহসান রহমতুল্লাহি আলাইহি)

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের প্রতি দৃষ্টি না করে ঢালাওভাবে একথা বলা "৪১ হিজরীতে মুয়াবিয়ার আদেশে মাওলা আলীকে জুমার খোতবায় গালি গালাজ দেওয়ার প্রথা চালু হয়"। ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিক অথবা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর রাজনৈতিক কৌশলকে বিকৃত করে সাধারণ মুসলমানকে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ছাহাবীয়ে রাসূলের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করার পাঁয়তারা ছাড়া আর কি?

প্রশ্ন ঃ "প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করেই তাঁর তিরোধানের পর মুসলমানেরা যাতে বিপদগ্রস্ত না হয় এবং মুনাফেকরা যাতে ইসলামের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই তিনি আল্লাহর হুকুমে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে গিয়েছিলেন। বিদায় হজ্জের পর মদীনায় ফেরার পথে গাদীর এ খুম নামক স্থানে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার অনুসারীর সামনে রীতিমত অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হযরত আলীকে মাওলা উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন এবং তাঁর অবর্তমানে মুসলমানদের নেতা হিসাবে মনোনয়ন দান করেছিলেন। গাদির এ খুমের অছিয়তকে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখিতরূপে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাধার কারণে সম্ভব হয়নি।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর অবর্তমানে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকেই মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত করা কি পরবর্তী খলিফাগণ মেনে নেননি? এ ব্যাপারে আপনার মতামত এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইনতেকালের পর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি বিস্তারিত বিবরণসহ পেশ করুন।

উত্তরঃ হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবর্তমানে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মুসলমানের নেতা নির্বাচন করেছিলেন কি না, এব্যাপারে স্বয়ং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় সুস্পষ্টভাবে কাউকে খলিফা নির্বাচিত করেন নাই। বরং এ গুরুদায়িত্ব মুসলমানের রায় ও পরামর্শের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমিও তোমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছি। (বর্ণনায় ইমাম আহমদ ও বাজ্জাজ রহঃ)

যদিও রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় শিয়া-রাফেজীদের ভ্রান্ত মতানুযায়ী গাদিরে খুমের ভাষণে বা অন্য সময়ে মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খেলাফত ও ইমামতকে নির্দিষ্ট করে যান, তবে তা কি হযরত আবু বকর, ফারুকে আজম, ওসমান গণি ও হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমসহ বিশিষ্ট ছাহাবীগণের মধ্যে কারো জানা ছিলনা? রাসূলে করিমের ওফাত শরীফের পর খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে যখন আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে পরামর্শ শুরু হল, তখন আলী বা আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ে প্রতিবাদ করলেন না কেন? জানের ভয়ে হক কথা লুকিয়ে [redacted] দলে অন্তর্ভূক্ত হওয়া কি মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শান হতে পারে? কখনো না।

অথচ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত শরীফের পর খেলাফতকে কেন্দ্র করে আনছার ও মুহাজিরীনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলেও পরিশেষে সবাই হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। স্বয়ং মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনে হাবানের বর্ণনা মতে প্রথম পর্যায়ে, ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা মতে ছয় মাস পর হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। (ফতহুল বারী শরহে বোখারী ও তারিখে ইসলাম ১ম খণ্ড পৃঃ ৮ কৃতঃ মুফতি আমিমুল ইহসান রহমতুল্লাহি আলাইহি)

সুতরাং হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের উপর উম্মতের ইজমা বা দৃঢ় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় যারা ছরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইনতেকালের পর ছিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে অস্বীকার করে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের ইমামগণের মতে তারা কাফির ও বেঈমান হয়ে যাবে। (ফতহুল কুদীর ও হাশিয়ায়ে তাবয়ীন ও ফতোয়ায়ে রজভীয়া ৯ম খণ্ড পৃঃ ৩৯৩)

সুতরাং এ ধরনের মন্তব্য করা " হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবর্তমানে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা বা মুসলমানের নেতা হিসাবে মনোনয়ন দান করেছিলেন" আসলে ছিদ্দীকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতকে অস্বীকার করা নয় কি?

গাদীরে খুম-এ রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বলেছেন

অর্থাৎ "আমি যার মাওলা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তার মাওলা"। (বর্ণনায় তিরমিযী ও ইবনে মাযা ইত্যাদি) উক্ত হাদীসে মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শান ও ব্যাপক মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। গাদিরে খুমের হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজর মক্কী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, যারা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইয়েমেন গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাহাবী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে অন্তরে মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছিলেন। তাদের এ সমস্ত অসন্তুষ্টি প্রত্যাখান করে মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাদের আন্তরিকতা ও বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য গাদিরে খুমে রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মাওলা উপাধীতে ভূষিত করেন। (ছাওয়ায়েকে মুহরেকা ও আছাহহুচছিয়ার পৃষ্ঠা ৫৪৯)। উক্ত হাদিসকে কোন সাহাবী স্বয়ং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজেই প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেছাল শরীফের পর মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের জন্য প্রমান স্বরূপ পেশ করেন নাই। (শরহে মাওয়াকিফ পৃষ্ঠা ৭৮)।

গাদীর এ খুমের অছিয়তকে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখিতরূপে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাঁধার কারণে সম্ভব হয়নি। এ ধরণের মন্তব্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপব্যাখ্যার শামিল। আসলে হাদীসটি ছিল নিম্নরূপঃ

عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلي الله عليه و سلم و جعه قال ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لاتضلوا بعده قال عمر ان النبي ﷺ غلبه الوجع و كتاب الله حسبنا فاختلفوا و كثر اللغط قال قوموا عني و لاينبغي عندي التنازع

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরদ ব্যাথা বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট একখানা কাগজ নিয়ে আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিপিবদ্ধ করি, যার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কষ্ট অত্যন্ত বেশী অনুভব হচ্ছে। আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে গেলেন ও হৈ চৈ শুরু করেছিলেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমার নিকট হতে উঠে যাও, আমার পার্শ্বে মত বিরোধ সমুচিত নয়। আল হাদিস (ছহীহ বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা)।

উল্লেখিত হাদীসে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বিষয়ে লেখার জন্য চেয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেন- রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মীয় অত্যন্ত জরুরী আহকাম ও বিষয়সমূহ লেখার জন্য চেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন- রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত শরীফের পর খলিফাগণের নামসমূহ লেখার জন্য চেয়েছিলেন, যাতে পরবর্তীতে মতানৈক্য সৃষ্টি না হয়। (ফতহুলবারী শরহে বোখারী কৃত ঃ ইমাম ইবনে হাজর আছকালানী রহমতুল্লাহি আলাইহি)

সুতরাং উক্ত হাদীসকে নির্দিষ্ট করে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের জন্য প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসের মনগড়া অপব্যাখ্যা নয় কি? অথচ মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু

আনহু এবং আহলে বায়তে রাসূলের কেউ উক্ত হাদীস শরীফকে মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের জন্য প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেন নাই। (ফতহুল বারী ওমদাতুল ক্বারী শরহে বোখারী ও শরহে মাওয়াকিফ ইত্যাদি।)

প্রশ্ন ঃ রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর তাঁর পবিত্র দেহ মোবারকের দাফন না সেরেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহলে বাইতকে বাদ দিয়ে উমাইয়্যারা গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচন করেন।" এ উক্তিটি কি ঠিক? উত্তরঃ এ ধরণের উক্তি অবশ্যই ষড়যন্ত্রমূলক এবং ছাহাবায়ে রাসূল বিশেষতঃ আনছার ও মুহাজিরীনে কেরামের শানে অপবাদ ছাড়া আর কি ? অথচ অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিসীন ও ফোকাহায়ে কেরামের চূড়ান্ত মতানুযায়ী ছরকারে দো'আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত শরীফের পর অধিকাংশ আনছার ও মুহাজেরীনের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ম খলিফা হযরত বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নির্বাচিত হন। (তারিখে ইসলাম তারিখুল খোলাফা ও আছাহহুচ ছিয়ার ইত্যাদি)। সুতরাং এ জাতীয় কটুক্তি সকল ছাহাবায়ে কেরাম তথা আনছার মোহাজিরীনের মান-মর্যাদার প্রতি অবমাননা। বিশেষতঃ হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে অস্বীকার করার নামান্তর, যা স্পষ্ট বেঈমানী ও গোমরাহী।

প্রশ্ন ঃ মুয়াবিয়াই হলো ইসলামের মূল্যবোধগুলো ধ্বংস করার, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধরদের হত্যার নীলনক্সা প্রদানকারী ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার ও সর্বোপরি কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার মূল নায়ক।" এ উক্তিটির ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ আসলে এ ধরণের উক্তি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ষড়যন্ত্র ও কুচক্রীদের জঘন্যতম হামলাস্বরূপ। খারেজী-রাফেজী ছাড়া এ যাবৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের কোন ইমাম এই জাতীয় উক্তি কখনো করেন নাই। যদিও মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধ-বিদ্রোহ হয়েছে এবং আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওফাতের পূর্বেই ইয়াজিদের জন্য নেতৃত্ব চূড়ান্ত করেছেন। এটা ছিল তাঁর ইজতেহাদগত ভুল। যেহেতু তিনি নিজেই একজন ফকিহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। যেমন ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জানতে চাইলে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন- অবশ্যই তিনি (হযরত মুয়াবিয়া) একজন ফকিহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। (মেশকাত শরীফ ১২২ পৃষ্ঠা।)

এ কথা চিরসত্য যে, মুজতাহিদের ইজতেহাদগত ভুল ধর্তব্য নয় বরং ইজতেহাদগত ভুলেও মুজতাহেদীন কেরাম একটা পুরস্কার পাবেন। (নুরুল আনোয়ার)। সুতরাং এ ধরনের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে সামান্যতম কটুক্তি ও অশ্রদ্ধাবোধ করা যাবে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত। (শরহে মায়াকিফ ও শরহে আক্বায়েদে নছফী)। আল্লামা আবু ইছহাক রহমতুল্লাহি আলাইহি 'নুরুল আইন ফি মাশহাদিল হোছাইন' কিতাবে বর্ণনা করেন- "হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইনতেকালের পূর্বে ইয়াজিদ জিজ্ঞাসা করল, আপনার পরে খলিফা কে হবে? আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তদুত্তরে বলেন- "তুমি হবে, তবে আমার কিছু কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। কোন কাজ ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পরামর্শ ছাড়া করবে না। ইমাম হোসাইনের খোজ খবর প্রথম নম্বরে স্থান দিবে। ইমাম হোসাইন এবং তাঁর পরিবারবর্গের সাথে ভাল ব্যবহার করবে"। (খোতবাতে মুহাররম পৃষ্ঠা ৩১৩ কৃত ঃ মুফতি জালাল উদ্দীন আহমদ আমজাদী)।

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যেভাবে কেনান কাফেরের (হযরত নূহ (আ.) এর পুত্র) কারণে আল্লাহর পয়গম্বর হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে দোষারোপ করা যাবে না। তদ্রুপ নবী বংশধরের হত্যাকারী বিশেষতঃ কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার মূলনায়ক পথভ্রষ্ট ইয়াজিদের কারণে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর শানে আক্রমন করা যাবে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের চূড়ান্ত ফয়সালা। আসলে উপরোক্ত উক্তিসমূহ শিয়া-রাফেজীদের মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বায়তে রাসূলের প্রতি অধিকতর ভালবাসার নামে এক অশুভ ও ভ্রান্ত চক্রান্ত। সুতরাং এ ধরণের ভ্রান্ত চক্রান্তের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি আহবান রইল।

শিয়া সম্প্রদায়

কাযী মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন আশরাফী *

পবিত্র কুরআন ও সুন্নায় মুসলমানদের ঐক্যের প্রতি অধিক জোর দেয়া হয়েছে। কারন, ঐক্যই শক্তি। ঐক্যবদ্ধ জাতি যে কোন কঠিন কাজ সহজে সম্পাদন পূর্বক সুফল নিয়ে আসতে সক্ষম। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সবাই মজবুতভাবে আকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। অপর আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন নিশ্চয়ই এটা আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এপথ অনুসরণ করো। এর বিপরীত পথগুলোতে চলো না। তখন শয়তান তোমাদেরকে আল্লাহর বার্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। (আল কুরআন)

অনুরূপভাবে অসংখ্য হাদিস ঐক্যের গুরুত্বের উপর বিদ্যমান। অপরদিকে মুসলমানরা ঐক্যের বিষয়টি নানা ভাবে বর্ণনা করে ঐক্যের গুরুত্ববোধ জাগিয়ে তোলার ও সজীব রাখার প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কোন হাদিসে বলা হয়েছে "আল্লাহর হাত" জামাত বা ঐক্যবদ্ধ দলের উপর। অপর হাদিসে বলা হয়েছে " যে ব্যক্তি দল থেকে এক বিখ্যাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হলো সে জাহান্নামে পতিত হল। অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে "যে ব্যক্তি দল ছেড়ে এক হয়ে গেল, সে জাহান্নামে পতিত হল"। এ ধরনের আরো অনেক হাদিস "মিশকাত শরীফ" "ইতেছাম বিল কিতাব ওয়াছছুন্নাহ" অধ্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রেখা অংকিত করে সাহাবা কেরামকে "সিরাতে মুস্তাকিম" তথা সরল ও নাজাতের পথ এবং শয়তানের অনেকগুলো পথের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এ হাদিসটি মিশকাত শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব, আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে ঐক্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে জোরালোভাবে তাগিদ দিয়েছেন। কেননা, মুসলমানদের ধ্বংস অনৈক্যের মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ ও রসুলের পক্ষ থেকে এতো তাগিদ ও অনৈক্যের সুদুর প্রসারী ক্ষতি সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করার পরও বাস্তবতা হলো, মুসলমানগণ কুরআন সুন্নাহর প্রদর্শিত পথে টিকে থাকতে পারেনি। এতো বাধা নিষেধকে উপেক্ষা করে তারা বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সত্যটি অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কারন, "ইলমে গায়েব" বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে ভবিষ্যতে দলাদলি যে চরম আকার ধারন করবে এ বিষয়েও ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই বনী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের সবাই জাহান্নামে পতিত হবে, কিন্তু একটি মাত্র দল ছাড়া। তখন সাহাবা কেরাম জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রসুল! নাজাতপ্রাপ্ত দল কারা? তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাহাবাদের পথ ও মত (এর উপর প্রতিষ্ঠিত দল)।" এ হাদিসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (র.) থেকে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত হাদিসসমূহে 'জামাত' বা 'দল' 'সিরাতে মুস্তাকিম' ও সর্বশেষ হাদিসে 'নাজাতপ্রাপ্ত' দল বলতে- ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' কে বুঝানো হয়েছে। এটাই মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত মতামত। বিভিন্ন নামে আবির্ভূত দল-উপদলগুলোর কেউ নিজেদেরকে "আহলে সুন্নাত" দাবী করলেও দলিল দ্বারা তা প্রমাণিত করতে পারবে না। এটা নিশ্চিতভাবে আমরা দাবী করি। মিশকাত শরীফের সর্বাধিক আলোচিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরকাত' কিতাবে এতদ্‌বিষয়ে নিশ্চয়তা সহকারে বলা হয়েছে যে, নাজাতপ্রাপ্ত দল 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'।

উল্লেখযোগ্য যে, অনেক নিকট অতীতে প্রকাশিত ভ্রান্ত দলের অনুসারীগণ নিজেদের ভ্রান্তি লুকানোর উদ্দেশ্যে বলে থাকে- "আমরা বাহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত নই। কারন, ভ্রান্ত দলের সংখ্যা বাহাত্তর তো শত শত বৎসর পূর্বেই পূর্ণ হয়ে গেছে।" তাদের এ ধরনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও চরম ধোকাবাজী। কেননা আলোচ্য হাদিসে তিয়াত্তর সংখ্যাটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানোর জন্য নয় বরং আধিক্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। অন্যথায় উল্লেখিত সংখ্যাটি পূর্ণ হবার পর আবির্ভূত কোন দলের আক্বীদা বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত ও কুফরি হোক না কেন তাদেরকে বাতিল বলা যাবে না' এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য মত হতে পারে না। তাই মুহাদ্দিসগণ সংখ্যাটি আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত বলে মত প্রকাশ করেছেন। যেমন 'মিরকাত' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, কোন দল বা সম্প্রদায় সম্পর্কে হক-বাতিল মন্তব্য করার পূর্বে তাদের দলীয় আক্বীদা বিশ্বাস কেমন তা অবশ্যই যাচাই করতে হবে। অতঃপর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নির্ভুলভাবে যাচাই করে দেখতে হবে।

* প্রধান মুহাদ্দিস- ছোবহানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

উল্লেখ্য যে, যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন, তবে- তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, সালফে সালেহীন এর ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্যথায় চরম ভ্রান্তির স্বীকার হতে হবে। অনেকে বলেন- প্রত্যেক দলই তো কুরআন-হাদিসের আলোকেই নিজেদের মতবাদ প্রচার করে চলেছে। এখানে কোন্‌টা হক আর কোন্‌টা বাতিল সেটা বুঝার উপায় কি? এটা তো বাস্তব সত্য যে, কোন দল বা সম্প্রদায় নিজেদের মতাদর্শের পক্ষে কুরআন সুন্নাহকে বাদ দিয়ে অন্য পথে প্রমাণ করতে চাইলে তা মুসলমানমাত্রই কোনভাবে গ্রহণ করবে না। তাই তারা ভ্রান্তি প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহর বাহ্যিকভাবে আশ্রয় নেবে। কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে যতটুকু কৌশল আছে তা অবলম্বন করবে। এটাই এ যাবত ইসলামের নামে আবির্ভূত সকল বাতিল দল-উপদলের উল্লেখযোগ্য কৌশল। এ কারনেই প্রখ্যাত সাহাবী, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রঃ) এর সুযোগ্য সন্তান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) খারেজী সম্প্রদায়কে সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচনা করতেন। কারন, তারা কাফিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াতগুলোকে ঈমানদারদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত। (বুখারী শরীফ ২য় খন্ড)

একশ্রেণীর সরলপ্রাণ মুসলমান কোন বাতিল ফেরকাকে এ কারনে বাতিল বলতে রাজি হয়না যে, তারা তো নামায রোযায় বেশ অগ্রগামী ও যত্নবান। এরা কেমনে বাতিল বা গোমরাহ হবে!

এরা ফরয, সুন্নাত-মোস্তাহাব ইত্যাদি পালনে বেশ যত্নবান ও উৎসাহী, তারা কি করে পথভ্রষ্ট হতে পারে! সেক্ষেত্রে আমাদেরকে সাহাবা কেরামদের অনুসরণ করতে হবে। খারেজীদের নামায, রোযা, তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি বিষয়ে অতীব যত্নবান দেখার পরও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) কেন তাদেরকে সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করতেন, তা কারনসহ একটু আগেই সহীহ বুখারী শরীফের রেফারেন্সে আলোচনা করেছি। আমাদেরকেও এক্ষেত্রে শুধু তাদের নামায, রোযা, তেলাওয়াত বা ইসলামী বিধি-বিধান পালনে যত্নবান দেখেই তাদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করলে আমরা মারাত্মক ভুল করব। বরং দেখতে হবে তাদের আক্বীদা বিশ্বাস। আর তারই আলোকে কোন ফেরকা বা দলকে হক বা বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। অন্যথায় শুধুমাত্র তাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও আচার-আচরণ দেখে মুগ্ধ হলে চরমভাবে ধোকায় পড়তে হবে। যেমনিভাবে অনেক সুন্নী পরিবারের লোকজন এভাবেই নিজের অজান্তে গোমরাহির স্বীকার হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে।

এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে এ অধমের লিখিত 'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসরামের মুল ধারা ও বাতিল ফেরকা' নামক গ্রন্থটি মনযোগ সহকারে পড়ুন। এতে শিয়া, ওহাবী, মওদুদী ও তাবলিগী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পন্থায় প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

ইসলামের ইতিহাসে-ইসলামের নামে আবির্ভূত দলসমূহের মধ্যে শিয়া ও খারেজী সবচেয়ে প্রাচীন। অর্থাৎ এদের আত্মপ্রকাশ সাহাবা কেরামের যুগেই ঘটেছে। সুতরাং এটা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হিংসা-বিদ্বেষের কারনে কারো বিরুদ্ধে অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এ যাবৎ আবির্ভূত বাতিল ও ভ্রান্ত দল-উপদলের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায় এর ইতিহাসই বেশ দীর্ঘ এবং এদের উপদলের সংখ্যাও অনেক বেশি। এ পরিসংখ্যানে শিয়া সম্প্রদায়ের উপদলের সংখ্যা তিনশত বলেও প্রমাণিত হয়েছে। (দেখুন-"মিন্ আকায়েদিশ্ শিয়া" আরবী ভাষায় লিখিত পুস্তিকা)। অনুরূপভাবে বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে জৌযীর (রঃ) (ওফাত ৫৯৭ হিঃ) লিখিত প্রামাণ্যগ্রন্থ "তাল্‌বিসে ইবলিস" নামক কিতাবেও শিয়াদের উপদল সমূহ এবং তাদের আক্বীদা বিশ্বাসের উপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্প্রদায়টির ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য বিনষ্টের ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা অনেক। আজকের ইরাক সমস্যার পেছনেও তাদের ভূমিকা রয়েছে তা আজ প্রমানিত সত্য। নিম্নে শিয়া সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তাদের ভ্রান্ত আক্বিদা বিশ্বাস এর বর্ণনা পেশ করা হলো।

শিয়া ফিরকা ঃ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার দৃষ্টান্ত কিছুটা ঈসা আলাইহিস সালামের মত। ইয়াহুদীগণ তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। তাঁর মা (হযরত মরিয়ম আলাইহাস সালাম) এর প্রতি অপবাদ দিয়েছে। আর নাসারাগণ তাঁকে অধিক ভালবেসে তাঁকে ঐ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলো, যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। অর্থাৎ (তাঁকে ইবনুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে আক্বীদা পোষণ করে)। অতঃপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমাকে কেন্দ্র করে দু'ব্যক্তি (অর্থাৎ দু'ধরনের মানুষ ধ্বংস হবে) প্রথমতঃ আমাকে সীমাতিরিক্ত মুহাব্বতকারী, যে আমার এমন প্রশংসা করবে যা আমার মধ্যে বিদ্যমান নেই। দ্বিতীয়তঃ আমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী; এটা তাকে আমার প্রতি অপবাদ দিতে উৎসাহিত করবে। (মাসনাদে আহমদ)। আলোচ্য হাদিসে হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে সীমাতিরিক্ত মুহাব্বতকারী বলতে

শিয়াদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণকারী বলতে খারেজীদেরকে বুঝানো হয়েছে। উভয় দল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কেন্দ্র করে চরম লাগামহীনতার পরিচয় দিয়েছে। একমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মর্যাদার যথাযথ সংরক্ষণ করেছে।

শিয়া সম্প্রদায় ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা ঃ

শিয়া সম্প্রদায় হযরত ওসমান যিননুরাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতকালীন রাজনৈতিক গোলযোগ এবং শাহাদাত বরণের সময় সৃষ্ট একটি ভ্রান্ত দল। এ দলের মূল প্রবক্তা ইয়েমেনের রাজধানী 'সানা'র এক প্রভাবশালী ইয়াহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। ইবনে সাবা'র বংশ ইয়াহুদীদের ধর্মীয় জ্ঞান ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ছিল। ইবনে সাবা স্বয়ং তাওরীত-ইঞ্জিলের অভিজ্ঞ আলেম ছিল। আরবী ভাষায়ও তার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। স্বীয় আক্বীদায় কট্টরপন্থী ছিলো। সে তীক্ষ্মমেধা, দূরদর্শিতা, সতর্কতা, অটলতার অধিকারী ছিল। তার মাথায় কুট-কৌশলের ভান্ডার ছিল। মানুষের মন-মস্তিস্ক উপলব্ধির বেশ ক্ষমতা ছিল। সুযোগ ও ক্ষেত্র নির্ণয়ে বেশ পটু ছিল। ইসলামের সার্বিক বিজয়ের ফলে ইয়াহুদীদের অস্তিত্ব চরমভাবে বিপন্ন হবার বিষয়টি সব সময় তাকে পীড়া দিত। এর প্রতিশোধ গ্রহণের মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ইবনে সাবা সকল প্রকার কুট-কৌশল নিয়ে প্রহর গুণছিল। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর খেলাফত কালকে যথোপযুক্ত সময় বিবেচনা করে সে মদীনা শরীফ আগমন করে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে ইসলাম কবুল করে। অতঃপর তাঁর খেলাফতকালীন রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে সে তার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে শুরু করে। উমাইয়াদের বিরুদ্ধে হাশেমী অপরাপর আরবদের ক্ষেপাতে আরম্ভ করে। সরলপ্রাণ মুসলমান অনেকে তার কুট-কৌশলের জালে আটকে পড়ে। অতঃপর সে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা শুরু করে। ফলে তাকে মদীনা শরীফ থেকে বের করে দেয়া হয়। সে বসরা গমন করে সেখানে তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। অতঃপর যখন সে দেখল, কিছু মুসলমান তার অনুগত হয়ে উঠেছে, তখন সে তার মূল কর্মসূচী বাস্তবায়নে পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন ভিত্তিহীন মনগড়া আক্বীদা প্রচার আরম্ভ করে। তা হলো-"হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন"। এর পূর্বে সে নিজেকে "আহলে রাসুল" বা নবী বংশের বড় ভক্ত হিসেবে প্রকাশ করে। সে তার ভ্রান্ত আক্বীদার পক্ষে আয়াতে কোরআন- ان الذى فرض عليك القران لرادك الي معاد

অর্থাৎ হে প্রিয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) "নিশ্চয় যিনি কোরআনের বিধান পালন আপনার উপর ফরয করেছেন তিনি আপনাকে প্রত্যাবর্তন স্থলের দিকে ফিরিয়ে দিবেন।" (সুরা ক্বাসাস) কে কৃত্রিমভাবে দলীল গ্রহণ করে মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়। অতঃপর সে শিয়াদের অন্যতম আকীদা 'ইমামত' এর প্রচার শুরু করে। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর একজন 'ওয়াসি' উযির বা স্থলাভিষিক্ত থাকে। যেমন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উযির ছিলেন হযরত ইউশা ইবনে নু'ন আলাইহিস সালাম। তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ওয়াসি' হলেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাওহীদ, রিসালাতের মতো 'ইমামতের' উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। পরবর্তীতে এ আক্বীদা আরো বিস্তৃত হয়ে এরূপ পরিগ্রহ করে যে, নবীগণ যেভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত, ইমামগণও সেভাবে প্রেরিত। ইমাম নবীর মত শরীয়তের বিধানসমূহ প্রবর্তন করবেন এবং কোরআনের যে বিধান যখন ইচ্ছা মানসুখ বা রহিত করতে পারবেন। আলে রাসুল বা নবী বংশের মুহাব্বতের উপর কৃত্রিমভাবে প্রতিষ্ঠিত ইবনে সাবার এ ভ্রান্ত আক্বীদাগুলো উমাইয়া বিরোধী লোকজন সহজে গ্রহণ করলো এবং এরা ইসলামের একটি নতুন ফিরকা 'শিয়া' নামে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে এদের মধ্যে অনেক দল-উপদলের আবির্ভাব ঘটে। এগুলোর পৃথক পৃথক কুফরী আক্বীদা রয়েছে। তন্মধ্যে ইসনা আশারীয়া বা দ্বাদশ ইমামী ও ইসমাঈলীয়া বা সপ্ত ইমামী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ইরানের সাফাভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাঈল দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী শিয়াদের মতবাদকে ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করে। অদ্যবধি ঐ মতবাদই ইরানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে বিদ্যমান। ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খামেনী দ্বাদশ ইমামী শিয়া।

শিয়া আক্বাঈদ ঃ

শিয়া কালেমা-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ আলীউন ওয়াসিউল্লাহ ওয়া ওয়াসিও রাসুলিল্লাহ ওয়া খলীফাতুহু বেলাফাসলিন।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল। আলী আল্লাহর বন্ধু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসি ও তাঁর পরেই খলীফা। অন্য বর্ণনায়, লা-

ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ ওয়া আলীউন খলীফাতুল্লাহ। (শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ, পৃষ্ঠা ১৬, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩২)।

আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঃ

ঈমানের মূলমন্ত্র কালেমা-এ তাইয়্যেবা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ।" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

শিয়া আক্বাঈদ ঃ

আক্বীদা-এ-ইমামত অর্থাৎ মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় যাবতীয় বিষয়ের একমাত্র কর্ণধার যিনি-তিনি ইমাম। এ ইমাম নবী রাসুলের ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং নিষ্পাপ। ইমামের আনুগত্য ফরয যেমন নবী রাসুলের আনুগত্য উম্মতের উপর ফরয। ইমামদের মর্যাদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান এবং অন্যান্য নবীদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। শুধু উম্মতের উপর নয় বরং সমগ্র পৃথিবীর উপর যে কেউ হুকুমত (রাজত্ব) করবে, সে হক ধ্বংসকারী, যালিম ও সীমালংঘনকারী। ইমাম নবীর মতো শরীয়তের বিধান প্রবর্তন করেন এবং কোরআনের যে কোন বিধান যখন ইচ্ছা করেন মানসুখ বা রহিত করতে পারেন। (ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ২৮, শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ পৃষ্ঠা ৯, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৩৩)।

আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঃ

ইমাম খোলাফায়ে রাশেদীন-এর নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন। তিনি তাঁর কার্যকলাপের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। ইমামের জন্য নিষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়। শুধু নবী-রাসুলগণই মাসুম বা নিষ্পাপ। কোন ইমাম বা ওলী কোন নবীর স্তরে পৌঁছতেই পারে না। ইমামের মর্যাদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান মনে করা কিংবা অন্যান্য নবীদের চেয়ে উর্ধ্বে মনে করা নবী-রাসুলগণের মহান মর্যাদার চরম অবমাননা; বিধায় কুফরী। শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে নির্বাচিত যে কোন মুসলমান, এমনকি নিগ্রো হাবশী দাসও খলীফা নির্বাচিত হতে পারেন। এমতাবস্থায়ও তার পূর্ণ আনুগত্য করা মুসলমানদের উপর একান্ত কর্তব্য। ইমাম কোরআন-সুন্নাহর কোন বিধান মানসুখ বা রহিত করার ন্যূনতম ক্ষমতা রাখেন না। কোরআনের কোন বিধান রহিত করার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

শিয়া আক্বাঈদ ঃ

শিয়াদের একটি বিরাট অংশ, বিশেষ করে ইসমাঈলিয়ারা বিশ্বাস করে যে, ইমাম ইসমাঈল আখেরী নবী। (মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৩৩)।

আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঃ

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন্ নাবীয়্যীন অর্থাঃ শেষ নবী। তাঁর পর কোন নবীর আবির্ভাবের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করা পবিত্র কোরআনের সরাসরি অস্বীকার। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী।

শিয়া আক্বাঈদ ঃ

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সকল সাহাবা কেরাম নিষ্পাপ ইমাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে বাইআত না করার কারণে কাফির এবং মুরতাদ হয়ে গেছেন। (শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ, পৃষ্ঠা ১২)।

অপর বর্ণনায় শুধুমাত্র তিনজন সাহাবী ইসলামের উপর অটল ছিলেন। ঐ তিনজন হলেন, হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ, হযরত আবু যার গিফারী ও হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহুম। (ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ২২৩)।

আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঃ

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সকল সাহাবা ঈমান-ইসলামের উপর অটল অবিচল ছিলেন এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন রক্ষায় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে খলীফা নির্বাচিত করে সময়োচিত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শিয়াদের এ আক্বীদা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াতের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। কোন মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে না যে, তেইশ বছরে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তৈরী সাহাবা কেরামের এ বিরাট জামা'আত তাঁর ওফাতের সাথে সাথে সকলেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন।

শিয়া আক্বাঈদ ঃ

তাহরীফে কোরআন। অর্থাৎ শিয়াদের মতে কোরআন শরীফ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে সংকলিত হয়নি; বরং এতে অনেক বিকৃতি হয়েছে। কোরআন শরীফের সর্বমোট আয়াতের সংখ্যা ১৭,০০০ (সতের হাজার)। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত ও আহলে বায়তে রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত আয়াতগুলো কোরআন শরীফ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। বর্তমান আয়াতের সর্বমোট সংখ্যা ৬,৬৬৬ (ছয় হাজার ছয়শত ছিষট্টি)। শিয়াদের মতে ১০,৩৩৪(দশ হাজার তিনশত চৌত্রিশ) আয়াত বাদ দেয়া হয়েছে। যে বিশ্বাস করে যে, কোরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে সংকলিত হয়েছে সে বড় মিথ্যাবাদী। কোরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে একমাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তৎপরবর্তী ইমামগণ সংকলন করেছেন। ঐ কোরআন নিয়ে তাদের ইমামে গায়েব (অদৃশ্য ইমাম) "সুররামান্‌রা" পাহাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। যখন তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন "মাসহাফে আলী" বা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক সংকলিত কোরআন নিয়ে আসবেন। (ইরানী ইনকিলাব পৃষ্ঠা ২৫৯, ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৫৪ ও ৫৫)।

আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঃ

পবিত্র কোরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত। এর নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন। কোরআন শরীফের সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬,৬৬৬ (ছয় হাজার ছয়শত ছিষট্টি)। আহলে বায়তে রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা নবী বংশের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত আয়াত বর্তমানেও পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও সর্বশেষ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কোরআন যথাযথভাবে সংকলিত হয়েছে। ঐ কোরআন করিম অদ্যাবধি মুসলমানদের মধ্যে অবিকৃত রূপে বিদ্যমান। এতদ্‌বিষয়ে বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা অমূলক, মনগড়া, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর। তার প্রমাণ পায় দেড়শত বছর পূর্বে শিয়াদের কোন কোন আলিম "কোরআন বিকৃতির" এ জঘন্য আক্বীদাকে ঘৃণ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তাদের বিশুদ্ধ কিতাব "উসুলে কাফী" ও তাদের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ নূরী তাবুরুসীর "ফাসলুল খেতাব ফী এসবাতে তাহরীফে কিতাবে রব্বীল আরবাব" নামক কিতাবে কোরআন শরীফ বিকৃত হবার বিষয়ে ভিত্তিহীন বর্ণনায় পরিপূর্ণ। (ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৫৪ ও ৫৫, ইরানী ইনকিলাব পৃষ্ঠা ২৬১ ও ২৬২)।

শিয়া আক্বাঈদ ঃ

শিয়াদের মতে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গাদীরে খোম' নামক স্থানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তাঁর পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত ও খলীফা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং খেলাফতের একমাত্র অধিকারী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। প্রথম তিনজন খলীফা যথাক্রমে- হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক-এ-আযম ও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম খেলাফতের অবৈধ দাবীদার ও দখলদার। তাঁরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ষড়যন্ত্রমূলক খেলাফতের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। বিধায় তারা যালিম, মুনাফিক ও জাহান্নামী। এতে শিয়াগণ হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর তুলনায় প্রথম দু'জন খলিফাকেই জঘন্য অপরাধী মনে করে। তারা বলে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ফারুক-এ-আযম উভয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও আহ্‌লে বায়তে রাসুল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অন্যায় ও যুলুম করেছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মনগড়া হাদিসের মাধ্যমে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে তাঁর পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। (ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৪৮)।

আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঃ

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষদিকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মসজিদে নববী শরীফে তাঁর স্থলে ইমামতি প্রদানের মাধ্যমে তাঁর পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতের দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতের দলীল পেশ করেছেন। (তারীখুল খোলাফা)। ইমাম দারে কুতনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করে আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের জন্য খলীফা মনোনয়ন করে দিন। তিনি বললেন না। আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেন তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের উপর খলীফা নিযুক্ত করবেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের মঙ্গল চেয়েছেন- অতঃপর হযরত আবু বকর
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। সুন্নীদের মতে শ্রেষ্ঠত্ব, যোগ্যতা ও সার্বিক
সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে আমাদের উপর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। হযরত ওমর ফারুক-এ-আযম, হযরত ওসমান ও
বিবেচনায় খোলাফায়ে রাশেদীন যথাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক-এ-আযম, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম চারজনই বৈধ ও নির্বাচিত খলীফা। নবীদের পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি এ চার জন। (শরহে আক্বাঈদ-এ-নাসাফী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৩৩, ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব, পৃষ্ঠা ২৫০)।

শিয়া আক্বাঈদ :

শিয়াদের হাদিস বা সুন্নাহর পৃথক কিতাব; তারা সেহাহ সিত্তার হাদিসগ্রন্থগুলো মানে না। তাদের নিকট বিশুদ্ধ কিতাব- উসুলে কাফী, আল জামেউল কাফী, নাহজুল বালাগা ইত্যাদি।

আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত :

সুন্নী মুসলমানদের নিকট পবিত্র কোরআনের পর বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ বোখারী শরীফ। অতঃপর বাকী পাঁচটি কিতাব। যেগুলোকে " সেহাহ সিত্তা" বা হাদিস শাস্ত্রের ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়াও আরো অনেক বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাব রয়েছে। শিয়াদের হাদিসগুলো মনগড়া ও জালকৃত।

শিয়া আক্বাঈদ :

শিয়াদের কোরআনে "সুরাতুল বেলায়াত" নামে একটি সুরা রয়েছে। তাদের মতে এটা কোরআন শরীফ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। শিয়াদের প্রখ্যাত মুজতাহিদ নুরী তাবরুসী "ফাসলুল খেতাব" নামক কিতাবে ঐ সুরা উল্লেখ করেছেন। যার প্রথম আয়াত নিম্নরূপ-

يا ايها الذين امنوا امنوا بالنبي و بالولي الذين بعثنا هما يهدايانكم الى صراط مستقيم

(ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ২৭৮ শিয়া সুন্নী ইখতেলাফ, পৃষ্ঠা ২৬)।

আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত :

সুন্নীদের মতে, পবিত্র কোরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে অবিকৃত, সংরক্ষিত ও সংকলিত। "সুরাতুল বেলায়াত" শিয়াদের মনগড়া ও বানানো। যদিও বা এটা তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাবে সংরক্ষিত আছে। শিয়াগণ কোরআন বিকৃতিতে বিশ্বাসী।

শিয়া আক্বাঈদ :

শিয়াদের মতে "মোতা" বা সাময়িক বিয়ে বৈধ, বরং সাওয়াবের কাজ। অর্থাৎ একজন মুসলমান পুরুষ বা নারী অর্থের বিনিময় কিছুক্ষণ যৌনসঙ্গম করতে পারবে। (শিয়া আলেমদের সর্ব সম্মতিক্রমে প্রকাশিত ইশতেহার, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পাকিস্তান। ইসমাল আওর খামেনী মাযহাব, পৃষ্ঠা ৪৩৮, ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৮৯)।

আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত :

সুন্নীদের মতে 'মোতা' বা সাময়িক বিয়ে সম্পূর্ণভাবে হারাম। এ ধরণের সাময়িক বিয়ে আর যিনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ ধরণের সাময়িক বিয়ের বৈধতা দান ইসলাম ও মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের কুট-কৌশল মাত্র। মোতা বা সাময়িক বিয়ে হারাম হওয়ার উপর ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শিয়া আক্বাঈদ :

তাকীয়া অর্থাৎ আসল বিষয়কে গোপন করে, মুখে ভিন্ন ধরণের মত প্রকাশ করা শিয়াদের অন্যতম ধর্মীয় নীতি। অনুরূপভাবে "তাবাররা" অর্থাৎ শিয়া না এমন সব মুসলমানদের মনে প্রাণে ঘৃণা করা। যদিও সাহাবী হোক না কেন। এটাও তাদের উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় বিধান। (শিয়া ওলামাদের সম্মিলিত ইশতেহার, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পাকিস্তান। ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব, পৃষ্ঠা ৪৩৭ ও ৪৩৮)।

আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত :

"তাকীয়া" চরম মোনাফেকী ও "তাবাররা" নিঃসন্দেহে হারাম। মুসলমানের মুহাব্বত ও শত্রুতা হতে হবে আল্লাহর ওয়াস্তে ও ইসলামের স্বার্থে। তখনই মুসলমানের ঈমান কামিল ও পরিপূর্ণ হবে। শিয়াদের "তাবাররা" মুসলমানদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও হানাহানি সৃষ্টির এক নীরব হাতিয়ার মাত্র।

শিয়াদের এমনি আরো অনেক ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিশ্বাস রয়েছে। যা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা দুষ্কর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাদের কয়েকটি জঘন্য আক্বীদা পেশ করা হলো। যাতে সরলপ্রাণ মুসলমানগণ নিজেদের ঈমান-আক্বীদা রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং শিয়াদের মোনাফেকী চরিত্রের শিকার হয়ে ঈমান-আক্বীদা না হারায়। কারো মনে এ ধারণা লাগতে পারে,

এসব জঘন্য কুফরী আক্বীদা আগেকার শিয়াদের ছিল, বর্তমানে এগুলোর প্রায়ই পরিহার করেছে। শুধুমাত্র নবীবংশের প্রতি লাগামহীন ভালবাসা প্রকাশ করে। বর্তমান ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও শিয়াদের ধর্মীয় ইমাম ও নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খামেনীর ব্যাপারেও মুসলিম বিশ্বের অনেকে, বিশেষতঃ জামাতে ইসলামী ও দেশের তথাকথিত কিছু আলেম অজ্ঞাত কারণে তাকে বিশ্ব মুসলিমের একমাত্র "কায়েদ" নেতা ও "রাহনুমা" পথ প্রদর্শক হিসেবে মনে করেন এবং তা প্রচার করেন। তাই এখানে খামেনীর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচিত গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে পেশ করা হলো।

'আক্বীদা-এ-ইমামত বা ইমাম সম্পর্কিত বিশ্বাস' এতদ্‌বিষয়ে খামেনী বলেন-

ان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسل

অর্থাৎ আমাদের মাযহাব (শিয়া দ্বাদশ ইমামী)-এর মৌলিক বিষয়াবলীর মধ্যে অন্যতম একটি হলো যে, আমাদের ইমামগণের এত বড় মর্যাদা, যেখানে কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেস্তা (জিব্রাইল আলাইহিস সালাম) ও কোন "মুরসাল" নবী পৌঁছতে পারে না। (আল হুকুমাতুল ইসলামীয়া, কৃতঃ আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খামেনী, শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ, পৃষ্ঠা ২৭, ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৩৬)।

এখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, খামেনীর মতেও ইমাম এর মর্যাদা নবী-রাসুল ও নৈকট্য-প্রাপ্ত ফেরেস্তার মর্যাদা থেকে অনেক উর্ধ্বে। (নাউযুবিল্লাহ)।

"তাহরীফে কোরআন" বা "কোরআন শরীফ বিকৃত" এতদ্‌বিষয়ে শিয়াদের মৌলিক নীতি বিধানের সাথে একাত্মতা করে খামেনী বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা কোরআনে ইমাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিতেন, তখন যাঁরা (হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ও অন্যান্য সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) ইসলাম ও কোরআনের সাথে শুধুমাত্র দুনিয়া ও হুকুমত অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, এছাড়া ইসলাম ও কোরআনের সাথে তাদের আর কোন প্রকার সম্পর্ক নেই, তাদের জন্য এটা সম্ভব ছিল যে, তারা ঐসব আয়াত কোরআন থেকে বাদ দিত। এ পবিত্র আসমানী কিতাবে বিকৃতি করত এবং কোরআনের এ অংশকে চিরদিনের জন্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়ালে করে দিত। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমান ও তাদের কোরআন সম্পর্কে এটা লজ্জার বিষয়ে পরিণত হত। মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইয়াহুদী-নাসারা কর্তৃক তাদের আসমানী কিতাব বিকৃতির যে আপত্তি-দোষ আরোপিত হয়েছে ঐ দোষ তাদের (সাহাবাদের) উপর আরোপিত হত। (কাশফুল আসরার-কৃতঃ আয়াতুল্লা রুহুল্লা খামেনী-পৃষ্ঠা ১১৪, ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৫৯, ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব, পৃষ্ঠা ৫৩)।

এখানে প্রমাণিত হলো যে, খামেনীর মতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও অপরাপর সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম কেবলমাত্র পার্থিব স্বার্থ ও ক্ষমতা লাভের মানসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল (নাউযুবিল্লাহ)। "কাশফুল আসরার" কিতাবে তিনি জোরালো ভাষায় এ দাবী করেছেন। আরো বলেছেন যে, উপরোক্ত তিনজন ও তাঁদের সহযোগী প্রবীণ সাহাবাগণ দুনিয়ালোভী এবং অত্যন্ত নিম্ন ধরণের দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। তারা হুকুমত দখলের লোভে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে ইসলাম কবুল করেছিল। এরা শুধু বাহ্যিকভাবে মুসলমান ছিল, আন্তরিকভাবে কাফির ও যিন্দিক ছিল। এরা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থের জন্য যেকোন ধরণের গর্হিত কাজ করতে পারত। এর জন্য প্রয়োজনে কোরআন শরীফ বিকৃত করতে পারত, মিথ্যা ও মনগড়া হাদিস বানাতে পারত। তাদের অন্তর আল্লাহর ভয় শূন্য ছিল। তারা প্রকৃতপক্ষে ঈমান থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা যদি মনে করত যে, তাদের এ হীন স্বার্থ ইসলাম ত্যাগ করে আবু জাহেল-আবু লাহাবের মত হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতার পথ অবলম্বন করার মাধ্যমেই চরিতার্থ হবে, তাহলে তাও করত। (ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৫২)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা খামেনী হযরত সিদ্দিক আকবর, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান ও অন্যান্য সাহাবা কেরামের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রতি কি ধরনের বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এটা শিয়াদের অন্যতম মূলনীতি "তাবাররা"-এর সাথে তার প্রকাশ্য সমর্থন। শিয়াদের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা খামেনী বলেন-

از مجموعه این ما دیها معلوم شد مخالفت کردن شیخین از قران در حضور مسلمانان یک امر
...... که امر بگوید خدایا جبریل یا پیغمبر در فرستان یا اوردن این ایست اشتباه کردیند مهجور شدند

অর্থাৎ আমি যেসব দৃষ্টান্ত পেশ করেছি এতে 'শেখাইন' (অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার) কোরআনের বিরোধিতা প্রমাণিত হলো। মুসলমানদের (সাহাবা কেরাম) সম্মুখে তাদের এ ধরণের কর্মকান্ড কোন জটিল বিষয় ছিল না। (তখনকার) মুসলমানদের (সাহাবা কেরাম) অবস্থাও ছিল এ রকম,

হয়তো তাদের (হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) দল অন্তর্ভুক্ত। হুকুমত ও ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে তারা অভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পন্ন ছিল। আর যদিও তাঁদের সমর্থক ছিল না, কিন্তু তাদের অবস্থা নিশ্চয়ই এমন ছিল যে, আল্লাহর পয়গাম্বর (হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর কন্যা (হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-এর সাথে দূর্ব্যবহারকারীদের সামনে সত্য বলার সাহস ছিল না। মোটকথা হলো, যদি কোরআন পাকে স্পষ্ট ভাষায় এতদ্‌বিষয়ে (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত সম্পর্কে) বর্ণিত হত, তারপরও তাঁরা (হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) উদ্দেশ্য হাসিল থেকে হাত গুটিয়ে নিত না এবং আল্লাহর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার মসনদ ছাড়ত না। আবু বকর যিনি অধিক ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন, তিনি তো একটি হাদিস বানিয়ে উক্ত বিষয় চূড়ান্ত করে দিতেন। যেমনিভাবে তিনি হযরত ফাতেমাকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য করে দেখিয়েছে। আর ওমরের জন্য এটা কোন অসম্ভব কিছু ছিল না যে, (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ইমামাত ও খেলাফত সম্পর্কিত) আয়াত সম্পর্কে এ বলে উক্ত বিষয়ের সমাধান করে ফেলত যেন, হয়তো আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। অথবা জিব্রাইল বা রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ আয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)। (কাশ্‌ফুল আসরার, কৃতঃ ইমাম খামেনী পৃষ্ঠা ১১৯ ও ১২০, ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব, পৃষ্ঠা ৪৭ ও ৪৮)।

আলোচ্য উদ্ধৃতিতেও খামেনী হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে কোরআনের বিরোধীতাকারী, ক্ষমতালোভী, হাদিস জালকারী, আল্লাহ-রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিব্রাইল আলাইহি সালামের প্রতি ভুল আরোপকারী, ষড়যন্ত্রকারী, রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্নেহের কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার প্রতি অসদাচরণকারী ও অপরাপর সাহাবা কোরামকে তাদের সমর্থক বা সত্য প্রকাশে অসমর্থ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির দাবী করলে তিনি যে হাদিস বর্ণনা করেছিলেন, তা কোরআনের পর বিশুদ্ধ কিতাব সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত- ان معشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة অর্থাৎ আমরা (নবীগণ) সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তা সদকা। (রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি)। এ বিশুদ্ধ হাদিসকে খামেনী হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক জালকৃত বলে মন্তব্য করেছেন।

শিয়াদের অন্যতম ধর্মীয় বিধান "মোতা" বা সাময়িক বিয়ে সম্পর্কে খামেনীর রচিত কিতাব-"তাহরীরুল ওয়াসিলা" নামক কিতাবে প্রায় চার পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করেছেন। এতে তিনি বলেছেন, একেবারে কম সময়ের জন্য "মোতা" বা সাময়িক বিয়ে জায়েয। কিন্তু, তারপরও ঐ সময় নির্দিষ্ট করণ জরুরী (তাহরীরুল ওয়াসিলা ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯০, ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৮৯)।

আলোচ্য উদ্ধৃতির আলোকে প্রমাণিত হলো যে, সুন্নীদের মতে "মোতা" বা সাময়িক বিয়ে সম্পূর্ণভাবে সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম ও যিনার সমতুল্য; কিন্তু খামেনীর মতে বৈধ। শুধু তাই নয় বরং শিয়াদের মতে বড় ধরণের ইবাদাত। শিয়াদের প্রাচীন নির্ভরযোগ্য তাফসীর "মান্‌হাজুচ্ছাদেকীন" নামক কিতাবে একটি হাদিসের উদ্ধৃতি রয়েছে।

من تمتع مرة فدرجته كدرجة الحسين و من تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن و من تمتع ثلاث
مرات فدرجته كدرجة علي و من تمتع اربع مرات فدرجته كدرجتي

অর্থাৎ যে ব্যক্তি একবার সাময়িক বিয়ে করবে, তার মর্যাদা হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অনুরূপ, দু'বার করলে হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মর্যাদা, তিনবার করলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মর্যাদা এবং চারবার করলে তার মর্যাদা আমার (রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মর্যাদার মত। (মানহাজুচ্ছাদেকীন প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৫৬, ইরানী ইনকিলাব পৃষ্ঠা ৬৩)।

হযরত ওসমান যিন্নুরাইন সম্পর্কে খামেনীর জঘন্য মন্তব্য ঃ

ইসলামের তৃতীয় খলীফা, পবিত্র কোরআনের সফল সংকলক, শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে আম্বিয়া কেরামের পর তৃতীয় স্থানে অধিষ্ঠিত হযরত ওসমান যিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং মানব ইতিহাসখ্যাত রাজনীতিবিদ, ওহী লেখক হযরত আমীরুল মো'মেনীন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে অভিশপ্ত ইয়াযিদের সাথে একই কাতারে গণ্য করে আয়াতুল্লাহ খামেনী বলেন-

عقل فالدار و بخلاف كفته عقل هيچ كاري .... وكر بسردم امارت دهد

অর্থাৎ আমরা এমন খোদার উপাসনা করি এবং এমন খোদাকে মানি, যাঁর সকল কর্মকাণ্ড বিবেক-বুদ্ধি ও হিকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এমন খোদাকে মানি না, যিনি খোদার ইবাদত, ন্যায়পরায়নতা ও দ্বীনদারীরর এক সুরম্য আলীশান প্রাসাদ তৈরী করে নিজেই তা ধ্বংস করার চেষ্টা করবেন; যে ইয়াজিদ, মুয়াবিয়া ও ওসমানের মত যালিম ও মন্দ শ্রেণীর লোকদেরকে নেতৃত্ব ও রাজত্ব দান করবেন। (কাশ্‌ফুল আসরার, কৃতঃ ইমাম খামেনী; ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ৬৯)।

এখানে আয়াতুল্লাহ খামেনী হযরত ওসমান ও আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে ইয়াজিদের সাথে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে যালিম ও মন্দ শ্রেণীর লোক হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। তাঁদের হাতে নেতৃত্ব ও হুকুমত দান করা মানে দ্বীনের সুউচ্চ প্রাসাদকে আল্লাহ তা'আলা নিজে তৈরী করে নিজে ধ্বংস করা : যে খোদা এমন যালিম ও খারাপ প্রকৃতির মানুষের হাতে রাজত্ব দেন, খামেনী ঐ খোদাকেও মানেন না। এমনি করে অসংখ্য জঘন্য কটুক্তি আয়াতুল্লাহ খামেনী তার রচিত "আল-হুকুমাতুল ইসলামীয়া" ও "কাশ্‌ফুল আসরার" নামক গ্রন্থ দু'টিতে করেছেন।

আয়াতুল্লাহ্ খামেনীর লিখিত গ্রন্থাদি থেকে তার ধ্যান -ধারণা ও আক্বীদা সংক্ষিপ্তাকারে সে সমস্ত সরল প্রাণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা গেল, যারা ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েম ও খামেনী সম্পর্কে ইরান দূতাবাসের মাধ্যমে এদেশের ইরানপন্থী খামেনী সমর্থকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগীতায় প্রপোগাণ্ডা করছে যে, "আয়াতুল্লা খামেনী শিয়া-সুন্নী মত বিরোধের সমর্থক নন; তিনি ইসলামী ঐক্যের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা, খোলাফা-এ-রাশেদীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সফল রাজনীতিবিদ। সুতরাং, তিনি বিশ্ব মুসলিমের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।' আরো কতো বিশেষণ তার নামে সংযোজিত হয়, তার হিসেব কে রাখে। তার ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছর আলোচনা সভার আয়োজন হয়। কিন্তু খামেনীর বাস্তবরূপ কি, তার রচিত গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতির আলোকে খামেনীর ধ্যান-ধারণা ও আক্বীদা উপস্থাপন করা হয় না এ ভয়ে যে, পাছে যদি থলের বিড়াল বেরিয়ে যায়। মূলতঃ আয়াতুল্লা খামেনী হলেন, একজন "ইসনা আশারী" বা দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী কট্টর শিয়া। এদের সম্পর্কে জগতবরেণ্য ওলামা কেরামের মতামত ও ফতোয়ার কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উপস্থাপন করা গেল-

গাউসে আযম আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

গাউসে আযম আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শিয়া-তাহরীফে কোরআন (কোরআন বিকৃতি), ইসমাতে আইম্মা (ইমামগণ নিষ্পাপ), তাউহীনে মালায়েকা (ফেরেশতাদের অবমাননা) ইত্যাদি বাতিল আক্বীদার কারণে ঈমানের গণ্ডির বাইরে এবং কাফির। এ দল কুফর অবলম্বন করেছে, ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে; আর ঈমানের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে।

তিনি শিয়াদেরকে ইয়াহুদীদের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ, তাদের সাথে ইয়াহুদীদের আক্বীদাগত সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন- (১) ইয়াহুদীদের বিশ্বাস-হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের বংশধর ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইমামত জায়েজ নয়; একইভাবে শিয়ারা বিশ্বাস করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর আওলাদ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইমামত জায়েয হবে না। (২) ইয়াহুদীদের ধারণা- হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশ হতে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত জিহাদ হইবে না; তেমনি শিয়াদের বিশ্বাস- হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম প্রকাশ হওয়া ব্যতীত জিহাদ হবে না। (৩) ইয়াহুদীগণ তারকা উজ্জ্বল হবার পর মাগরিবের নামায আদায় করতো। শিয়াদেরও একই অভ্যাস।
(আকাশের তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে মাগরিবের নামায আদায় এবং রোযার ইফতার করে)। (৪) ইয়াহুদীরা ফজরের নামায আদায় করত কেবলমাত্র সূর্যোদয়ের পূর্বে; শিয়ারাও ঐ নিয়মে আদায় করে। (৫) ইয়াহুদীদের মেয়েরা ইদ্দত পালন করে না; শিয়ারাও ইদ্দত পালন করে না। (৬) ইয়াহুদীদের নিকট তিন তালাক অর্থহীন; শিয়াদেরও একই বিশ্বাস। (৭) ইয়াহুদীগণ তাওরীত কিতাবে বিকৃতি সাধন করেছে; শিয়ারা কোরআনকে বিকৃত বলে বিশ্বাস করে, মূলতঃ তারাই বিকৃত করেছে। (যার দৃষ্টান্ত পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। (৮) ইয়াহুদীগণ হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে শত্রু মনে করে; শিয়ারাও এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম অহী পৌঁছানোর ব্যাপারে ভুলবশতঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পরিবর্তে হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অহী পৌঁছিয়েছে। হযরত গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শিয়াদেরকে ১৬ দলে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে মারাত্মক দল 'কুম শহরে' বসবাস করে বলে উল্লেখ করেছেন। এদের জন্য গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বদ্‌দোয়া করেছেন। উল্লেখ্য যে, ঐ 'কুম শহরের' অধিবাসী হিসেবে খামেনী বা খোমেনী। (গুনিয়াতুত্তালেবীন; শিয়া ধর্ম কৃতঃ শায়খুল হাদিস আল্লামা ফজলুল করিম নকশবন্দি রাহমাতুল্লা আলাইহি, পৃষ্ঠা ৩; শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফ পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭)।

ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ-এ-আল্‌ফেসানী হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ-এ-আল্‌ফেসানী হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শিয়াদের অবস্থা হিন্দুস্থানের হিন্দুদের ন্যায়। তারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে; কিন্তু "কুফর" শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। তারা নিজেদেরকে কখনো কাফির বলতে রাজি নয়। তেমনিভাবে শিয়াগণ নিজেদের জন্য রাফেযী শব্দ ব্যবহার করতেও সম্মত নয়। শিয়া সম্প্রদায় আহলে বায়তে রাসুলকে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার দুশমন মনে করে এবং আহ্‌লে বায়তের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে "তাকীয়া" (যখন যেমন, তখন তেমন)-এর ভিত্তিতে মুনাফিক ও ধোকাবাজ মনে করে। তারা বলে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পূর্বকার তিন খলিফার সাথে মোনাফেকী সুলভ সম্পর্ক ছিল। অর্থাৎ তিনি তাঁদেরকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন না; বরং বাহ্যিকভাবে শ্রদ্ধা দেখাতেন, আর আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। (মাকতুবাত; শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফ পৃষ্ঠা ৫৯-৬০)।

হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি রুহানীভাবে হুযুর করিম সাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তাদের মাযহাব বাতিল। তাদের ভ্রান্তি 'ইমাম' শব্দ থেকে বুঝা যায়। যখন আমি এ রূহানী মোরাকাবা থেকে ফিরে আসি তখন বুঝতে সক্ষম হলাম যে, বাস্তবিক পক্ষে তাদের (শিয়াদের) মতে 'ঐ নিষ্পাপ ব্যক্তি, যাঁর আনুগত্য ফরয এবং যাঁর নিকট বাতেনীভাবে ওহী আসে।' এর দ্বারা নবী আলাইহিমুস সালাম বুঝানোই উদ্দেশ্য; যা দ্বারা খাতামুন্নাবিয়্যীন (শেষ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেই অস্বীকার করা হয়। (দুররুস সামীন কৃতঃ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী; ইসলাম আওর খোমেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৮৬ ও ৮৭)

হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ইসনা আশারী' দ্বাদশ ইমামী শিয়াদের খণ্ডনে 'তোহফা-এ-ইসনা আশারীয়া' নামক একটি কিতাব লিখেছেন। উক্ত কিতাবে তিনি বলেন, শিয়াদের ধোকাবাজির মধ্যে এটিও একটি ধোকা যে, তারা বলে বেড়ায়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক ও হযরত ওসমান যিন্‌নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা কোরআনুল করীম পরিবর্তন করেছেন। তাঁরা এমন অনেক আয়াত ও সুরা বাদ দিয়েছেন যেগুলোতে আহলে বায়েত (হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধর)-এর ফযিলতসমূহ, তাঁদের অনুসরণ করার নির্দেশ, বিরোধীতা না করার আদেশ ও তাঁদেরকে মুহাব্বতের তাকিদ দেয়া হয়েছে। আর ঐসব আয়াত এবং সুরাতে তাদের শত্রুদের নামের বর্ণনা এবং তাদের উপর লা'নত বা অভিশাপের বর্ণনা ছিল। এ কারণে এ বিষয়গুলো তাঁদের (হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের) নিকট বড় অপছন্দ হয়েছে। আহলে বায়তের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ তাদেরকে এ কাজে উৎসাহিত করেছে। যেমন "সুরা আলাম নাশরাহ" থেকে এ আয়াতকে বাদ দিয়েছে- و جعلنا عليا صهرك

অর্থাৎ "আলীকে আমি আপনার জামাতা করেছি।" এতে প্রমাণিত হয় (শিয়াদের মতে) শুধুমাত্র হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুই কেবল হুযুর সাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হয়নি। অনুরূপভাবে "সুরা বেলায়তকে" বাদ দেয়া হয়েছে, যাতে আহলে বায়তের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বিবরণ ছিল। (তোহফায়ে ইসনা আশারীয়া-আরবী অনুবাদ,পৃষ্ঠা ৩০; শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ-পৃষ্ঠা ৬১)। আলোচ্য উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পাক-ভারতের অন্যতম মুহাদ্দিস হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দৃষ্টিতেও শিয়াদের পূর্বোল্লেখিত আক্বীদাসমূহ ভ্রান্ত। সর্বোপরি শিয়াদের ধারণা মতে, পবিত্র কোরআনে সুরা বেলায়াত নামে একটি সুরা ছিল এ বিশ্বাসটুকুও ভ্রান্ত। এগুলো কারো পক্ষ থেকে শিয়াদের উপর অপবাদ নয়।

شبہ نیست کہ فرقہ امامیہ ..... خلافت صدیق اکبر کند منکر اجماع قطعی شد وکافر گشت

অর্থাৎ কোন সন্দেহ নেই যে, শিয়াদের ইমামীয়া ফিরকা (অর্থাৎ সপ্ত বা দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী শিয়া) হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত অস্বীকার করে। ফিকাহ শাস্ত্র মতে, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতকে অস্বীকার করল, সে 'ইজমা ক্বাতয়ী' বা নির্দিষ্ট ঐকমত্যকে অস্বীকার করলো এবং কাফির হয়ে গেল। (ফতোয়া আযিযী পৃষ্ঠা ১৮২)।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাফেযীগণ যদি আমিরুল মো'মেনীন আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শেখাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে, তাহলে-বেদ্‌আতী। (ফতোয়া-এ-খোলাছা, আলমগীরী ইত্যাদি)।

আর যদি তাঁদের দু'জনের বা যে কোন একজনের খেলাফত ও ইমামতকে অস্বীকার করে, তাহলে ফকীহগণ তাদেরকে কাফের বলে অভিহিত করেছেন এবং মুতাকাল্লেমীন বলেছেন, বেদআতী। এটাই সতর্কতামূলক মন্তব্য। আর যদি আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে "বাদা" (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন বিষয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জ্ঞান রাখেন না বরং ঘটে যাবার পরই জানেন) মেনে থাকে অথবা বর্তমান কোরআন শরীফকে অসম্পূর্ণ, সাহাবা বা অন্য কেউ এতে বিকৃতি সাধন করেছে বলে বিশ্বাস করে, আমীরুল মো'মেনীন (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বা আহলে বায়তের কোন ইমামকে আল্লাহ তা'আলার নিকট পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, (যেমন আমাদের শহরের রাফেযী-শিয়া বলে থাকে তাদের এ যুগের মুজতাহিদ তা স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করেছে) তাহলে নিঃসন্দেহে তারা কাফির। তাদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান মুরতাদদের মত। ফতোয়া-এ-মেহরীয়া এর উদ্ধৃতিতে ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে বর্ণিত আছে। (ফাতাওয়াল হারামাইন বেরাজফে নাদওয়াতুল মাইন, মাকতাবা-এ ইশক, তুর্কী। ইমাম আহমদ রেযা আওর রদ্দে শিয়া কৃতঃ আল্লামা আবদুল হাকীম শরফ কাদেরী, পৃষ্ঠা ২১)।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ রেযা ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শিয়াদের সম্পর্কে বিশটি কিতাব লিখেছেন। এগুলোর তালিকা 'ইমাম আহমদ রেযা আওর রদ্দে শিয়া' নামক পুস্তিকার পৃষ্ঠা ১৬-১৮ বর্ণিত আছে।

আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনে হুম্মাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হানাফী মাযহাবের বিশ্ববরেণ্য ইমাম ইবনে হুম্মাম বলেন-

و في الروافض ان من فضل عليا علي الثلاثة فمبتدع و ان انكر خلافة الصديق او عمر رضي الله عنه فهو كافر

অনুবাদ ঃ রাফেযী যদি শেখাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) কে গালি দেয় (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে সে কাফির।

অর্থাৎ শিয়াদের মধ্যে যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পূর্বকার তিনজন খলীফার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, সে বেদআতী। আর যদি হযরত আবু বকর সিদ্দিক বা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার খেলাফতকে (বেধতা) অস্বীকার করে-সে কাফের। (ফত্‌হুল ক্বাদীর প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৪; মাসিক বাইয়্যেনাত পৃষ্ঠা ৮৮, করাচী, পাকিস্তান)।

ফতোয়া-এ-আলমগীরীতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- কাফির হয়ে যাবে মর্মে রায়টি নিঃসন্দেহে সঠিক।

অনুরূপভাবে যেসব শিয়া শে'খাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর ফারক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে গালমন্দ করে তাদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হলো- الرافضي اذا كان يسب الشيخين و يلعنهما و العياذ بالله فهو كافر

অর্থাৎ সেও কাফির। (ফতোয়া-এ-আলমগীরি; মাসিক বাইয়্যেনাত, পৃষ্ঠা ১৫৭, করাচী, পাকিস্তান)।

একইভাবে নিম্নোক্ত কিতাবগুলোতেও অনুরূপ বিধান রয়েছে।

ফতোয়া-এ-বায্‌যামীয়া, বাহরুর রায়েক, খোলাসাতুল ফতোয়া, দুররে মোখতার, রদ্দুল মোহতার ইত্যাদি।

বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ! শিয়া সম্প্রদায়ের ইসনা আশারী কুফরী আক্বীদার কারণে তাদেরকে ইসলামের সুমহান ইমামগণ বেদআতী ও কাফির বলে রায় পেশ করেছেন। অনুরূপ অভিমত পেশ করেছেন, পাক-ভারতের ওলামা কেরাম, দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণও। তাদের মধ্যে মৌং হুসাইন মাহমুদ মদনী, মৌং আসগার হুসাইন, মৌং এ'যায আলী, মুফতি শফী, মৌং শাব্বীর আহমদ ওসমানী, মুফতি আযিযুর রহমান দেওবন্দী, মৌং আমজাদ মাদানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অনুরূপভাবে মোযাহেরুল উলুম চাহারণপুর ইউ,পি, এর ওলামা কেরাম। দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার আলেমগণ। (বিশ্ব ওলামার বিস্তারিত অভিমত জানার জন্য দেখুন-মাসিক বাইয়্যেনাত তৃতীয় সংস্করণ, করাচী, পাকিস্তান)।

ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ খামেনীর লিখনিতেও ঐ কুফরী আক্বীদা উদ্ধৃতি সহকারে পেশ করা হয়েছে। এবার আপনারাই বলুন-খামেনী কি মুসলিম বিশ্বের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, ইরান কি ইসলামী রাষ্ট্র না শিয়া রাষ্ট্র! ইরানে কি কোরআন-সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠিত, না-শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। খামেনী নিজেদের অদৃশ্য ইমাম "মাহদী মুন্‌তাযার" এর জন্মানুষ্ঠান উপলক্ষে এক ভাষণে (১৫ শাবান ১৪০০ হিজরী) বলেন, বুকে হাত দিয়ে শুনুন এবং নিজ ঈমানের আলোকে বিচার করুন।

و لقد جاء الانبياء من اجل ارساء قواعد العدالة في العالم لكنهم لم ينجحوا حتي النبي محمد خاتم الانبياء الذي جاء لاصلاح البشرية و تنفيذ العدالة و تربية البشر لم ينجح في ذلك و ان الشخص الذي سينجح في ذلك و يرسي قواعد العدالة في جميع انحاء العالم في جميع مراتب الانسانية للانسان و تقويم الخرافات هو المهدي المنتظر

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সকল নবী আলাইহিমুস সালাম পৃথিবীতে ন্যায়ের মৌলিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। কিন্তু, তাঁরা সফল হননি, এমনকি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম. পর্যন্ত। যিনি মানবতার সংশোধন, ন্যায় প্রচলন ও মানব প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন; তিনি এতে সফল হননি। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে সফলকাম হবেন, যিনি সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের জন্য মানবতার সর্বস্তরে ন্যায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করবেন এবং বিশ্বব্যাপী সকল বক্রতা ও অন্যায়কে পরিশুদ্ধ করবেন, তিনি হলেন-মাহদী মুন্‌তাযার। (এ ভাষণ তেহরান বেতার হতে প্রচারিত হয় এবং ২১/৬/৯০ ইং কুয়েতে "আর্‌রাইউল আলম" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৩৭৭ ও ৩৭৮)

উল্লেখ্য যে, "ইসনা আশারী" বা দ্বাদশ ইমামীদের মতে, তাদের দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ আল্ মুনতাযার আল মাহদী ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'সুর্‌রা মান্‌রাআ' পাহাড়ে মূল কোরআন নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান এবং পুনরায় মাহ্‌দী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। আর সমগ্র পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় চূড়ান্তভাবে সফল হবেন। (ইরানী ইনকিলাব পৃষ্ঠা ২৯)। ঐ মুহাম্মদ আল মুন্‌তাযার এর জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে খামেনী উপরোক্ত মন্তব্য করে সকল নবী আলাইহিমুস সালাম বিশেষতঃ আমাদের মহান রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুবিশাল মর্যাদার অবমাননা করলেন।

প্রিয় পাঠক মণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের পূর্ণতা সম্পর্কে এরশাদ করেন- اليوم اكملت لكم دينكم

অর্থাৎ আজ তোমাদের দ্বীন (ইসলামকে) পরিপূর্ণ করে দিলাম। অথচ খামেনীর দৃষ্টিতে নবী আলাইহিমুস সালামগণ ন্যায় ও মানবতা প্রতিষ্ঠায় সফল হননি। এবার কি আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা বিশ্বাস করবেন, না খামেনীর মন্তব্যে আস্থা স্থাপন করবেন ? এ বিচার আপনাদের হাতে ছেড়ে দিলাম।

শিয়াদের দ্বাদশ ইমামের তালিকা

(১) হযরত আলী (২) হযরত ইমাম হাসান (৩) হযরত ইমাম হোসাইন (৪) ইমাম যায়নুল আবেদীন (৫) ইমাম মুহাম্মদ বাক্বির (৬) ইমাম জাফর সাদিক (৭) ইমাম মুসা কাযিম (৮) ইমাম আলী রযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম (৯) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী তুর্কী (১০) ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মদ নকী (১১) ইমাম হাসান আসকারী ও (১২) ইমাম মুহাম্মদ আল মুনতাযীর আল মাহদী। ইনিই হলেন শিয়াদের মতে "ইমাম-এ-গায়েব" বা অদৃশ্য ইমাম, তিনিই ইমাম মাহদী। সুন্নী মুসলমানদের ইমাম মাহদী আর এ মাহদী এক নয়।

বিশ্ব ওলামার দৃষ্টিতে আয়াতুল্লা খামেনী দ্বাদশ ইমামী কট্ট'র শিয়া। সুতরাং বাংলাদেশের মত সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে এ কট্টর শিয়াকে নিয়ে এতো আয়োজনের পেছনে এ দেশের সরলপ্রাণ সুন্নী মুসলমানদেরকে ক্রমান্বয়ে শিয়া বানানোর কোন গভীর ষড়যন্ত্র আছে কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

মওদুদী-খামেনী গভীর সম্পর্ক

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মৌং আবুল আ'লা মওদুদী ও ইরানের শিয়া ইমাম আয়াতুল্লা খামেনীর মধ্যে মহান রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী ও সাহাবা কেরামের সমালোচনা করাসহ উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এরই ভিত্তিতে উভয়ের সম্পর্কও ছিল বেশ গভীর।

মওদুদীর মৃত্যুতে পাকিস্তানের সাপ্তাহিক পত্রিকা "শিয়া" ৮ই অক্টোবর ১৯৭৯ সন এক শোক বার্তায় তার শিয়া সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়, 'মরহুম মওদুদী নিজের বিশেষ আক্বীদা পোষণ করা সত্ত্বেও তিনি একজন সর্বজন সমঝোতা মনোভাবে মানুষ ছিলেন। সত্য কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁর লিখিত খিলাফত ও মুলুকিয়াত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

ইরানের শাহ্'র পতন হলে আয়াতুল্লা খামেনীকে অভিনন্দন জানিয়ে মওদুদী একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন। (সাপ্তাহিক শিয়া, লাহেরা, ১-৮ অক্টোবর ১৯৭৯ সন)। অতঃপর খামেনীর পক্ষ থেকেও প্রতিনিধি দল মওদুদীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে করাচী আসে। বিমান বন্দরে জামাতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ তাদেরকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং শ্লোগান দেয় 'খামেনী আওর মওদুদী হামারা রাহনুমা হ্যায়।'

অর্থাৎ খামেনী ও মওদুদী আমাদের নেতা। 'মওদুদী খামেনী ভাই ভাই'। শিয়া-সুন্নীর মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। আমাদের নেতা খামেনী আমাদের নেতা খামেনী। (জামাতী অর্গান সাপ্তাহিক এশিয়া ১৯৭৯, ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব পৃষ্ঠা ৩৯৯-৪০১।)

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর সাথে এ গভীর সম্পর্কের কারণেই জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের অনুসারীগণ খামেনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

প্রেসিডেন্ট রফসানজানী বাংলাদেশ সফরে আসলে তাঁকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেয়া হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইরানী নিউজ লেটার সরবরাহে জামাতের কর্মীরা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে থাকে।

শিয়া-সুন্নীর মধ্যে কি পার্থক্য তা উপরে আলোচিত হয়েছে। শিয়া-সুন্নীর মধ্যে মূলতঃ ঈমান ও কুফরের পার্থক্য। এতদসত্ত্বেও এসব জঘন্য ভ্রান্তকে ধামাচাপা দিয়ে "শিয়া সুন্নী ভাই ভাই" শ্লোগান দিচ্ছে মওদুদীর দোসরগণ। এ সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে এদেশের সুন্নী মুসলমানদের সতর্ক থাকা উচিত। আশা করি, শিয়া সম্প্রদায় ইমাম খামেনী ও বর্তমান ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে আলোচিত তথ্যাবলী সত্য উদঘাটনের মনোভাব নিয়ে যাচাই করে নিজ ঈমান-আক্বীদা রক্ষায় সচেষ্ট হবেন।

শিয়া সম্প্রদায় ও আয়াতুল্লাহ খামেনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন

১। শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফ (উর্দু), শিয়া-সুন্নী বিরোধ (বাংলা) ঃ মৌং ওবাইদুল হক জালালাবাদী।
২। ইসলাম আওর খামেনী মাযহাব ঃ মৌং বদর আলকাদেরী।
৩। তারীখে মাযহাবে শিয়া ঃ মৌং আব্দুস শুকুর লখনবী।
৪। শিয়া ও মওদুদী মতবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ আবু মাকনুন।
৫। ইরানী ইনকিলাব ঃ মৌং মানযুর নোমানী।
৬। মাসিক বাইয়্যেনাত, তৃতীয় সংস্করণ, করাচী।
৭। ইমাম আহমদ রেজা আওর রদ্দে শিয়া ঃ মৌং আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী।

৭২ ফেরকা পরিচয়

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্*

প্রতিপাদ্যসার

[মুসলমানের আল্লাহ এক, রসূল এক, কিতাব এক, সহীহ হাদীস গ্রন্থ নিয়ে তেমন বড় পার্থক্য না থাকলেও মুসলমানে মুসলমানে এত ফেরকাবাজি কেন? সুন্নী, শীআ, খারেজী, রাফেজী, মুতাযেলাসহ অসংখ্য ফেরকায় মুসলমানরা বিভক্ত কেন? আবার সবাই নিজেদেরকে সত্য পথের অনুসারী মনে করে, অথচ নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ফেরকা জান্নাতী, বাকী ৭২ ফেরকাই জাহান্নামী। যারা আমি এবং আমার সাহাবীদের মতে পথে থাকবে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী এবং তারাই নাজি (মুক্তিলাভকারী), আর যারা এ পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হবে তারা জাহান্নামী। এ প্রবন্ধে বিপথগামী সেই ৭২ ফেরকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।]

মানব সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে জ্বীন জাতির আবাস ছিল। ইবলিস শয়তান জ্বীন জাতির অন্তর্ভূক্ত হলেও অধিক ইবাদতের কারণে আল্লাহ তালা তাকে ফেরেস্তাদের সর্দার বানিয়ে দেন। সে আজাজিল[১] ফিরিস্তা হিসেবে পরিচিত হয়। অধিক ইবাদত ও ফিরিস্তাদের সর্দার হওয়ার পরেও আল্লাহর আদেশের উপর নিঃশর্ত আত্মসমর্পন না করে উপরন্তু যুক্তি প্রদর্শন করায় আল্লাহ তা'লা তাকে বহিস্কার করে বলেন[২] - فاخرج فانك رجيم "আমার সান্যিধ্য হতে বের হও, নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত।" যুগে যুগে যারাই আল্লাহর নির্দেশের উপর শয়তানের ন্যায় যুক্তি উপস্থাপন করেছে, তারাই সেই ইবলিশ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করেছে। শয়তানের ন্যায় তারাও নবী রসূলের আদেশ নিষেধ আমল না করে দাম্ভিকতার সাথে বলেছে-[৩] ابشر يهدوننا "কোন সাধারণ মানুষই কি আমাদেরকে হেদায়ত করবে ?"

তাই আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোরআন মজিদে ইবলিস শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করার জন্য বারবার তাগিদ দিয়েছেন[৪]- و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

الملل و النحل গ্রন্থের প্রণেতা প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী শাহরাস্তানি[৫] বলেন- ইসলাম ধর্মে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নবী করিম (দ.) এর সাথে বিরোধ করে যুক্তি দিয়ে রসুলের বাণীর বিরোধিতা করে পথভ্রষ্ট হয়েছে তার নাম ذو الخويصرة (জুল খুয়াইছেরা)[৬]। তার সম্পর্কে নবী করিম (দ.) এরশাদ করেছেন, এই ব্যক্তির ঔরশ হতে আমার উম্মতের মধ্যে বাতিল ফেরকার উৎপত্তি হবে।

নবী করিম (দ.) এর যে হাদীসটিতে বাতিল ফেরকার বর্ণনা এসেছে সে হাদীসটি ইমাম তিরমীজি তার সুনন গ্রন্থের باب افتراق هذه الامة অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন আর ইমাম আবু দাউদ তার সুনান গ্রন্থের باب شرح السنة অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজী দু'টি বর্ণনা সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। প্রথম বর্ণনাটি হযরত আবু হুরায়রার (রা.) সূত্রে বর্ণিত- عن ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال تفرقت اليهود علي احدي و سبعين فرقة او اثنين و سبعين فرقة و النصاري مثل ذلك و تفترق امتي علي ثلاث و سبعين فرقة

অর্থাৎ নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেন, ইহুদীরা ৭১ বা ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল, অনুরূপ নাসারারাও। কিন্তু আমার উম্মতরা তার উপর ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত-

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم سياتي علي امتي ما اتي علي بني اسرائل حذو النعل بالنعل حتي ان كان منهم من اتي امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك و ان بني اسرائل تفرقت علي ثنتين و سبعين ملة و تفترق امتي علي ثلاث و سبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله صلي الله عليه و سلم قال ما انا عليه و اصحابي

অর্থাৎ নবী করিম (দ.) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের উপর বনী ইসরাইলের ন্যায় কাল অতিবাহিত হবে, যেমন জোড়া জুতার একটি অন্যের সাথে (সাদৃশ্য হয়)। এমন কি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, আমার উম্মতেও এমন কেউ হবে যে, অনুরূপ কাজ করবে। বনী ইসরাঈল ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে, আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। তাদের এক দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামী। সাহাবায়ে কেরামগণ প্রশ্ন করলেন, তারা কারা ওহে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাহাবীরা যে রাস্তায় আছি সেটাই মুক্তির পথ।

সুনানে আবু দাউদ শরীফে হযরত মুয়াবীয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীসে সরাসরি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতই একমাত্র জান্নাতী ও বাকী শাখা প্রশাখা সকলই জাহান্নামী বলে অবহিত করা হয়েছে।

---

* পি এইচ ডি গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

عن معاوية بن ابي سفيان انه قام فقال الا ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قام فينا فقال الا ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا علي ثنتين و سبعين ملة و ان هذه الملة ستفترق علي ثلاث و سبعين ثنتان و سبعون في النار و واحد في الجنة و هي الجماعة

অর্থাৎ নবী করিম (দঃ) আমাদের সামনে এ খুতবা দিয়েছিলেন যে, সতর্ক হও! তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবরা ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। আর আমার এ উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। ৭২ ফেরকা জাহান্নামী, এক ফেরকাই জান্নাতী। আর তারা হল- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

ইমাম তিরমীজি বলেন- এ হাদীসটি অনেক সাহাবীর বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হযরত সাদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও আউফ ইবনে মালিক (রাঃ) সহ অসংখ্য সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমীজি বলেন, এটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ হাদীস। উক্ত বিশুদ্ধ হাদীসের সূত্র ধরে যুগে যুগে ইমামগণ ৭৩ ফেরকার পরিচয় নিয়ে তাদের স্ব স্ব কিতাবে আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আবুল হাসান আশয়ারীর (مقالات الاسلاميين) আবদুল কাহির বাগদাদীর (الفرق بين الفرق) ইবনে হাজম জাহেরীর (الفصل في الملل و النحل) ও শাহরাস্তানির الملل و النحل প্রনিধান যোগ্য।

এছাড়া ইমাম আবদুল কাদীর জিলানী গুনিয়াতে এবং ইমাম ইবনে জাওযী তার বিখ্যাত تلبيس ابليس গ্রন্থে ৭৩ ফেরকা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

غنية الطالبين গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে ৭৩ ফেরকার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমত ১০ ভাগে বিভক্ত করে তার শাখা- প্রশাখা সহ সর্বমোট ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত দেখিয়েছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত	-	১টি দল
খারেজী	-	১৫টি দল
মোতাযেলা	-	৬টি দল
মুরজিয়া	-	১২টি দল
শী'আ	-	৩২টি দল
জহিমা	-	১টি দল
নাজারিয়া	-	১টি দল
জবারিয়া	-	১টি দল
কালাবিয়া	-	১টি দল
মোশাবিয়া	-	৩টি দল
সর্বমোট	-	৭৩ শ্রেণী

ইবনে জাওযী তার তলবীসে ইবলিসে বলেছেন- আমরা জানি, ৭২ ফেরকাদের যারা সত্যপথ হতে বিচ্যুত হয়ে জাহান্নামী হয়েছে। ৭২ ফেরকা প্রথমে ৬ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ফেরকা আবার ১২ ফেরকায় বিভক্ত।

হারোরিয়া বা খারেজী	-	১২ শ্রেণী
কদরিয়া	-	১২ শ্রেণী
জহমিয়া	-	১২ শ্রেণী
মুরজিয়া	-	১২ শ্রেণী
রাফেজী	-	১২ শ্রেণী
জবরিয়া	-	১২ শ্রেণী
সর্বমোট	-	৭২ শ্রেণী

খারেজী[৭] বা হারোরিয়া ঃ হারেরিয়া এর ১২ ফেরকা নিম্নরূপ ঃ

١ـ الازرقية ٢ـ الاباضية ٣ـ الثعلبية ٤ـ النجازمية ٥ـ الخلفية ٦ـ المكرمية ٧ـ الكنزية ٨ـ الشمراخية ٩ـ الاخنسية ١٠ـ المحكمية ١١ـ المعتزلة من الحروية ١٢ـ المبمونية

কদরিয়া[৮] ঃ কদরিয়ার ১২ ফেরকা নিম্নরূপ ঃ

١ـ الاحمرية ٢ـ الثنوية ٣ـ المعتزلة ٤ـ الكيسانية ٥ـ الشيطانية ٦ـ الشريكية ٧ـ الوهمية ٨ـ الرواندية ٩ـ البترية ١٠ـ الناكثية ١١ـ القاسطية ١٢ـ النظامية

জহমিয়া[৯] ঃ জহমিয়ার ১২ ফেরকা নিম্নরূপ ঃ

١ـ المعطلة ٢ـ المريسية ٣ـ الملتزمة ٤ـ الواردية ٥ـ الزنادقة ٦ـ الحرقية ٧ـ المخلوقية ٨ـ الفانية ٩ـ المغيرية ١٠ـ الواقفية ١١ـ القبرية ١٢ـ اللفظية

মুরজিয়া[১০] ঃ মুরজিয়ার ১২ ফেরকা নিম্নরূপ ঃ

١ـ التاركية ٢ـ السائبية ٣ـ الراجية ٤ـ الشاكية ٥ـ البيهسية ٦ـ المنقوصية ٧ـ المستثنية ٨ـ المشبهة ٩ـ الحشوية ١٠ـ الظاهرية ١٢ـ البدعية

রাফেজী[১১] ঃ রাফেজীর ১২ ফেরকা নিম্নরূপ ঃ

١ـ العلوية ٢ـ الامرية ٣ـ الشيعة ٤ـ الاسحاقية ٥ـ الناروسية ٦ـ الامامية ٧ـ اليزيدية ٨ـ العباسية ٩ـ الرجعية ١٠ـ اللاعنية ١١ـ المتناسخة ١٢ـ المتربصة

জবরিয়া[১২] ঃ জবরিয়ার ১২ ফেরকা নিম্নরূপ ঃ

١ـ المضطربة ٢ـ الافعالية ٣ـ المفروغية ٤ـ النجارية ٥ـ المتانية ٦ـ الكسبية ٧ـ السابقية ٨ـ الحبية ٩ـ الخوفية ١٠ـ الفكرية ١١ـ الخسية ١٢ـ المعية

ইমাম শাহরাস্তানি তার প্রসিদ্ধ কিতাব الملل و النحل গ্রন্থে ৭২ ফেরকার পরিচয় দিয়ে বলেন, পথভ্রষ্ট দলগুলি প্রধানত ৪ ভাগে বিভক্ত। এক. কদরিয়া, দুই. সেফাতিয়া, তিন. খারেজী, চার. শীআ। আবার এদের শাখা প্রশাখা সহ সর্বমোট ৭২ ফেরকা হয়।

ইমাম শাহরাস্তানি তার কিতাবে ৭২ ফেরকার অধিকাংশ ফেরকার আকিদা ও প্রবক্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

যে সমস্ত উসুলের উপর ভিত্তি করে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, ইমাম শাহরাস্তানি তা চারটি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনে সীমাবদ্ধ করেছেন।

১. আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ে (الصفات و التوحيد فيها) ঃ একদল মনে করে যে, আল্লাহর আজলি গুণাবলী আছে। আবার অন্য দল এর বিরোধিতা করে বলে যে, আল্লাহর কোন আজলি গুণাবলী নেই। এ বিষয়ে আশয়ারী, কেরামিয়া, মুজাচ্ছেমা ও মুতাযিলাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

২. তকদির বিষয়ে (القدر و العدل فيه)ঃ এ মূলনীতি-আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা, তকদীর, কাজ করার ক্ষমতা, অক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়কে শামিল করে। এ বিষয়ে কদরিয়া, নজ্জারিয়া, জবরিয়া, আশয়ারীয়া ও কেরামিয়ার মধ্যে মতভেদ আছে।

৩. পূণ্যের প্রতিফল ও অপূণ্যের শাস্তি (الوعد و الوعيد) ঃ এ মূল নীতি ঈমান, তাওবা, কুফর, তদলীল ইত্যাদি বিষয়কে শামিল করে। এ সব বিষয়ে মতবিরোধ আছে মুরজিয়া, মুতাযিলা, আশারীয়া ও কেরামিয়াদের মধ্যে।

৪. ইমামত ও রেসালত বিষয়ে (الرسالة و الامامة) ঃ এ মূলনীতি ভাল-মন্দ, ইসমতে আম্বিয়া ও ইমামতের শর্তসমূহকে শামিল করে। এ সব বিষয়ে মতবিরোধ আছে শী'আ, খারেজী, মুতাযিলা, কেরামিয়া ও আশায়ারীয়াদের মধ্যে।

ছোট খাটো আরো অনেক নিয়ম-কানুনের কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার উদ্ভব হয়। উলামায়ে কেরামগণ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি হতে ফেরকা সমূহকে কেউ প্রথমে ১০ ভাগে, কেউ ৬ ভাগে আবার কেউ কেউ ৪ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এখন আমরা উক্ত ফেরকা সমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ কিছু ফেরকার উৎপত্তি আক্বীদা ও তাদের উপদল নিয়ে আলোচনা করব।

শী'আ ও শী'আদের আত্মপ্রকাশ ঃ

শী'আরা হলো ইসলামের সবচে প্রাচীনতম দল। এ রাজনৈতিক দলটি হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষদিকে আত্মপ্রকাশ করে এবং হযরত আলী (রা.)- এর খিলাফতকালে উন্নতির শিখরে পৌঁছে। হযরত আলী (রা.) যখন জনগণের সাথে মেলামেশা করতেন, তখন তাঁর স্বকীয় যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা এবং দ্বীনি বৈশিষ্ট্য দেখে তারা চমৎকৃত হতো। শী'আ মতাদর্শ প্রচারকরা হযরত আলীর প্রতি জনগণের এ ভক্তি-শ্রদ্ধা অবলম্বন করে ফায়দা উঠায় এবং লোকদের মাঝে তাদের মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। যখন উমাইয়া যুগ এল এবং হযরত আলী (রা.)-এর ভক্তজন ও বংশধরগণ উমাইয়াদের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হলো, তখন ভালবাসার এই সুপ্ত অনুভূতি সাধারণের দৃষ্টিগোচরে আসতে শুরু করে। জনগণ চাক্ষুষ দেখতে পেল যে, হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর সন্তানেরা নির্যাতনের টার্গেটে পরিণত হয়েছেন। এমনিভাবেই শী'আ মতাদর্শের দিগন্ত প্রশস্ত হল এবং তাদের সাহায্যকারী ও শুভাকাঙ্খির সংখ্যা বেড়ে গেল।

শী'আদের আকীদা ঃ

শী'আদের মৌল আকীদা এই যে, "ইমামত জনগণের মতামতের কোন বিষয় নয় যে, তা উম্মতে মুসলিমার হাতে সোপর্দ করা যেতে পারে এবং তা জনগণের রায়ে মনোনীত হতে পারে। বরং তা হলো দ্বীনের একটি স্তম্ভ, ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়। কোন নবীর জন্য এতে নির্লিপ্ততা ও উম্মতের উপর ছেড়ে দেয়া জায়িয নয়, বরং তাঁর উপর ওয়াজিব জনগণের জন্য ইমাম মনোনীত করা এবং এমন ইমামকে সাগীরা ও কাবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক।"[১৩]

শী'আদের মতে হযরত আলী (রা.) নবী করীম (সা.) এর পছন্দনীয় খলীফা এবং সাহাবা কিরামের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব। জানা যায় যে, হযরত আলী (রা.) এর সর্বোত্তম সাহাবী হওয়ার আকীদায় কোন শী'আর দ্বিমত নেই। এমন কি তারা মনে করে, কতিপয় সাহাবীও এ মতের পক্ষে রয়েছেন। যেমন আম্মার ইব্ন ইয়াসির, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ, আবূ যার গিফারী, উবাই ইব্ন কা'ব, হুযায়ফা, বুরায়দা, আবূ আইউব, সাহল ইব্ন হুনায়ফ, উসমান ইব্ন হুনায়ফ, আবূ হায়সাম, খুযায়মা ইব্ন সাবিত, আবূত্ তুফায়ল আমির ইব্ন ওয়াসিলা, আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব এবং তাঁর পুত্র, সকল বনু হাশিম (রা.) সকলেই হযরত আলী (রা.)-এর সর্বোত্তমতার আকীদা পোষণ করতেন।[১৪] তাদের ধারণা ছিল- প্রথমদিকে হযরত যুবায়রও (রা.) এ ধারণা পোষণ করতেন। পরবর্তীতে তিনি এ মত পরিহার করেন। বনু উমাইয়াদের কতিপয় ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) এর শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন ঃ খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস এবং উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.)।

শী'আরা ছিল বিভিন্ন পর্যায়ের। কতিপয় হযরত আলী মুরতাযা (রা.) এর সম্মানে খুবই বাড়াবাড়ি করত। কতেক ছিল ইনসাফ পছন্দ। শেষোক্ত আকাদায় বিশ্বাসী শী'আরা হযরত আলী (রা.)কে সকল সাহাবা কিরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, তবে কাউকে কাফির বলতেন না। ইবনুল হাদীদ ইনসাফ পছন্দ শী'আদের আকীদা বিবৃত করে লিখেছেন যে, তিনিও স্বয়ং তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেছেন ঃ ইনসাফ-পসন্দ শী'আরাই হলো মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম। কেননা তারা সত্য পথের অনুগামী। তাদের ধারণা হলো, হযরত আলী পরকালে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবেন এবং জান্নাতে তাঁর মর্যাদা হবে সবার উর্ধ্বে। তিনি দুনিয়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং অসংখ্য গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দুশমনরা আল্লাহ্র দুশমন এবং কাফির ও মুনাফিক গোষ্ঠীর ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তবে হ্যাঁ, যদি সে তাওবা করে, তার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষণ করে মারা যায়।[১৫]

মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং যাঁরা হযরত আলী (রা.) এর পূর্বে ইসলামের আমানতের উত্তরাধিকারী হয়েছেন, যদি তাঁরা হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতের অস্বীকার করেন এবং তাঁর কার্যকলাপের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকেন, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠিয়ে থাকেন অথবা কমপক্ষে তার প্রতি আহ্বান জানিয়ে থাকেন, তবে আমরা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মনে করছি এবং আমরা মনে করছি যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কোপানলে ও অভিশাপে পড়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বলেছেন ঃ"حربك حربي و سلمك سلمي তোমার সাথে যুদ্ধ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং তোমার দেয়া নিরাপত্তা আমারই নিরাপত্তা"। اللهم وال من والاه و عاد من عاداه হে আল্লাহ্! আলীর বন্ধুকে বন্ধু এবং তার দুশমনকে দুশমন মনে কর। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে অবগত যে, হযরত আলী (রা.) তাঁর পূর্বসূরী খলীফাগণকে পছন্দ করতেন, তাঁদের হাতে বায়'আত করেছেন, তাঁদের ইমামতে নামায পড়েছেন, তাঁদের কারো নিকট তাঁর কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন এবং তাঁদের প্রদত্ত যুদ্ধলব্দ সম্পদ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করেছেন। সুতরাং আমাদের কোন অধিকার নেই যে, আমরা তাঁর অনুসৃত নীতির বরখেলাফ করি এবং তাঁর সর্বজনমান্য স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ কার্যাবলী অস্বীকার করি। দেখুন! যখন তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা.)-এর ওপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, আমরা এতে অসন্তুষ্ট হয়েছি। যখন তিনি তাঁর প্রতি অভিশাপ দেন, আমরা দিয়েছি। যখন তিনি সিরিয়াবাসী ও ওখানে অবস্থানকারী সাহাবা যেমন আমর ইব্ন আ'স এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্কে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করলেন, তখন আমরাও তাঁর অনুসরণ করলাম।

সারকথা এই যে, আমরা হযরত আলী (রা.) কে নবী করীম (সা.) এর সাথে নবুওয়াতের মর্যাদায় শরীক করতে চাই না। তবে এ ছাড়া অপর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বে শরীক করি যা তাঁর এবং হযরত আলী (রা.) এর মধ্যে সমভাবে পাওয়া যায়। যে সব বড় বড় সাহাবা (রা.) এর ওপর তিনি কোন প্রকার সমালোচনা করেছেন বলে বর্ণিত হয় নাই, আমরাও তাঁদের কোনরূপ সমালোচনা পরিহার করছি এবং সে ধরনের ব্যবহার করছি, যা তিনি বলেছেন।

গোঁড়া শী'আদের জঘন্য আক্বীদা

গোঁড়া ও পক্ষপাতদুষ্ট শী'আরা হযরত আলী (রা.) কে নবুয়তের মর্যাদায় আসীন করেছে। তাদের কতেক ধারণা করে যে, নবুওয়াত মূলত হযরত আলী (রা.) এর প্রাপ্য ছিল। হযরত জিব্রাঈল (আ.) ভুল করে নবী করীম (সা.) এর নিকট চলে যান। তাদের কতেক হযরত আলী (রা.) কে 'ইলাহ' (মাবূদ) এ আকীদা পোষণ করে। তাদের কতেকের ধারণা যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আলী (রা.) ও তাঁর সন্তানদের মাঝে অবতরণ করেছেন। এ কথা খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন। কেননা তাদের মতে মহান আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ.) এর মাঝে মিশে দুনিয়াতে এসেছেন। কতেক শী'আ এ আক্বীদাও রাখে যে, প্রত্যেক ইমামের আত্মার সাথে আল্লাহ্ মিশে গেছেন। পরবর্তীতে আগমনকারী ইমামের

প্রতি তা হতে থাকবে। অধিকাংশ শী'আ ইমামিয়্যা এ ধর্মীয় বিশ্বাস রাখে যে, তাদের ধর্তব্য সর্বশেষ ইমাম মারা যান নাই, বরং তিনি জীবিত অবস্থায় আহার গ্রহণ করছেন। আর তিনি পুনরায় আগমন করে দুনিয়াকে আদল ও ইনসাফে পূর্ণ করে দিবেন। যেমনি তা পূর্বে অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ হয়েছিল।

শী'আদের একদল বলে যে, হযরত আলী (রা.) মরেন নাই, তিনি জীবিত আছেন। এদেরকে 'সাবায়ীয়া' বলা হয়ে থাকে। আরেক দলের ধারণা, মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যা 'রিযভী' নামক স্থানে জীবিত অবস্থান করছেন। তাঁর নিকট পানি ও মধু মওজুদ আছে।

কতেক শী'আ বলে যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়দ শুলে চড়েননি আর না তিনি নিহত হয়েছেন। বরং তিনি জীবিতাবস্থায় আহার বিহার করছেন।

ইস্না আশারিয়া গোষ্ঠি আকীদা রাখে যে, তাদের ১২তম ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আসকারী, যাঁকে তারা মাহদী বলছে, তিনি 'হাল্লা' নামক স্থানে মাটির নিচে তৈরি কুঠরীতে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর মায়ের সাথে বন্দী অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তিনি শেষ যামানায় বের হবেন এবং দুনিয়াকে আদল ও ইনসাফে পূর্ণ করে দেবেন। তাঁরা তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর তারা মাগরিব নামাযের পর প্রতি রাতে মাটির নিচের সে কুঠরীর দরজায় অপেক্ষায় থাকে। তারা সাওয়ারীতে আরোহণ করে আসে এবং রাতের নক্ষত্র উদয় পর্যন্ত তাঁর নাম নিয়ে বের হয়ে আসার জন্য ডাকতে থাকে। তারপর তারা ছত্রভংগ হয়ে চলে যায় এবং এ কাজ পরবর্তী রাত পর্যন্ত মূলতবী করে।

কতেক শী'আর আকীদা হলো, তাদের মৃত ইমাম পুনরায় জীবিত হয়ে দুনিয়াতে আসবেন। তারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফ, উযায়র (আ.) এর ঘটনা এবং নিহত বনী ইসরাঈল যার গায়ে যবেহকৃত গাভীর হাঁড় লাগানোর পর জীবিত হয়েছিল, তদ্বারা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার দলীল পেশ করে।[১৬]

কতিপয় শী'আ উপরোক্ত আকীদাসমূহের পাশাপাশি মারাত্মক ধরনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও পোষণ করে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবতার স্থায়িত্বের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক এবং ঈমান ও ইসলাম সমূলে উৎপাটনকারী। তারা মদ্যপান, মৃত জীবজন্তু, মুহররিমদের বিবাহকে বৈধ মনে করে এবং দলীল হিসেবে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত উপস্থাপন করে ঃ

ليس علي الذين امنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا و امنوا و عملوا الصالحات

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের কোন অপরাধ নেই, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে.....। (সূরা মায়িদা ঃ ৯৩)

তারা মনে করে যে, পবিত্র কুরআনে যেখানে যেখানে মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের মাংস হারাম হওয়ার বর্ণনা আছে, তদ্বারা মর্ম সে সব লোক, যাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা জরুরী। যেমন- হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান এবং মু'আবিয়া (রা.) (নাউযূবিল্লাহ্) এবং পবিত্র কুরআনে যেখানে উত্তরাধিকারের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে, এর মর্ম 'আহলে বায়ত' যাঁদেরকে ভালবাসা অতীব জরুরী। যেমন ঃ হযরত আলী, হাসান, হুসাইন (রা.) এবং তাঁদের সন্তানগণ।[১৭]

শী'আদের বিভিন্ন উপদল

শী'আরা প্রধানত নিম্নোক্ত উপদলে বিভক্ত ঃ

সাবইয়্যাহ্ (সাবা ইয়াহুদীর অনুরাগী)। কায়সানিয়্যাহ (মুখ্তার ইব্ন উবায়দ সাকাফীর শিষ্য)- এরা অবতারবাদ, ইমামের পুনঃ আগমন, বাদায়া-এ বিশ্বাসী। যায়দিয়্যা-এর অনেকটা আহলে সুন্নাতের কাছাকাছি। আকীদার দিক থেকে বাড়াবাড়ি নেই। ইমামিয়্যাহ্, ইস্না-আশারিয়্যাহ ও ইসমাঈলিয়্যাহ ইত্যাদি।[১৮]

খারিজী

খারিজী দল স্বীয় আকীদা, চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার সংরক্ষণ ও সহযোগিতা এবং তার প্রচার ও প্রসারে বাতিল ইসলামী দলগুলোর মধ্যে কঠোরতর, নির্দয় ও আপোসহীন ছিল। তারা তাদের চিন্তাধারা ও মতবাদকে কয়েকটি শব্দের বাহ্যিক দিককে পবিত্র দ্বীনের (ধর্মের) মর্যাদায় বসিয়ে তাতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। অথচ অবস্থা এই ছিল যে, কোন ঈমানদারের পক্ষে তাদের উপস্থাপিত এ মতাদর্শ অস্বীকার করার উপায় ছিল না। আর বিরোধিতা সে ব্যক্তিই করতে পারত যে নিজেকে অপবাদের প্রতি আসক্ত এবং কুফরী ও গুনাহের পথে পরিচালনায় আগ্রহী ছিল।

لا حكم الا لله শব্দাবলীতে সর্বদাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আবদ্ধ থাকত। এই ছিল তাদের ধর্ম। যদ্বারা তারা তাদের বিরোধীদের জব্দ করত এবং তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের খন্ডন করত। যখন তারা হযরত আলী(রা.) কে কথাবার্তায় রত দেখত, তখনই لا حكم الا لله এর স্লোগান তুলত। বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত আলী (রা.) বারবার তাদের এই স্লোগান

তাদের এবং সাধারণ লোকদের পথে এই বস্তু ছিল প্রতিবন্ধক। এতে মুসলমানদের হৃদয়-মনে তাদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হলো না। এই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, খারেজীদের 'নাজ্দাত' উপদলের মতবাদ এই ছিল যে, আদৌ ইমাম অথবা খলীফার প্রয়োজন নেই। লোকদের উচিত নিজেদের বিষয়াদি নিজেরাই সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে পরস্পর মিলেমিশে সমাধা করে ফেলা। যদি এ পদ্ধতিতে কর্ম সমাধান না হয়, ইমাম ব্যতীত একান্তই না চলে, তবে ইমাম নির্বাচনে কোন বাধা নেই। অর্থাৎ তাদের মতে ইমাম নির্বাচন ওয়াজিব নয়, তবে প্রয়োজন দেখা দিলে নির্বাচন করা যাবে।

৩. খারিজীরা সকল প্রকার গুনাহগারকে কাফির সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করত। চাই সে গুনাহ ইচ্ছাপূর্বক হোক, খারাপ নিয়্যতে হোক, ভুলবশত হোক কিংবা ইজতিহাদী ভুলের কারণে হোক। এ কারণেই সালিশী হেতু তারা হযরত আলী (রা.) কে কাফির মনে করত। অথচ হযরত আলী (রা.) সালিশীর ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তুতি নেননি। যদি তিনি নিজে প্রস্তুতিও নিতেন এবং সালিশী কর্ম সংগত ছিল না মেনে নিলেও বেশির পক্ষে এতটুকু করা যেত যে, হযরত আলী (রা.) এর ভুল ইজতেহাদী ভুল ছিল। কিন্তু খারিজীদের হযরত আলীকে কাফির বলার ব্যাপারে জঘন্যতম বাড়াবাড়ি এবং বারবার পুনরুক্তি এ কথার প্রমাণ করে যে, তারা ইজতেহাদী ভুলকে দ্বীন থেকে বহিষ্কার হওয়ার কারণ এবং ভ্রান্ত আকীদার চিহ্ন বলে জানত। তাদের এই নীতি হযরত উসমান, তালহা, যুবায়র প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহাবা কিরাম সম্পর্কেও ছিল, যাঁদের সাথে খারেজীদের খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ ছিল। কিন্তু খারিজীদের ধরে নেয়া ইজতিহাদী ভুলের কারণে তারা তাঁদেরকে কাফির জ্ঞান করত (নাউযুবিল্লাহ্)।

ইব্ন আবদুল হাদীদ গুনাহগার লোকের কাফির হওয়ার বিষয়টিকে খারিজীদের গৃহীত দলীল দ্বারাই প্রতিহত করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের এ সবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু খারিজীদের উপস্থাপিত দলীল প্রমাণগুলো পেশ করার উপরই সীমাবদ্ধ থাকব। যাতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করা যায় এবং জানতে পারি যে, তাদের চিন্তাধারা কি ছিল? যাতে প্রতিভাত হয় যে, তাদের চিন্তা-চেতনা ও মতবাদে কি ধরনের সারল্য পাওয়া যায়, তাতে কোন বিষয়ের গভীরতায় যাওয়ার প্রয়োজন তারা অনুভব করত না এবং কোন বিষয় আলোচনায় বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাতের চেষ্টাও তাদের ছিল না।

কবীরা গুনাহ্কারী কাফির, এ বিষয়ে খারিজীদের গৃহীত দলীল-প্রমাণ

এ বিষয়ে খারিজীরা অনেক দলীল-প্রমাণ পেশ করত। যেমন-

১. মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غني عن العالمين

আল্লাহ্ তা'আলা হজ্ব ফরয করেছেন যারা সামর্থ্যবান তাদের উপর, আর যে ব্যক্তি কুফরী করল, তবে নিশ্চিত আল্লাহ্ সারা জাহান থেকে বেনিয়ায। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

এ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করে খারিজীরা যে ব্যক্তি হজ্ব পালন করে নাই, তাকে কাফির সাব্যস্ত করেছে। কেননা যে ব্যক্তি হজ্ব পালন করে নাই, সে কবীরা গুনাহ করল। তাদের মতে কবীরা গুনাহকারী কাফির।

ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মত ফয়সালা করে না, তারা কাফির। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

এই আয়াত দ্বারা তারা প্রমাণ করল যে, যারা আল্লাহর বিধান মোতাবিক ফয়সালা করে না, তারা সবাই কাফির।

৩. পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

يوم تبيض وجوه و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذقوا العذاب بما كنتم تكفرون

কিয়ামত দিবসে কারো মুখমন্ডল সাদা হবে আবার কারো হবে কালো। যাদের চেহারা কালো হবে, তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে- তোমরা কি সে সব লোক, যারা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করেছ? এখন সেই শাস্তি ভোগ কর যা তোমরা অস্বীকার করতে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৬)

এই আয়াত দ্বারা খারিজীরা উদ্ভাবন করল যে, 'ফাসিক' (গুনাহ্গার)- এর চেহারা সাদা হতে পারে না, সুতরাং কালো হবে। অতএব بما كنتم تكفرون মোতাবিক তারা কাফির।

৪. এমনিভাবে এ আয়াত ঃ

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة و وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة

কতিপয় চেহারা সেদিন উজ্জ্বল প্রজ্জ্বাল হবে এবং কতিপয় হবে ধুলি মলিন, যার উপর থাকবে কালোর ছাপ, এরা হবে কাফির ও গুনাহ্গার। (সূরা আবাসা ঃ ৩৮-৪২)

শুনতে পেতেন, তখন বলতেন ঃ

كلمة حق يراد بها باطل نعم انه لا حكم الا لله لكن هولاء يقولون لا امرة الا لله و انه لابد للناس من امير بر او فاجر بعمل في امرته المومن يستمتع خبها الكافر و يبلغ الله فيها الاجد و يجمع به الفئ و يقاتل به العدو و تومن به السبل و يوخذ به للضعيف من القوي حتي يستريح بر و يستراح من فاجر

কথা সত্য, মতলব খারাপ। অর্থাৎ তারা কথা বলছে সত্য তবে উদ্দেশ্য তাদের ভাল নয়। এ কথা সঠিক যে, আনুগত্য একমাত্র তাঁরই। কিন্তু এরা এর মর্ম এই গ্রহণ করেছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত জনসাধারণের কোন আমীরও নেই। অথচ জনগণের জন্য একজন আমীর (শাসনকর্তা) অত্যাবশ্যক। চাই তিনি পুণ্যবান কিংবা গুনাহ্গার, তাঁর হুকুমতের আশ্রয়ে ঈমানদারগণ তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন, কাফির সম্প্রদায়ও উপকৃত হবে এবং মানুষ মহান আল্লাহ্র দানে তাদের স্বাভাবিক কার্যাবলী সম্পাদন করবে। এই শাসক দুশমনের সাথে লড়বেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করবেন, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন, সবল থেকে দুর্বলের অধিকার আদায় করে দিবেন, পুণ্যবানগণ তাঁর হুকুমতে শান্তি পাবেন এবং পাপিষ্ঠদের থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

হযরত উসমান ও আলী (রা.) এবং অত্যাচারী শাসকদের বিষয়ে তাদের অসন্তুষ্টির উপর তারা ঘুরপাক খেতে লাগল। এ বিষয়টি তাদের মন-মগজ এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে, সত্য অনুধাবনের সকল দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল। এরা হযরত উসমান, আলী, তালহা ও যুবায়র (রা.) ও অত্যাচারী বনু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশকারীদের নিজেদের দলে ভিড়াতে লাগল এবং কতিপয় অপরাপর মূলনীতিতে তুলনামূলকভাবে তাদের সাথে নম্র আচরণ করত। অথচ সে বিষয়ে তাদের বিরোধীদের প্রতি তারা চরম কঠোরতা প্রদর্শন করত। কিন্তু অসন্তুষ্টি প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন বিরোধিতা ও কঠোরতার ভয় ছিল না। অর্থাৎ খারিজীরা তাদের দলভুক্ত লোকদের প্রতি নরম আচরণ করলেও তাদের বিরোধীদের প্রতি চরম কঠোর আচরণ করত। আচরণের এ তারতম্যের কারণ ছিল শুধু অসন্তুষ্টি প্রকাশ।

ইব্ন যুবায়র (রা.) যখন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন খারিজীরা তাঁকে সহযোগিতা প্রদান করে এবং তাঁর সাহায্যে যুদ্ধ করারও ওয়াদা করে। কিন্তু যখন তারা জানতে পারে যে, ইব্ন যুবায়র (রা.) তাঁর পিতা যুবায়র, তালহা, আলী এবং উসমান (রা.) এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ এবং সম্পর্কচ্ছেদে সম্মত নন, তখন তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে।

খারিজীদের মতবাদ ও বিশ্বাস

আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় খারিজীদের বুদ্ধিমত্তা, অহংবোধ এবং গোত্রীয় অবস্থা জানা গেল। যদ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ছিল অত্যন্ত পরিস্কার ও সমান্তরাল। তারা কুরায়শ এবং মুদার গোত্রসমূহকে ঘৃণা করত। এ মুহূর্তে আমরা তাদের কতেক বিশেষ বিশ্বাস ও মতবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করব।

১. খলীফা নির্বাচিত হবেন স্বাধীন এবং ইনসাফপূর্ণ নিরপেক্ষ ভোটের মাধ্যমে। যাতে সকল মুসলমান অংশগ্রহণ করবেন এবং অপরদের বাদ দিয়ে কোন এক গোষ্ঠীর উপর তা নির্ভর করবে না। খলীফা ততক্ষণ পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন যতক্ষণ তিনি আদল-ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। শরী'আতের বিধান জারী করবেন, ভুলত্রুটি ও কঠোরতা থেকে বেঁচে থাকবেন। যদি তিনি এগুলো পালনে অপারগ হন, তবে তাকে পদচ্যুত করা এমন কি হত্যা করাও বৈধ।

২. খিলাফত কোন আরবীয় বংশের সাথে সীমাবদ্ধ নয়, কুরায়শদেরও এতে কোন বিশেষত্ব নেই। এ কথাটিও ভুল যে, অনারবগণ খলীফা হতে পারবে না, শুধু আরবরাই এ পদে আসীন থাকবেন। সকল মুসলিম খলীফা হওয়ার ব্যাপারে সম অধিকারপ্রাপ্ত বরং উত্তম এই যে, খলীফা কুরায়শ ভিন্ন অপর কাউকে নির্বাচিত করা, এতে যদি তিনি সত্য বিচ্যুত হন অথবা শরী'আত বিরোধী কোন কার্যকলাপ ও তৎপরতায় জড়িয়ে পড়েন, তবে তাকে পদচ্যুত করা অথবা হত্যা করা সহজ হবে। কেননা কুরায়শ ভিন্ন অপর গোত্রীয় খলীফাকে পদচ্যুত অথবা হত্যার কারণে গোত্রপ্রীতি ও বংশীয় কলহের ভয় থাকবে না। কুরায়শ ভিন্ন খলীফা আল্লাহ্র আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় খুঁজে পাবে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রথমদিকে খারিজীরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহব রাসীকে তাদের খলীফা মনোনীত করে এবং তাকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলতে শুরু করে। এ লোকটি কুরায়শ ছিল না। খারিজীদের এ মতবাদ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। উদ্দেশ্য ছিল- মুসলমানদের অধিকাংশকে নিজেদের দলে ভেড়ানো এবং তাদের মতবাদ গ্রহণে আকর্ষণ সৃষ্টি করা। কিন্তু এতে প্রতিবন্ধক হলো যে, খারিজীরা মাওয়ালিগণকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করত। মুসলমানদের হত্যা বৈধ মনে করত। তারা মুসলিম মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে দাসে পরিণত করত। হযরত আলী (রা.) এবং অধিকাংশ আহ্লে বায়তের ঈমানের ব্যাপারে তারা তীব্র সমালোচনা ও তাদের প্রতি কলংক আরোপ করত।

এ আয়াতের আলোকে খারিজীরা বলতে চাচ্ছে যেহেতু গুনাহগারদের চেহারা ধূলি মলিন হবে, সেহেতু তারা অবশ্যই কাফির হবে।

৫. এমনিভাবে এ আয়াতে কুরআনী ঃ ولكن الظالمين بايات الله يجحدون

এই যালিমেরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে। (সূরা আন'আম ঃ ৩৩)

এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যালিম সম্প্রদায় জাহিদ-অস্বীকারকারী। অস্বীকার কাফির সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য।[১৯]

আপনারা অবলোকন করলেন যে, খারিজীদের উপস্থাপিত কুরআনী দলীলসমূহ বাহ্যিক সরল অর্থের উপর স্থাপিত, তাদের দৃষ্টি ছিল শুধু আয়াতের বাহ্যিক দিকের উপর। এমন কি এ লোকগুলো কুরআনের আয়াতসমূহের হুকুম-বিধানাবলী অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম থেকে কিভাবে বঞ্চিত যে, এর মর্মমূলে পৌঁছতেও তারা সমর্থ হলো না।

খারিজীদের উপদলসমূহ

খারিজী বহু উপদলে বিভক্ত এবং বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসে বিজড়িত। যেমন ঃ

আযারেকা ঃ এরা হলো নাফি ইব্‌ন আযরাক-এর অনুসারী। এরা তাদের বিরোধীদেরকে মুশরিক মনে করে এবং হত্যা করা জায়িয মনে কর। তারা নবীগণকে নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করে না।

নাজদাত ঃ এরা হলো নাজদা ইব্‌ন উয়ায়ম-এর শিষ্য। এরা মুসলমানদের সন্তানদের হত্যা জায়িয মনে করে না। যুদ্ধের প্রতি অনীহা পোষণকারীদেরকে কাফির বলে না।

সুফরিয়া ঃ এরা যিয়াদ ইব্‌ন আসফার শিষ্য। এরা আযারেকদের বিরুদ্ধমত পোষণ করত।

আজারেদা ঃ এরা হলো আবদুল করীম আজরাদ এর অনুরাগী। এরা মতাদর্শের দিক থেকে নাজদাত গোষ্ঠীর নিকটবর্তী ছিল।

আবাদিয়া ঃ এরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবাদ এর অনুসারী। এরা খারিজীদের মধ্যে নরম ও মধ্যমপন্থী বলে পরিচিতি। এরা মুসলমানদেরকে মনে করত মু'মিনও নয় মুশরিকও নয়। এরা প্রকাশ্যে হত্যার পক্ষপাতী।

এছাড়াও খারিজীদের মধ্যে ইয়াযিদিয়া ও মায়মুনিয়া এ দু'টি দল ছিল জঘন্য, চরম গোঁড়া (extremist) এবং নিষ্ঠুর।[২০]

মুরজিয়া

গোড়ার দিকে এরা ছিল রাজনৈতিক ফিরকা। তারপর তারা রাজনীতির সাথে 'আকাইদ'-কে গুলিয়ে ফেলল। কবীরা গুনাহের সাথে বিজড়িত ব্যক্তির বিষয়টি যেমনভাবে খারিজী, শী'আ এবং মুতাযিলা গোষ্ঠি সৃষ্টি করেছিল এবং সে যুগের সবচে বিতর্কিত বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল, তেমনি এরাও তাদের পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণ করেছিল। যেহেতু এদের পত্তন হয়েছিল রাজনীতি দ্বারা, এজন্যই আমরা এদেরকে রাজনৈতিক গোষ্ঠির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করলাম।

হযরত উসমান যিন-নূরাইন (রা.) এর খিলাফতের শেষদিকে সর্বপ্রথম এই গোষ্ঠির বীজ বপন করা হয়। হযরত উসমান (রা.) এবং তাঁর রাষ্ট্রীয় আমলাদের বিষয়ে যখন সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে হৈ চৈ শুরু হলো, যা তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হলো। এমতাবস্থায় সাহাবা কিরামের এক জামায়াত এ বিষয়ে পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং নিজেদেরকে মুসলমানদের ফিতনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়ে রাখলেন। এ বিষয়ে তাঁরা হযরত আবুবকর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي و الماشي فيها خير من الساعي الا فاذا نزلت او وقعت فمن كان له ابل فليلحق بابله و من كانت له غنم فليلحق بغنمه و من كانت له ارض فليلحق بارضه فقال رجل يا رسول الله من لم تكن له ابل و لا غنم و لا ارض قال يعمد الي سيفه فيدق علي حده بحجر ثم لينج ان استطاع النجاة

অচিরেই ঘোরতর ফিত্‌নার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। এমতাবস্থায়, উপবেশনকারী চলন্ত ব্যক্তি থেকে এবং চলন্ত ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। যখন এ ফিত্‌না দেখা দেবে, তখন উটের মালিক উটের কাছে চলে যাবে এবং ছাগলপালের মালিক ছাগলপালের দেখা-শুনায় লেগে যাবে এবং ভূস্বামী ভূমির পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করবে। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যার উট, ছাগল, জমি নেই সে কি করবে? তিনি বললেনঃ স্বীয় তলোয়ার উত্তোলন করবে এবং পাথরে আঘাত করে তার তেজ নিঃশেষ করে দেবে। আর এভাবেই যথাসম্ভব ফিত্‌না থেকে দূরে থাকবে। (মুসলিম, ২ খ., পৃ. ৩৮৯)

সাহাবা কিরামের এক জামায়াত মুসলমানদের পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহ-বিবাদ থেকে দূরে থাকলেন; তাঁরা কোন অবস্থাতেই নিজেদেরকে এতে জড়ালেন না এবং তাঁরা পরস্পরে দ্বন্দ্বে লিপ্ত দু'দলের মধ্যে কে সত্যপন্থী, কে মিথ্যে এ বিষয়েও কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা, পর্যালোচনাও করলেন না। তাঁরা হলেন, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, আবূ বাক্‌রা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) প্রমুখ। সম্ভবত তাঁরা ফিত্‌নার বিষয়ে যেকোন ফয়সালাকে পশ্চাৎবর্তী রেখেছেন। অর্থাৎ কে সত্যের উপর আছে, সে বিষয়ে ফয়সালা দিলেন না। তাঁরা এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করেন।

ইমাম নববী (র.)-এ ফিত্‌নার বিষয়ে বলেন ঃ

ان القضايا كانت بين الصحابة مشتبهة حتي ان جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفين و لم يقابلوا ولم يتيقنوا الصواب

সাহাবা কিরামের মাঝে এ বিষয়টি ছিল অত্যন্ত জটিল। তাঁদের এক জামায়াত এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে পারেননি, বরং তাঁরা ছিলেন হয়রান-পেরেশান। তাঁরা বিবাদরত উভয় দল থেকে পৃথক থাকলেন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে নিজেদের জড়ালেন না, আর কে সত্য ও সঠিক, এমন ফয়সালাও দিলেন না।

ইব্‌ন আসাকির সাহাবা কিরামের এ জামায়াত সম্পর্কে বলেছেন- "তাঁরা ছিলেন সংশয়ে পতিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন যুদ্ধরত। যখন তাঁরা মদীনা থেকে যুদ্ধের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে গোলযোগের নাম-নিশানাও ছিল না। হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদাতের পর তাঁরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। তখন দেখতে পেলেন মদীনার অবস্থা অন্যরূপ। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁদের বলা হল, তোমাদের কতিপয় বলছে, হযরত উসমান (রা.) মাযলূম অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি তাঁর সাহায্যকারী ও সহায়তা দানকারীগণ সত্য ও ন্যায়ের উপর আছেন। পক্ষান্তরে অপর দল বললেন, হযরত আলী (রা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ সত্যের উপর রয়েছেন। অথচ অবস্থা এমন ছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন বিশ্বাসযোগ্য ও বিশ্বস্ত। সুতরাং আমরা উভয় [হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা.)] থেকে পৃথক থাকলাম। আমরা কাউকে ভালমন্দ কিছু বলছি না এবং কারো ব্যাপারে অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করছি না। আর কারো বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য দিচ্ছি না। আমরা তাঁদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করছি যে, তিনিই এর ফয়সালা করবেন।

মুরজিয়াদের চিন্তাধারা ও মতাদর্শ

"কবীরা গুনাহে জড়িত ব্যক্তিদের" মাসয়ালাটির বিষয়ে যখন চরম বিরোধ ও তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হলো, তখন খারিজীরা দাবি করল যে, তারা 'কাফির'। তারা এ দাবি করে সকল মুসলমানের বিরুদ্ধে যোদ্ধা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল। এমন কি তারা শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরতা ও চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিল। তখনও মুরজিয়ারা 'কবীরা গুনাহে জড়িত ব্যক্তির' বিষয়ে কোন দিক-নির্দেশনা দিল না এবং বিষয়টিও তারা আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করে দিল। যেমনটি করেছিল তারা অপরাপর বিষয়েও। এদের স্থলাভিষিক্তদেরকেই লোকজন 'মুরজিয়া' উপাধিতে ভূষিত করল। এর উত্তরসূরীগণ তাদের পূর্বসূরীদের 'কবীরা' গুনাহে জড়িত ব্যক্তির মতাদর্শের উপর তুষ্ট থাকতে পারল না। বরং তারা প্রমাণিত পদ্ধতিতে দাবি করল যে, "মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরে বিশ্বাস এবং জানার নামই হলো ঈমান"। ঈমান থাকা অবস্থায় গুনাহ কোন ক্ষতিকর নয়, ঈমান ও আমল সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। তাদের কতিপয় আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলতে লাগল, ঈমানের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে, মুখে কুফরীর ঘোষণা দিলে, মূর্তিপূজা করলে, ইয়াহূদীবাদে ও খ্রিষ্টবাদে বিশ্বাস করলে এবং ক্রসের পূজা করলেও ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না, বরং ঈমান যেমন ছিল, তেমন থাকবে। কেউ যদি দারুল ইসলামে বাস করেও ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং সে অবস্থায় মারা যায়, তবে সেলোক আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্ণ মু'মিন, আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং অকাট্যভাবে সে জান্নাতী হবে।[২১]

কতিপয় মুরজিয়া বলে যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি জানি যে, আল্লাহ তা'আলা শূকর খাওয়া হারাম করেছেন। কিন্তু আমার এতটুকু জানা নেই যে, এটা কি শূকর না ছাগল, না আর কিছু? তা হলে সে মু'মিনই থাকবে।

অথবা কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ বায়তুল্লাহ্‌য় হজ্জ ফরয করেছেন, কিন্তু আমি জানিনা কা'বা ঘর কোথায় অবস্থিত। হতে পারে তা হিন্দুস্তানে হবে। "তবে এমন লোকও মু'মিন"। এ মতাবলম্বীর উদ্দেশ্য এই বলা হবে যে, এ ধরনের আকীদা বা বিশ্বাস ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত কোন জিনিস নয়, তা ঈমান বহির্ভূত জিনিস। তার উদ্দেশ্য কিন্তু এই নয় যে, সে এ সব বিষয়ে সন্দেহ কিংবা সংশয়ে পতিত। কেননা একজন বিজ্ঞ লোকের পক্ষে এ কি করে সম্ভব হতে পারে যে, তিনি জানেন না কা'বা ঘর কোন্‌দিকে এবং তিনি শূকর ও ছাগলের মধ্যে পার্থক্যও বুঝেন না।[২২]

বস্তুত এই গোষ্ঠীর কারণে ঈমানের সারবত্তা বেং নেকী ও পবিত্রতার কোন মর্যাদা বাকী থাকে না। সুতরাং এই কারণে চরিত্রহীন, লম্পট ও কলহপ্রিয় লোকজন এই মতাদর্শ গ্রহণ করতে লাগল এবং একে নিজেদের হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থের হাতিয়ার বানাল। এ ধরনের কলহপ্রিয় লোকদের কোন সীমা-পরিসীমা রইল না, তারা একে নিজেদের দুষ্কর্মের হাতিয়ার সাব্যস্ত করল, আর একে নিজেদের হীন স্বার্থ ও অসৎ উদ্দেশ্যের উপর আবরণ হিসেবে ব্যবহার করল। এমনভাবে তারা বিভ্রান্ত ও বিবাদপ্রিয় লোকদের মন জয় করে নিল।

আবূল ফারয ইসফাহানী এ বিষয়ে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঃ

"মুরজিয়া ফিরকার এক ব্যক্তি এবং শী'আ ফেরকার এক লোকের মধ্যে ঝগড়া হল। তারা উভয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, যে ব্যক্তির সাথে তাদের প্রথম সাক্ষাত হবে, তাকেই তারা সালিশ সাব্যস্ত করবে। সুতরাং যে ব্যক্তির সাথে তাদের প্রথম সাক্ষাত হলো, সে ছিল আবাজী গোষ্ঠীর এক দুশ্চরিত্র, লম্পট ব্যক্তি। তারা উভয়েই তাকে লক্ষ্য করে বলল, বলুন শী'আ মতাবলম্বী উত্তম, না মুরজিয়া?

লোকটি বলল ঃ আমার শরীরের উপর অংশ হলো শী'আ আর নিচের অংশ মুরজিয়া।

মুরজিয়া দু'প্রকারের

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, দু'টি দলের উপর মুরজিয়া শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১. তারা, যারা উমাইয়া শাসনামলে সাহাবা কিরামের মধ্যকার পরস্পর মতবিরোধ এবং তাঁদের মধ্যকার বিবাদ সম্পর্কে নিরপেক্ষ ছিল।

২. তারা, যারা এ মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল যে, কুফর ভিন্ন আল্লাহ্ তা'আলা সকল পাপ ক্ষমা করবেন। সুতরাং ঈমান অবস্থায় পাপে কোন ক্ষতি নেই, যেমনিভাবে 'কুফর' অবস্থায় আনুগতো কোন লাভ নেই। যেহেতু পাপাচারে আসক্ত লোকেরা শেষোক্ত মতাদর্শে স্বীয় হীন উদ্দেশ্য এবং অশ্লীলতা ও দুশ্চরিত্রতার দ্বার উন্মুক্ত পেয়েছিল, এ কারণে যায়িদ ইব্ন আলী (রা.) বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ আমি মুরজিয়াদের উপর অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি, যারা পাপাচারী লোকদেরকেও মহান আল্লাহ্র ক্ষমার আশাবাদী বানিয়ে দিয়েছে। এই গোষ্ঠী 'মুরজিয়া' নামটিকে এমন বদনামে পরিণত করেছিল যে, অপরাপর দলের জন্য তা 'গালি' হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল।

মুরজিয়াদের উপদল সমূহ

১. ইউনুছিয়া ঃ ইউনুছ ইবনে আউন আন্ নুমাইরি এর অনুসারীরা ইউনুছিয়া নামে পরিচিত।

২. ওবায়দিয়া ঃ ওবায়েদ আল মুকতাইব এর অনুসারীরা এ নামে পরিচিত। তার ধারণা হল শিরিক না করলেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

৩. গস্সানিয়া ঃ গস্সান আল কুফি এর অনুসারীরা এ নামে পরিচিতি।

৪. সোবানিয়া ঃ আবু সোবান আল মুর্জি এর অনুসারীরা এ নামে পরিচিত।

৫. ছালেহীয়া ঃ ছালেহ ইবনে ওমর আস ছালেহী এর অনুরাগীরা ছালেহিয়া নামে পরিচিত।

হানাফীদের উপর মুরজিয়া অপবাদ

যারা বিশ্বাস করত যে, 'কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়'। চরমপন্থী মু'তাযিলারা তাদের সবার ব্যাপারে ঢালাওভাবে 'মুরজিয়া' শব্দের ব্যবহার করত। বরং তারা (মু'তাযিলা ভিন্ন অন্যরা) বিশ্বাস করত যে, কবীরা গুনাহকারী নিজের গুনাহের শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং সাহিবাইন অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উপর 'মুরজিয়া' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছিল।

আল্লামা শাহরাস্তানী (র.) লিখেছেন ঃ

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর শিষ্যগণকে 'মুরজিয়াতুস সুন্নাহ্' مرجئة السنة বলা হতো। অধিকাংশ কালামশাস্ত্রবিদগণ তাঁকে মুরজিয়াদের মধ্যে গণ্য করেছেন। সম্ভবত এর কারণ, তাঁদের মতে ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস এবং তার ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না। এ কারণে লোকেরা মনে করেছিল যে, তিনি আমলকে ঈমানের পশ্চাৎবর্তীতে রেখেছেন। তারা এ কথা অনুধাবন করতে পারল না যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) আমলে এত সচেতন ও নিষ্ঠাবান হয়েও কি করে 'আমল' ছেড়ে দেয়ার ফতওয়া দিতে পারেন? এর আরেকটি কারণও আছে। তা হলো এই যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) প্রাথমিক পর্যায়ে আত্মপ্রকাশকারী কাদ্‌রিয়া ও মু'তাযিলাদের বিরোধী ছিলেন। মু'তাযিলারা ঐ লোকদেরকে মুরজিয়া বলতো যারা তাক্‌দীরের মাসয়ালার বিষয়ে তাদের বিরোধী হতো। খারিজীরাও এমনটি করত। সুতরাং অনর্থক মু'তাযিলা ও খারিজী দল তাঁর প্রতি 'মুরজিয়া' শব্দের প্রয়োগ করে।[২৩]

এভাবে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর শিষ্যগণ ছাড়াও অপরাপর বিরাট সংখ্যক উলামায়ে কিরামকেও 'মুরজিয়া' বলা হয়েছিল। যেমন ঃ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ তালিব, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, তুলাকা ইবন্ হাবীব, আমর ইব্ন মুর্‌রা, মুহারিব ইব্ন দিসার, মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান [ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এর সম্মানিত উস্তাদ] এবং কাদীর ইব্ন জাফর (র.) প্রমুখ। অথচ এ উলামায়ে কিরাম হাদীস ও ফিক্‌হ-এর সর্বজনমান্য ইমাম ছিলেন। আর এঁরা কেউই কবীরা গুনাহে জড়িত ব্যক্তিদের কাফির বলতেন না এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও মনে করতেন না।

জাবারিয়া

তাকদীর, মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির অবস্থা, এর সাথে সাথে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির স্বরূপ এমন একটি বিষয়, যার সম্পর্কে সাহাবা কিরামের যুগেই চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা শুরু হয়েছিল। কিন্তু আরবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও রীতি-নীতি

এবং চিন্তার সরলতার কারণে তারা এ বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে ও চিন্তা-ভাবনা থেকে বিরত থাকে এবং এ ধরনের কন্টকাকীর্ণ পথ পরিহার করে চলত যা তাদের হৃদয় ও চিন্তায় চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যখন সাহাবা কিরামের পবিত্র ও সোনালী যুগ শেষ হল এবং মুসলমানগণ বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মেলামেশা করতে লাগল, মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দল ও উপদলের সৃষ্টি হলে এ ধরনের বিষয়ের উপর আলোচনা ও পর্যালোচনার সীমা প্রশস্ত হলো এবং মুসলমানগণ প্রাচীন ধর্মাবলম্বীদের মত এসব বিষয়ে তক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হল।

মুসলমানদের যে সম্প্রদায়ের বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই, তারা দাবি করতো যে, "মানুষ তাদের কর্মের কারক নয় এবং যে কার্যাবলী বাহ্যতঃ তাদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, মূলত তাদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।" এই সম্প্রদায়ের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, বান্দার সাথে কাজের সম্পর্ক নেতিবাচক করে তা আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধযুক্ত করতে হবে। কেননা বান্দার কোন শক্তি নেই, সুতরাং সে স্বীয় কর্মে কেবল বাধ্য বা অসহায় (مجبور)। এতে তার কোন শক্তি সামর্থ্য কিংবা ইচ্ছা ও ইখ্‌তিয়ার নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মাঝে কাজকে এমনিতেই সৃষ্টি করে দেন, যেমনি কোন জড় বস্তুর মধ্যে করে থাকেন। রূপকভাবে সেসব কর্ম মানুষের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়ে থাকে। যেমনি সম্বন্ধযুক্ত করা হয় জড় পদার্থের প্রতি। যেমন ঃ বলা হয়ে থাকে "বৃক্ষ ফল দিয়েছে", "পানি প্রবাহিত হয়েছে", "পাথর নড়েছে", "সূর্য উদিত হয়েছে এবং অস্তমিত হয়েছে" "আকাশে মেঘে ভরে গিয়েছে", "বৃষ্টি শুরু হল", "যমীন শস্য-শ্যামল হয়েছে" ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, প্রতিদান ও শাস্তি এক প্রকার 'জাব্‌র'। 'যখন আকীদায়ে জাব্‌র' প্রমাণিত হলো, তখন আমল দ্বারা দমনও হবে 'জাবর'।[২৪]

ইমাম ইব্ন হাযম (র.) জাবারিয়াদের ধারণা ও অনুমান মোতাবিক তাদের দলীল-প্রমাণ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ যখন মহান আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য হল (فعال) "সকল কিছুর কারক" আর এ বাস্তবতা সর্বজনমান্য যে, কোন বস্তুই তাঁর সাদৃশ নয়, এমতাবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি فعال হতে পারে না। জাবারিয়াগণ বলছেঃ কর্মের সম্বন্ধ মানুষের প্রতি এমন, যেমন ঃ তোমরা বলে থাক مات زيد যায়িদ মারা গিয়াছে; قام البناء দালান দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে তাকে (যায়িদকে) আল্লাহ্ মেরেছেন এবং দালানও আল্লাহ্ দাঁড় করিয়েছেন।[২৫]

জাবারিয়া সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ

ইতিহাসবেত্তাগণ এ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আমাদের প্রবল ধারণা যে, যে সম্প্রদায় জড়বাদের ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাদের বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত নেয়া বড় কঠিন যে, এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কে? সুতরাং এই গোষ্ঠীর পত্তনের দৃষ্টিভঙ্গিও জানা সহজ কাজ নয়। তবে আমরা সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি যে, 'জাব্‌র' আকীদা উমাইয়া খিলাফতের প্রাথমিক যুগে বিস্তার লাভ করে এবং উমাইয়া খিলাফতের শেষকালে একটি 'মাযহাব'-এ পরিণত হয়। উমাইয়া খিলাফতের কালের দু'জন অতি সম্মানিত আলিমের দু'খানা চিঠি আমাদের সম্মুখে রয়েছে যার বর্ণনা মুরতাযা المنية و الامل গ্রন্থে করেছেন।

১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) এর চিঠি

এ চিঠিখানা লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) সিরিয়ার জাবরিয়াদের লক্ষ্য করে, 'জাব্‌র'-এর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণে বারণ করে। তিনি লিখেছেন- "আম্মাবাদ (তারপর), তোমরা অপরকে 'তাক্‌ওয়া' অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছ, অথচ তাক্‌ওয়া অবলম্বনকারিগণ তোমাদের কারণে বিভ্রান্ত হচ্ছে। তোমরা লোকদের অশ্লীলতা থেকে বারণ করছ, অথচ গুনাহগার তোমাদের কারণে আত্মপ্রকাশ করছে। হে পূর্বতন যুদ্ধবাজের সন্তানরা এবং হে অত্যাচারীদের সাহায্যকারীরা! তোমাদের কারণে বদ্‌কারদের মসজিদসমূহ আবাদ হয়েছে এবং তোমাদের শয়তান পূর্ব পুরুষদের সুখ্যাতি বাড়ছে।

তোমরা সবাই আল্লাহ্র ব্যাপারে মিথ্যে বলছ এবং নিজেদের অন্যায় প্রকাশ্যে তাঁর উপর সোপর্দ করছ। তলোয়ার তোমাদের গলায় শোভা পাচ্ছে এবং আল্লাহ্র উপর মিথ্যে অপবাদ হলো তোমাদের সাক্ষ্য। তোমরা কি তাঁকে পরীক্ষা করে নিয়েছে? এবং তাঁকে তোমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নিয়েছ? তোমরা কি তাঁর সার্বিক সন্তুষ্টি হাসিল করেছ?

"তোমরা এমন লোকদের বন্ধুত্বের দাবি করছ, যারা আল্লাহ্র সম্পদও হাতছাড়া করে না, না তাঁর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শ করেছ, না ইয়াতীমের ধন-সম্পদ পরিহার করেছ, তোমরা নিকৃষ্টতর সৃষ্টিকে আল্লাহ্র সবচে বড় 'হক' দিয়ে রেখেছে। সত্যপন্থীদের সাহায্য ও সহযোগিতা থেকে বিমুখ হয়েছ, তাঁদের জ্বালাতন করছ, এমনকি তাঁদের তোমরা অসম্মানিত করে খাটো করে দিচ্ছ? যার কারণে তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য হয়ে যাচ্ছেন। তোমরা বাতিলপন্থীদের সাহায্য করছ, যার কারণে তারা বিজয়ী হচ্ছে, সংখ্যায় প্রবল হচ্ছে, আল্লাহ্র দিকে ফিরে এসো, তাওবা করে নাও। যারা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে, আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করেন।"

এই চিঠিতে জাবরিয়াদের মতাদর্শের খন্ডন রয়েছে। কেননা তাতে বলা হয়েছে যে, "তোমরা প্রকাশ্যভাবে নিজেদের অপকর্ম আল্লাহ্‌র প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করছ।"

২. হযরত হাসান বাস্‌রী (র.)-এর চিঠি

দ্বিতীয় চিঠিখানা লিখেছেন হাসান বাস্‌রী (র.)। তিনি বাসরার জাবরিয়াদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন ঃ

" যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর কাযা ও কাদ্‌র" - এ বিশ্বাস করে না, সে কাফির সম্প্রদায়ভুক্ত। যে ব্যক্তি নিজের গুনাহের দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর চেপে দেয়, সে ব্যক্তিও কাফির। আল্লাহ্‌র আনুগত্য চাপিয়ে দেয়ার কারণে করা হয় না এবং না কেউ পরাজিত হয়ে তাঁর নাফরমানী করতে পারে। কারণ এই যে, তিনি প্রকৃত মালিক বানিয়ে দিয়েছেন এবং মানুষের মাঝে যে শক্তি-সামর্থ্য আছে, তাও তাঁরই দান। সে যদি নেক্‌কাজ করে, তবে তিনি তার কাজে হস্তক্ষেপ করেন না, আর যদি সে গুনাহ-পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে তিনি তাতে হস্তক্ষেপ করেন, যদি তিনি চান তবে। যখন তিনি কিছু করছেন না, তবে এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। "যদি আল্লাহ্ মাখলূকাতকে আনুগত্যে বাধ্য করতেন, তবে সাওয়াব দেওয়ার প্রশ্ন থাকত না। আর যদি অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুনাহে বাধ্য করতেন, তবে শাস্তি রহিত করতেন। আর তিনি যদি মানুষকে অনাহূত ছেড়ে দিতেন, তবে তাঁর শক্তিহীনতা প্রমাণ হতো। বরং সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা আছে যা তিনি গোপন রেখেছেন। যদি মানুষ নেক আমল করে, তবে এ হলো আল্লাহ্‌র দয়া, যদি সে গুনাহের কার্যক্রম গ্রহণ করে, তবে তাঁর শাস্তি তার জন্য অবধারিত।" এ চিঠিতে জাবারিয়াদের আকীদা পুরোপুরি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে।

আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলছেন যে, আমি আমার পিতার নিকট বসা ছিলাম। একজন লোক আসলেন এবং বললেন, ইব্‌ন আব্বাস! এখানে এমন একটি গোষ্ঠি আছে, যারা দাবি করছে যে, সকল কিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এবং আল্লাহ্ জোরপূর্বক তাদের উপর গুনাহ চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি যদি জানতে পারতাম এখানে এমন লোক আছে, তবে আমি তার টুটি চেপে এমনভাবে ধরতাম যে, তার প্রাণ বায়ূ বের হয়ে যেত। তিনি বললেন, এ কথা বলবে না যে, আল্লাহ্ জোরপূর্বক আমাদের গুনাহ করতে বাধ্য করেছেন। এ কথাও বলা উচিত নয় যে, আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে বে-খবর যে, বান্দা কি করছে। কেননা এতে আল্লাহ্‌র 'জাহিল' হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়।[২৬]

জাবারিয়াদের আকীদা ইয়াহুদী মস্তিস্ক প্রসূত

ইতোপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে যে, 'জাব্‌র' মতাদর্শ সাহাবা কিরাম (রা.), এমন কি নবী করীম (সা.)-এর যুগে জন্ম হয়েছে। উমাইয়া যুগের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, সেকালে 'জাব্‌র' মতবাদ একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় মতাদর্শে পরিণত হয়। যার সাহায্যকারী সহায়তা প্রদানকারীরা এ মতাদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটায়। শিক্ষাদানের মাধ্যমে তার প্রসার ঘটিয়ে ব্যাপকতা দান করে। এখন প্রশ্ন- এ মতবাদের জন্ম হল কবে?

১. কতিপয় লোকের মতে এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কোন এক ইয়াহূদী। সেই এই মতবাদ মুসলমানদের লিখিয়েছে এবং তার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছে।

২. কেউ কেউ মনে করছেন, এ মতবাদের আবিস্কারক ছিল জা'দ ইব্‌ন দিরহাম। সে সিরিয়ার এক ইয়াহূদী থেকে এই মতবাদ আহরণ করে এবং বসরাবাসীদের মধ্যে তার বিস্তার ঘটায়। পরবর্তীতে তার থেকে জাহম ইব্‌ন সাফওয়ান দীক্ষা পেয়েছে। 'শরহুল উয়ূন' গ্রন্থে জা'দ ইব্‌ন দিরহাম-এর বর্ণনা দিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, জা'দ ইব্‌ন দিরহাম জাহম ইব্‌ন সাফওয়ান হতে সে সব কথা শিখেছে যার সাথে জাহম সম্বন্ধযুক্ত। এতে বলা হয়ে থাকে যে, জা'দ এর মতাদর্শ আবান ইব্‌ন সাম'আন থেকে এবং সে তালুত ইব্‌ন আ'সাম ইয়াহূদী থেকে আহরণ করেছে।

এতে স্পষ্ট হলো যে, এ সব আকীদা-বিশ্বাস ইয়াহূদীর মস্তিস্কপ্রসূত। আর নবী করীম (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর যুগেই এর সূত্রপাত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সমকালীন যুগে তালুত নামের এক ইয়াহূদী ছিল। সে সাহাবা কিরাম (রা.) এর যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিল।

উপরোক্ত আলোচনার পরও আমরা অকাট্যভাবে বলতে পারছি না যে, এই সব আকীদার উদ্‌গাতা ইয়াহূদীরা। কেননা এর পূর্বেও এ সব আকীদা পারস্যবাসীদের[২৭] মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এ বিষয়টিও সমান্তরালভাবে প্রচলিত যে, এটি 'জরাথ্রুষ্টীয়' ও মানী বা অপরাপর ফিরকা সমূহের একটি হতে পারে। এ মতবাদ মূলত খোরাসানে সমৃদ্ধি লাভ করে। কেননা জাহমই ছিল এর জন্মদাতা এবং নিজের সাথে তা সম্বন্ধযুক্ত করে নেয়। সে এ ভূখন্ডকেই তার মতাদর্শ প্রচারের জন্য উপযুক্ত মনে করেছিল। উপরন্তু এ গোষ্ঠি তুলনামূলকভাবে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পারসী ও ইয়াহূদীই ছিল। আরব দেশে এদের কোন পাত্তা ছিল না।

জবরিয়াদের উপদল সমূহ ঃ

১. নাজ্জারিয়া ঃ আল হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ আন নাজ্জার (মৃত ২৩০ হিজরী) এর অনুসারীরা নাজ্জারিয়া নামে পরিচিত।

২. দরারিয়া ঃ দরার ইবনে আমর এর অনুসারীরা এ নামে পরিচিত।

৩. জামিয়া ঃ জাহাম ইবনে ছফওয়ান এর অনুসারীরা জাহামিয়া নামে পরিচিতি। সে খাঁটি জবরিয়া হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত।

জাহাম ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ানের আকীদা

জাবারিয়া গোষ্ঠি জাহম ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। জাহম ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান ছিল বনী রাসেব -এর আযাদকৃত গোলাম। খোরাসানে তার আত্মপ্রকাশ এবং ওখানে সে তার মতবাদের প্রচার শুরু করে। প্রথমদিকে সে ছিল শুরায়হ্ ইব্‌ন হারিস এর কারণিক। সে শুরায়হ-এর সাথে নাসব ইব্‌ন সিয়ার এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। মুসলিম ইব্‌ন আহওয়ায মাযিনী তাকে বনী মারওয়ানদের শেষকালে হত্যা করে। তার শিষ্যরা নিহাওয়ান্দ-এ বিদ্যমান ছিল। তারপর আবূ মানসূর মাতুরিদী এবং ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (র.) উভয়ের মতাদর্শ এ সব দেশের ইতিকাদী মাযহাবসমূহের উপর প্রবল হয়ে যায়। ফলে অপরাপর মাযহাবের নাম-নিশানা মিটে যায়। জাহামই ছিল জাবারিয়া ফিরকার সবচে বড় প্রচারক ও সাহায্যকারী। 'জাবর' আকীদার পাশাপাশি সে আরও কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার চালাত খুব তীব্রভাবে।

১. জান্নাত ও জাহান্নাম শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন কিছুই চিরস্থায়ী থাকবে না। পবিত্র কুরআনে যে 'খুলূদ' চিরস্থায়ী-এর উল্লেখ আছে, এর মর্ম হলো দীর্ঘ সময় এবং তারপর ধ্বংস; চিরস্থায়ী নয়।

২. ঈমান হলো মারিফাত অর্থাৎ জানার, জ্ঞাত হওয়ার নাম এবং 'কুফর' হলো 'অজ্ঞতা' ও মূর্খতা।

৩. আল্লাহ্‌র ইল্‌ম এবং 'কালাম' উভয় সৃষ্ট।

৪. সে আল্লাহ্‌কে বস্তু নিচয়ের মধ্যে মনে করে না এবং এ কথাও বলছে না যে, আল্লাহ্ জীবিত। উপরন্তু সে বলত, আমি আল্লাহ্‌র সাথে এমন সব গুণ মিলাতে চাই না, যা ধ্বংসশীল।

৫. সে আল্লাহ্‌র দীদার স্বীকার করতো না।

৬. সে পবিত্র কুরআনকে সৃষ্টি মনে করতো। কেননা কুরআন তার মতে নশ্বর, চিরন্তন নয়।

এমন অনেক লোক ছিল যারা এ সব আকীদায় জাহম-এর মতাবলম্বী ছিল। কিন্তু 'জাহমিয়াদের বিশেষ আকীদা যাতে তারা সবার চেয়ে বেশি খ্যাতি পেয়েছিল, তা ছিল 'জাবর' আকীদা। অর্থাৎ মানুষ অসহায় মাত্র। না আছে তার কোন ইচ্ছাশক্তি, না কর্মশক্তি, না কোন কর্ম।

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল উলামায়ে কিরাম 'জাব্‌র' মতবাদের খণ্ডন ও প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন এবং জাহামিয়ার মতবাদকে বাতিল ও ভ্রান্ত চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হন। আমরা ইতিপূর্বেই পূর্ববর্তী আলিমগণের মধ্যে কতিপয়ের মন্তব্য উপস্থাপন করেছি।[২৮]

মু'তাযিলা

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব উমাইয়া যুগে। তবে আব্বাসী খিলাফতের সুদীর্ঘকাল ইসলামী চিন্তা জগতে ছিল তাদের অবাধ বিচরণ। খিলাফতে রাশিদা এবং উমাইয়া যুগে ইরাক ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মীয় গোষ্ঠির বিচরণ ক্ষেত্র ও প্রাণকেন্দ্র। এসব সম্প্রদায়ের যোগসূত্রও ছিল বিভিন্ন। এদের কেউ ছিল প্রাচীন ইরাকের 'কালদানী' চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। কেউ ছিল পারস্যবাসীদের ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শে প্রভাবিত। আবার কেউ ছিল ঈসায়ী-খ্রিষ্টবাদ, কেউ ইয়াহূদীবাদ এবং কেউ আরবী। সব শেষে অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করলো। ইসলাম গ্রহণ করলেও এদের কতিপয় তাদের বংশানুক্রমিক সুদীর্ঘকালের লালিত ধ্যান-ধারণার আলোকে ইসলামকে দেখতে লাগল। তারা তাদের পূর্ব আচরিত রং-এ নিজেকে রঙিন করল এবং নিজেদের নূতন ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসকে সে আলোকেই ঢেলে সাজানোর প্রয়াস পেল।

তবে তাদের মধ্যে এমনও কতেক ছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণ করলেন স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা থেকে, যাতে কোনরূপ মলিনতা বা কলুষতার মিশ্রণ ছিল না। কিন্তু তাঁদের চিন্তা-চেতনা ও মেধাশক্তি বিশুদ্ধ ইসলামী ছিল না। বরং তাঁদের মন-মানসে এবং চিন্তাধারায় অবচেতনভাবে পুরাতন চিন্তাধারা ও প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানীদের(علماء النفس) পরিভাষায় তাঁদের এই অবচেতন ও অনিচ্ছাকৃত প্রভাবকে 'সুপ্তবুদ্ধি' (العقل الباطن - Potential intellect) বলা যেতে পারে।

সুতরাং আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.) এর সময়ে যখন ইরাকে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ও দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করল তখন প্রাচীন ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা মাথাছাড়া দিল, ঘুমন্ত ফিতনা জাগ্রত হলো এবং তারা নিজেদের মুখোশ খুলে ফেলল। ইরাক ও তার আশেপাশে শী'আ এবং খারিজী তাদের বিভ্রান্ত চিন্তাধারা নিয়ে বের হয়ে আসল। চিন্তা-চেতনার এই বিচিত্র কোলাহলমুখর পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করল মু'তাযিলা সম্প্রদায়।

মু'তাযিলাদের আত্মপ্রকাশকাল ও নামকরণের কারণ

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশকাল সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মাঝে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো মতে, যখন হযরত হাসান (রা.) হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর অনুকূলে খিলাফত থেকে সরে গেলেন, তখন হযরত আলী (রা.)-এর ভক্ত-অনুরক্তদের একদল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে একদম নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন এবং তাদের কর্ম তৎপরতাকে শুধুমাত্র 'আকাইদ সম্পর্কীয়' বিষয়ের মাঝে সীমিত করে নিলেন। আবুল হাসান তারায়েফী স্বীয় গ্রন্থ اهل الاهواء و البدع এ লিখেছেন- "তারা তাদের নাম রাখল মু'তাযিলা। যেহেতু যখন হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা.) হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর বায়'আত করে খিলাফতের ভার তাঁর উপর সোপর্দ করেন, তখন এসব লোক হযরত হাসান এবং মু'আবিয়া (রা.) উভয় থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি সকলের সংশ্রব থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। এরা কিন্তু মূলত হযরত আলী(রা.)-এর ভক্ত শিষ্য ছিলেন। এমনি অবস্থায় এদের কর্মতৎপরতা গৃহ অথবা মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সীমিত হয়ে গেল। এরা বলত, "আমরা শুধু জ্ঞানচর্চা ও ইবাদতেই মশগুল থাকব।"

উলামায়ে কিরামের অপর বৃহৎ দল এদের বিষয়ে বলছেন যে, মু'তাযিলাদের মধ্যমণি ছিলেন ওয়াসিল ইব্ন আতা।[২৯] তিনি হযরত হাসান বসরী (র.)-এর জ্ঞানদান কেন্দ্রের সাথে জড়িত ছিলেন। সেকালে এ প্রশ্ন অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করেছিল এবং মানুষের মন-মগজে স্থান করে নিয়েছিল যে, "কবীরা গুনাহে জড়িত ব্যক্তি মুসলমান, না মুসলমান নয়।" হযরত হাসান বাসরী (র.)-এর বিরোধিতা করে ওয়াসিল বললেন ঃ আমি মনে করি "গুনাহে কবীরায় জড়িত ব্যক্তি সাধারণত মুসলমান নয়, বরং সে কুফর ও ঈমানের মাঝামাঝিতে অবস্থান করছে।"

এ মতপার্থক্যের পর ওয়াসিল হযরত হাসান বসরী (র.)-এর হালকায়ে দরস থেকে আলাদা হয়ে গেলেন এবং ঐ মসজিদেরই এক কোণে পৃথক হাল্কা প্রতিষ্ঠা করে বসে পড়লেন।[৩০]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে জানা গেল যে, ওয়াসিল এবং তার সঙ্গীরা কিভাবে এ নামে অভিহিত হলো। কিন্তু কতিপয় পাশ্চাত্যবিদ বলেছেন যে, এই সম্প্রদায়কে 'মু'তাযিলা' বলার কারণ যেহেতু তারা ছিল আল্লাহ্ভীরু পুণ্যবান এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে নির্লিপ্ত। সুতরাং 'মু'তাযিলা' শব্দ তাদের জন্য ব্যবহার অত্যন্ত যুক্তিসংগত। যেহেতু তারা আবিদ-ইবাদত গুযার ও যাহিদ-দুনিয়া থেকে অনাসক্ত ধরনের লোক। প্রকৃতপক্ষে তাদের সবাইর অবস্থা কিন্তু এমনটি ছিল না। এদের মধ্যে সব ধরনের লোকই ছিল। অর্থাৎ পুণ্যবান লোক যেমন ছিল, তেমনি ছিল গুনাহ্গার। আবার ভাল লোক যেমন ছিল, তেমনি ছিল দুষ্ট লোক।

মু'তাযিলাদের পাঁচটি মৌলনীতি

আবুল হুসায়ন খাইয়্যাত (র.) স্বীয় গ্রন্থ 'আল ইনতিছার' -এ লিখেছেন ঃ

لا يستحق احد اسم الاعتزال حتي يجمع القول بالاصول الخمسة ١ـ التوحيد و ٢ـ العدل ٣ـو الوعد و الوعيد٤ـ و المنزلة بين المنزلتين ٥ـ و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر .....

"যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ৫টি মৌলনীতির উপর বিশ্বাস স্থাপন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মু'তাযিলা বলা ঠিক হবে না। ১. তাওহীদ-একত্ববাদ; ২. আদল-ন্যায়পরায়ণতা; ৩. পুণ্যের প্রতিফল এবং অপুণ্যের শাস্তি ; ৪. ইসলাম ও কুফরের মধ্যবর্তী অবস্থানের স্বীকৃতি; ৫. সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ। যার মধ্যে এই ৫টি মৌলনীতি পাওয়া যাবে, তাকেই 'মু'তাযিলা' বলা ঠিক হবে। কেননা মু'তাযিলা মতবাদে এই ৫টি মৌলনীতি সামগ্রিক অর্থে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে ব্যক্তি এর কোন ব্যতিক্রম করবে, তাকে 'মু'তাযিলা' বলা যাবে না। তার কোন কাজ ও বক্তব্যের যিম্মাদারী মু'তাযিলাদের উপর বর্তায় না।

সুচতুর মু'তাযিলাদের প্রকাশ্য মৌলনীতির অন্তরালে কূটিলতা ছিল। সুন্দর সুন্দর কথার ছদ্মাবরণে তারা ইসলামের মূল উৎপাটনে ছিল তৎপর। পক্ষান্তরে সর্বসম্মতভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ঈমানের মৌলিক দিক ছয়টি। যেমন ঃ ১. আল্লাহ্র উপর ঈমান; ২. নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান; ৩. কিতাবসমূহের উপর ঈমান ৪. ফিরিশতাদের উপর ঈমান; ৫. আখিরাত বা পরকালের উপর ঈমান এবং ৬. তাক্দীরের উপর ঈমান। এ মৌলিক বিষয়গুলোর উপর ঈমান কুরআন

ও হাদীসের দলীল-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। রাফেযীদের উসূল-মৌলনীতি ৪টি ঃ ১. তাওহীদ; ২. আদল-ন্যায়নীতি; ৩. নবুওয়াত ও ৪. ইমামত বা নেতৃত্ব। কিন্তু মু'তাযিলারা ৫টি মৌলনীতি আবিষ্কার করল। মু'তাযিলাদের এই ৫টি মৌলনীতি বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত সুন্দর ও নির্দোষ বলে দৃষ্টিগোচর হয়, যা প্রত্যেক বিভ্রান্ত দলেরই অবস্থা। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সে যুগের উলামায়ে কিরাম (ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ) বলেছেন যে, মু'তাযিলারা ইসলামী শরীয়াহর সকল দলীল-প্রমাণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তাদের বিভ্রান্ত মতাদর্শ দ্বারা পদদলিত করে দিয়েছে।[৩১]

মুতাযালীদের উপদল সমূহ ঃ

১. আল ওয়াসেলিয়া ঃ হযরত হাসান বসরীর ছাত্র ওয়াসিল বিন আতার (মৃত ১৩১ হিজরী) নামানুসারে এ মতবাদের নামকরণ করা হয়। আবদুল মালিক, ইবনে মারওয়ান ও হেশাম ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামলে এ ব্যক্তিই মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবক্তা।

২. হুজায়লিয়াঃ মুতাযিলাদের মধ্যে আবুল হুজাইল ইবনে হামদান ইবনে হুজায়লের (মৃত ২২৬ হিজরী) অনুসারীদের হুজায়লিয়া বলা হয়। এ ব্যক্তি মুতেযিলা ফেরকার উদ্ভাবক ওয়াসিলের ছাত্র।

৩. নিজামিয়া ঃ ইব্রাহিম ইবনে ইয়াসের ইবনে হানি আল-নিজাম এর অনুসারীরা "নিজামিয়া" নামে অভিহিত। এ ব্যক্তি নাস্তিক, দার্শনিক ও হেশাম ইবনে হেকম রাফেজীর কাছে দীক্ষা লাভ করে। ফলে তার মতবাদে মূল মুতেযিলা হতে কয়েকটি বিষয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

৪. খাবেতিয়া ঃ আহমদ ইবনে খাবেত (মৃত ২৩২ হিজরী) এর অনুসারীদেরকে খাবেতীয়া বলা হয়।

৫. হাদেসিয়া ঃ ফজল আল ফজল হাদেসী (মৃত ২৫৭ হিজরী) এর অনুসারীদেরকে হাদেসিয়া বলা হয়। তারা উভয়েই নিজাম মুতাযেলীর শিষ্য হলেও তাদের নিজেদের কতিপয় নতুন নীতির কারণে দু'টি উপদলের উদ্ভব হয়।

৬. আল বিশরীয়া ঃ মুতাযেলাদের প্রসিদ্ধ পন্ডিত বিশর ইবনে আল মুতামির (মৃত ২২৬ হিজরী) এর অনুসারীরা আল বিশরিয়া নামে অভিহিত।

৭. মুয়াম্মেরিয়া ঃ মুয়াম্মর ইবনে ইবাদ আস সালামী (মৃত ২২০ হিজরী) এর অনুসারীদেরকে মুয়াম্মেরিয়া বলা হয়।

৮. মুরদারিয়া ঃ আবু মুসা ইসা ইবনে সবীহ আলমুরদার (মৃত ২২৬ হিজরী) এর অনুসারীরা এ নামে পরিচিত। দুনিয়াত্যাগী হওয়ার কারণে তাকেই মুতাজেলিদের সাধু বলা হয়।

৯. ছুমামিয়া ঃ ছুমামা ইবনে আশরস আন-নমীরি (মৃত ২১৩ হিজরী) এর অনুসারীরা এ নামে পরিচিত। বাদশাহ মামুনের দরবারে তার খুব কদর ছিল।

১০. হেশামিয়া ঃ হিশাম ইবনে আমর আল ফুয়াতীর (মৃত ২২৬ হিজরী) অনুসারীরা এ নামে পরিচিত।

১১. জাহেযিয়া ঃ আবু উসমান আমর ইবনে বাহর আল জাহেয এর অনুসারীরা এ নামে পরিচিত। তিনি মুতাজিলাদের বিশিষ্ট পন্ডিতদের একজন।

১২. খাইয়াতিয়া ঃ আবুল হুসাইন ইবনে আমর আল খাইয়াত (মৃত ৩০০ হিজরী) এর অনুসারীরা এ নামে পরিচিত। সে বাগদাদে তার উদ্ভাবিত নীতিমালা পরিচালিত করে।

মু'তাযিলাদের চরম নিষ্ঠুরতা ঃ

মুসলিম উম্মাহ্র মহান ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে মু'তাযিলারা যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত করেছিল এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কদর্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে তারা মোটেই কুণ্ঠাবোধ করত না। এ প্রসঙ্গে ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের ব্যাপারে মু'তাযিলা নেতা জাহিয-এর বক্তব্য লক্ষণীয়। তিনি বলেন ঃ মুহাদ্দিস ও সর্বস্তরের জন-মানুষ তাক্লীদ-পছন্দ। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদির চেয়ে তাঁদের কাছে 'তাকলীদ' খুবই প্রিয়। অথচ কুরআনের দৃষ্টিতে তা একেবারেই নিষিদ্ধ। বাকী রইলো, তাঁদের বক্তব্য যে, আমাদের ইবাদত-গুযার, যাহিদ এবং মুত্তাকী লোক রয়েছে। তবে ইবাদত-গুযারীর সম্পর্ক যতটুকু আছে, তা শুধু খারিজী সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশি সংখ্যক ইবাদত-গুযার লোক রয়েছে, অথচ আপনাদের তুলনায় তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। আর আমাদের (মু'তাযিলাদের) তুলনায় তারা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য। এতদসত্ত্বেও তারা (খারিজীরা) পরম নেক্কার, হালাল ভক্ষণকারী, বাহ্যিক আড়ম্বর থেকে পবিত্র, তাক্ওয়া ও আল্লাহ-ভীতি সম্পন্ন, সত্যের অনুসারী ও অনুগামী, আত্মোৎসর্গকারী, কৃপণতা থেকে পবিত্র, দরাজ-দীল, দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসাহীন এবং সৎকাজে পরম আগ্রহী ও উদ্যোগী। এ ধরনের কুৎসাপূর্ণ মন্তব্যের কারণে গণ-মানুষ মু'তাযিলাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে।

বর্তমানে আরো অনেক ফেরকার নাম শোনা যায়। মুলত: এ সব ফেরকার ধ্যান ধারণা পূর্বেও ছিল। প্রত্যেক জমানার

নবী রসুলের বেলায়ও এমনটি দেখতে পাওয়া যায়। কাফের নাস্তিক, বিশেষতঃ মুনাফেকরা নবীদেরকে যে সমস্ত অন্যায় প্রশ্ন ও অভিযোগ করত তারই সূত্র ধরে পরবর্তীতে বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি। যেখানে কোন প্রশ্ন করার অবকাশ নাই সেখানে তারা অন্যায়ভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে, নিঃশর্ত যেখানে তাদের আদেশ-নিষেধ মানার কথা সেখানে যৌক্তিকতা খুঁজে। যার কারনে যুগে যুগে বিভিন্ন ফেরকার উদ্ভব হয়। প্রবন্ধে আমরা নবী করিম (দঃ) এর ফেরকা সম্পর্কিত হাদীসটি আলোচনার বিষয় করে সত্যিকার ওলামায়ে কেরাম এ হাদীছটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যে সব ফেরকার নাম আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা নিজ নিজ যুগে প্রসিদ্ধ ফেরকাব হিসেব দিয়েছেন মাত্র। যার কারনে ফেরকার নাম ও সংখ্যার বিবরন যুগে যুগে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অনেক বিজ্ঞ আলেম মনে করেন, নবী করিম (দঃ) ৭২ ফেরকার হাদীসটি মূলত অধিক ফেরকার দিকে ইশারা করে যে বাতিল ফেরকা ৭২ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা জানি প্রকৃত ঈমানদার মানেই অকৃষ্ঠ চিত্তে ধর্মের বিধি নিষেধ মানা। নবী করিম (দঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের পথে সর্বাবস্থায় অটল থাকা। হযরত আলী (রাঃ) এর একটি বাণী স্মরণ করে শেষ করছি, "যদি ধর্ম সর্বাবস্থায় যুক্তিনির্ভর হত, মাসেহ পায়ের নিচে হতো।" আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইসলামের সহজ সরল মত তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জমাতের উপর অধিষ্ঠিত রাখুন। বিচ্ছিন্ন, বক্রপথ ও অসাধু হতে মুক্ত রাখুন।

তথ্য নির্দেশক ঃ

১. ইসলামী বিশ্বকোষ- ইফা
২. সূরা ছোয়াদ, আয়াত- ৭৭
৩. সুরা তাগাবুন, আয়াত- ৬
৪. সুরা বাকারা, আয়াত- ১৬৮
৫. আবুল ফাতেহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করিম ان ابا سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلي الله عليه و سلم و هو يقسم قسما اتاه
৬. সহীহ বুখারী শরীফ ذو الخويصرة و هو رجل من بني تميم فقال اعدل يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ و يلك من يعدل ان لم اعدل
৭. হারোরিয়া নামক স্থানে তাদের প্রথম উৎপত্তি হয়। তাই খারেজিরা হারেরিয়া নামে প্রসিদ্ধ হয়।
৮. ইসলামী বিশ্ব কোষ ইফা ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা
৯. ইরজা শব্দের দু'টি অর্থ। ১. বিলম্ব, স্থগিত ২. আশ্বাস দেওয়া। প্রথমত অর্থের দিক থেকে এ গোষ্ঠির উপর মুরজিয়া শব্দের প্রয়োগ বিশুদ্ধ। কেননা তারা আমল ইচ্ছার পশ্চাৎবর্তী মনে করে। – ইসলামী বিশ্বকোষ ইফা
১০. প্রাগুক্ত ১১. প্রাগুক্ত ১২. প্রাগুক্ত
১৩. مقدمة ابن خلدون فصل مذاهب الشيعة في الامامة
১৪. شرح نهج البلاغة لابن الحديد ১৫. প্রাগুক্ত
১৬. مقدمة ابن خلدون
১৭. الملل و النحل للشهرستاني
১৮. الفرق بين الفرق
১৯. شرح نهج البلاغة لابن الحديد
২০. الفرق بين الفرق সূত্র ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ
২১. الفصل في الملل و النحل لابن حزم ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৪
২২. এ আকীদা বিশ্বাস ছিল গসসান কুফীর। সূত্র ঃ الملل و النحل للشهرستاني
২৩. التفهيمات الالهية শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর পৃষ্ঠা ২৭ ২য় খন্ড
২৪. الملل و النحل للشهرستاني পৃষ্ঠা ১১৪
২৫. الفصل في الملل و النحل لابن حزم ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩
২৬. السنة و الامل
২৭. এ তালুত ছিল লবীদ ইবনে আসাম ইয়াহুদীর ভ্রাতুষ্পুত্র। مجموعة الرسائل الكبرى ইবনে তায়মিয়া ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫
২৮. ابو حنيفة : ابو زهرة المصري
২৯. এ ব্যক্তি সর্বপ্রথম সাহাবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল - ইবনে খল্লিকান।
৩০. "ফজরুল ইসলাম" - আহমদ আমীন পৃষ্ঠা- ২৮৮
৩১. শরহে আক্বীদাতুত তাহাবীয়াহ পৃষ্ঠা- ২৩০

রক্তাক্ত কারবালা

হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান*

পৃথিবীর ভাঙ্গা-গড়া, উত্থান-পতনই মানব সভ্যতার ইতিহাস। শাসন প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা, আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করতে গিয়েই শাসকবর্গ গড়েছে ন্যায়-অন্যায়ের বিচিত্র ও বর্ণিল ইতহাস। প্রয়োজনে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি জালিম প্রবরেরা। ফিরআউন, হামান, নমরূদ, শাদ্দাদ, চেঙ্গিস, হালাকু সেই নির্মম ধারাবাহিকতার একেক পূনরাবৃত্তি। মুক্তিকামী ফিলিস্তীনিদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার, আফগানিস্তান ও ইরাকের জবর দখল এবং মুসলিম জনপদগুলোতে ধ্বংসের লেলিহান শিখা আধিপত্যের চিরায়ত নেশার সাম্প্রতিক উদাহরণ।

তারপরও সত্যের দীপশিখা রয়ে গেছে অনির্বাণ। অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হন নীতি আদর্শের ধারক বাহকেরা। পরিণামে অনিবার্য হয়ে পড়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে অত্যাচারীরা নির্বিচারে সত্যের বাহক নবী রাসুলদের হত্যা করতেও ছাড়েনি। বনী ইসরাইল গোত্র এক প্রভাতে একাধারে হত্যা করেছিল তেতাল্লিশ জন পয়গম্বরকে। আবার এ ঘটনার প্রতিবাদ করাতে একই সন্ধ্যায় তারা একশ বারো জন সত্যান্বেষী আবেদ দরবেশকে হত্যা করে। ৬১ হিজরীর ১০ মুহাররম কারবালার প্রান্তরে নবীদৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন (রাদি.)'র সপরিবারে শাহাদাত বরণ এবং স্বৈরশাসক অত্যাচারী ইয়াযীদের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিকতার অভাবনীয় ঘটনা অতীতের সকল ট্র্যাজেডি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে।

'কারবালা' শব্দটির উচ্চারণেই মানুষের কল্পনায় অঙ্কিত হয় লোমহর্ষক, বিভৎস সব ঘটনা। নির্যাতনের নজিরবিহীন সব চিত্র, রক্তাক্ত মরুপ্রান্তরের দুঃসহ প্রতিচ্ছবি। যার একদিকে ইয়াযীদবাহিনীর অবর্ণনীয় নির্যাতনের নিষ্ঠুর অমানবিক উপাখ্যান, অপরদিকে সত্যের ধ্বজাধারী নিরীহ নবীপরিবারের অবরুদ্ধ, তৃষ্ণার্ত মুসাফির কাফেলার অসহায় আত্মত্যাগ, করুণ শাহাদতের মর্মান্তিক ইতিহাস। এর আগে ফিরআউন, নমরূদের অত্যাচারী হাতের নির্মম বলী অসহায় মুমিনদের বিরুদ্ধে ছিল অবিশ্বাসী কাফির মুশরিক ও পৌত্তলিকেরা; কিন্তু কারবালার এ ঘটনায় নবীদৌহিত্র ও ইমাম পরিবারের বিরুদ্ধে রক্তের পিপাসু হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁরই মাতামহ প্রিয়নবীর উম্মত ও অনুসারী দাবীদার কুলাঙ্গারেরা। এ বেদনার গভীরতা আদৌ পরিমাপ করার নয়।

কারবালা তার নাম ঃ রক্তের হোলিখেলায় যে সর্বনাশা জায়গাটি পেয়ে গেছে এমন ঐতিহাসিকতা, তার নাম কারবালা। নবীপরিবারের পবিত্র খুনে যা উত্তপ্ত থাকবে মহাপ্রলয় পর্যন্ত। শা'বী থেকে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাদি.) সিফ্ফীন যাওয়ার পথে কারবালা অতিক্রম করেন। যখন ফোরাতের তীরবর্তী 'নীনওয়া' নামক পল্লী বরাবর আসেন তখন তিনি যাত্রা বিরতি করেন। জিজ্ঞেস করলেন, "এ স্থানটির নাম কী?" উত্তরে বলা হোল, 'কারবালা'। নামটি শুনেই তিনি কেঁদে উঠলেন। তাঁর অশ্রুতে সিক্ত হলো সে স্থান। এর কারণ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, একবার আমি আল্লাহর রাসুলের খেদমতে উপস্থিত হলে দেখলাম তিনি কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন কাঁদছেন? উত্তরে প্রিয়নবী (দঃ) ইরশাদ করলেন, এক্ষুনি আমার কাছে জিবরাইল (আঃ) উপস্থিত হলেন আর তিনি আমাকে জানিয়ে গেলেন যে, আমার প্রিয় দৌহিত্র হুসাইনকে ফোরাতের তীরবর্তী একটি স্থানে শহীদ করা হবে, যার নাম 'কারবালা'।

উষ্ণ শোণিত ঝরা সেই ঘটনার নেপথ্যে ঃ নিয়তির অবশ্যাম্ভাবী ঘটনাবলীর নেপথ্যে নিহিত থাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিবিধ কারণ। এমনি রক্তস্রোত কারবালার হৃদয়বিদারক এ ঘটনার পরিণতিকে অনিবার্য করে তুলেছে যে প্রসঙ্গটি তা নিম্নরূপ ঃ

হিজরী ৬০ সনের রজব মাসে উমাইয়া শাসক হযরত আমীরে মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাদি.) এর তিরোধানের পর তাঁর পুত্র ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া আমীর ও স্বঘোষিত খলিফা হয়ে রাজ সিংহাসনে আরোহন করে। মসনদে আরোহন করে ইয়াযীদ নিজ ক্ষমতা নিষ্কন্টক করতে মদীনার অত্যন্ত প্রভাবশালী তিন সাহাবী হযরত হুসাইন ইবনে আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদি.) কে টার্গেট করে। যেহেতু এঁরা পূর্ব থেকেই ইয়াযীদের যুবরাজ হয়ে ওঠা আদতেই পছন্দ করেননি, তাই খেলাফতের পক্ষে তাঁদের বশ্যতা স্বীকারই তার কাছে প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠে। কাজেই সে মদীনার গভর্ণর ওলীদ ইবনে উকবাকে আমীরে মুয়াবিয়ার ওফাতের সংবাদ জানিয়ে বর্ণিত বুযুর্গত্রয়ের কাছ থেকে তার পক্ষে বাইআত গ্রহণের কড়া নির্দেশ দেয়। তার ভাষা ছিল-

"হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এবং ইবনে যুবাইর (রাদি.) কে এমনভাবে ধরো যেন বাইআত ছাড়া মুক্তি না পায়।"

এ নির্দেশ পেয়ে বিচলিত ওলীদ পরামর্শের জন্য মারওয়ানকে ডেকে পাঠান। মারওয়ানের পরামর্শ ছিল, তাঁদের ডেকে

* মুদাররিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

এখনই বাইআত নেয়া হোক, অস্বীকার করলে তাৎক্ষণিক শিরচ্ছেদ। তাঁরই পরামর্শে বিশেষ করে ইমাম হুসাইন ও ইবনে যুবাইরকে ডাকার সিদ্ধান্ত হল। ইবনে যুবাইর ইতোমধ্যে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে যান। ইমাম হুসাইন আসলে ওলীদ তাঁকে আমীরে মুয়াবিয়ার ওফাতের সংবাদ এবং ইয়াযীদের অভিপ্রায়ও জানিয়ে দেন। তবে ইমাম হুসাইন গোপন আনুগত্যের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সাধারণ মুসলমানদের কাছে প্রকাশ্যে সে বাইআতের আহ্বান জানাতে পরামর্শ দেন এবং তাঁদের সামনে তাঁকে ডাকা হলে তিনি ভেবে দেখবেন বলে জানান।

ওলীদের কাছ থেকে ফিরে এসে ইমাম নিজ পরিবারের সদস্যদের জানালেন, "পরিস্থিতি খুব খারাপ, ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া স্বঘোষিত খলিফা হয়ে আমাকে তার প্রতি আনুগত্যের জন্য চাপ দিচ্ছে। অন্যথায় নবীর পবিত্র শহরসহ হেরমে মদীনায় রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। পাপিষ্ট, দুরাচার ইয়াযীদ খেলাফতের জন্য উপযুক্ত তো নয়ই, বরং এ পদ্ধতিও ইসলাম পরিপন্থী। এ অবস্থায় কোন ভাবেই তাকে খলিফা বলে স্বীকার করা মানে প্রিয় নানার দ্বীনের মূলে কুঠার হানার শামিল। আবার নবীজি যে মদীনা পাককে 'হারাম' বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তাতে রক্তপাতের কারণ হয়ে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় আমাদের মক্কা শরীফের দিকে যাত্রা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই"। তিনি তাঁদের তৈরী হতে নির্দেশ দিলেন।

এভাবে প্রিয় আবাস ভূমি ছেড়ে তিনি মক্কা শরীফে এসে আশ্রয় নিলেন।

এদিকে মক্কায় তাঁর অবস্থানের সংবাদ পেয়ে কুফাবাসীরা তাঁকে আমন্ত্রন জানিয়ে চিঠি ও দূত প্রেরণ করতে থাকে। প্রথমে তাঁর কাছে চিঠি নিয়ে আসে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা হামদানী ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়ালী। এরপর একদল প্রতিনিধি এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। তাঁদের মধ্যে ছিল কায়েস ইবনে মুসহির, আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ, আম্মারা ইবনে আব্দুল্লাহ সলুলী। তাদের সাথে প্রায় একশত পঞ্চাশের মত চিঠি ছিল। মোল্লা বাকের মজলিসীর বর্ণনা মতে, সে চিঠির সংখ্যা প্রায় বার হাজার। সবগুলো চিঠির সারাংশ হলো, "ইয়াযীদি শাসন থেকে কুফাবাসী সম্পূর্ণ বিমূখ হয়ে গেছে। তারা একজন সঠিক পথ নির্দেশক চায়। এ মূহুর্তে প্রিয় নবীর দৌহিত্র ও ইমাম হিসাবে তাদের সামনে হযরত হুসাইন ছাড়া বিকল্প নেই। তারা হুসাইনের নেতৃত্বে তাগুতী শাসন থেকে মুক্তি চায়। তাদের জান ও মাল সর্বস্ব ইমাম হুসাইনের জন্য উৎসর্গ। তিনি আসলেই তাঁরা বাঁচেন।" কুফার মানুষদের কপট আমন্ত্রন ইমামের কারবালা যাত্রা তরান্বিত করে।

সদরুল আফাযিল আল্লামা মুরাদাবাদী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "ব্যাপারটি এমন নাজুক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল যে, তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে ইমামের গত্যন্তর ছিল না। যদিও শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, হযরত জাবের এবং হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসী (রাদি.) প্রমূখ ইমামের কুফা যাওয়ার সিদ্ধান্তের সাথে একমত ছিলেন না। কুফাবাসীর অঙ্গীকারে তাঁদের আস্থা ছিল না। তাছাড়া এটাও বিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না যে, ইমামের শেষ পরিণতি তাঁর নানার ভবিষ্যদ্বানী মোতাবেক শাহাদাতের মূহুর্ত খুবই ঘনিয়ে এসেছে।

সবার আশংকাকে উপেক্ষা করে ইমাম কিন্তু কুফায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিলেন। তবে কুফার জনগণ থেকে আসা চিঠির বক্তব্য সরেজমিনে পর্যবেক্ষন করার উদ্দেশ্যে তিনি চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকীলকে আগে সেখানে পাঠানো সমীচিন ভাবলেন। সে মতে মুসলিম ইবনে আকীলকে জানিয়েও দিলেন, "আপনি নিজে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করে আমাকে জানাবেন। আনুকূল্য দৃষ্টে আমি চলে আসব।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইমাম মুসলিম বিন আকীল দু'শিশু পুত্রসহ কুফায় পৌঁছে গেলেন। সেখানে ভক্তকুলের বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছাস তাঁকে ঘিরে উৎসবের রূপ নিল। তারা শপথ করে জানাল, আমরা জান-মাল আপনার জন্য উৎসর্গ করবো। আপনার সঙ্গ ছাড়ব না।

এদের আবেগ উচ্ছাসের আতিশয্য দেখে মুসলিম বিন আকীল ইমাম হুসাইন (রাদি.) কে চিঠি লিখে দিলেন, এ যাবৎ আপনার পক্ষে আমার হাতেই প্রায় আঠারো হাজার লোক আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে। আপনি অবশ্যই চলে আসুন, যাতে মুসলিম মিল্লাত ইয়াযীদি শাসনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে একজন ন্যায়-নিষ্ঠ ও যোগ্য ইমামের কাছে বাইআতের মাধ্যমে ধন্য হতে পারে। এ অবস্থায় কুফাবাসীর আহ্বান প্রত্যাখান করার মত কোন শরীয়তসম্মত ওযর খুঁজে পাওয়া গেল না। কাজেই ইমাম হুসাইন এবার কুফার পথে রওনা হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন।

এদিকে কুফার অবস্থায় নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। মুসলিম ইবনে আকীলের কুফা আগমন এবং তাঁর হাতে হাজার হাজার কুফাবাসীর আনুগত্য প্রকাশ, তাদের অঙ্গীকার ইত্যাদি দেখে ইয়াযীদের সহযোগী আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ও উমারা ইবনে ওয়ালীদ গোপনে ইয়াযীদকে জানিয়ে দেয় যে, ইমাম মুসলিম ইবনে আকীল কুফায় এসে ইমাম হুসাইনের পক্ষে বাইআত নিচ্ছেন, অথচ গভর্ণর নু'মান ইবনে বশীর এর কোন প্রতিকার করছে না। সংবাদ পেয়ে ইয়াযীদ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে বসরার তখনকার শাসক ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদকে গভর্ণর করে কুফায় পাঠিয়ে দেয়, আর নু'মান ইবনে বশীরকে বরখাস্ত করে। ইবনে যিয়াদ ইয়াযীদ কর্তৃক নির্দেশ পায় মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেপ্তার করার,

যদি আত্মসমর্পন না করে তো কতল। নির্দেশ মত ইবনে যিয়াদ এক সন্ধ্যায় হেজাযী পোশাকে কুফায় এসে পৌঁছল। এক জঘন্য কূট-কৌশলের মাধ্যমে সে গভর্ণর হাউসে ঢুকে পড়লো। পরদিন সকালে লোক জড়ো করে তাদের হুমকি- ধমকি দিয়ে ভয় পাইয়ে দিল আর কুফার বেশ কিছু নামজাদা লোককে গ্রেফতার করল। এভাবে কুফার লোকজন মুসলিম বিন আকীলের সংশ্রব থেকে দূরে সরে যায়। অসহায় মুসলিম অগত্যা স্থানীয় ইবনে উরওয়ার ঘরে আশ্রিত হন।

একদিকে ইমাম মুসলিম বিন আকীলের সাগ্রহ আহ্বানে ইমাম হুসাইন (রাদি.) কুফার পথে পা বাড়িয়েছেন, অন্যদিকে হানীর ঘরে আত্মগোপন করে থাকা মুসলিম বিন আকীলের সংবাদ গুপ্তচরের মাধ্যমে ইবনে যিয়াদের কাছে পৌঁছে যায়। ওদিকে ইমাম হুসাইন জানতেও পারেননি যে, তাঁর প্রিয় চাচাত ভাই শহীদ হয়ে গেছেন। গুপ্তচরের সংবাদের ভিত্তিতে হানী ইবনে উরওয়ার ঘর থেকে প্রথমে হানীকে গ্রেফতার করা হোল। এদিকে হানীকে হত্যা করার গুজব ছড়ালে তার গোত্রের সহস্র লোক গভর্ণরের প্রাসাদ ঘিরে ফেলল। আবার মুসলিম বিন আকীলের নেতৃত্বে আঠারো হাজার লোক এসে এ অবরোধে যুক্ত হলো। ইবনে যিয়াদ কৌশলে কুফায় যে সব প্রভাবশালী লোক তার প্রাসাদে বসা ছিল, তাদেরকে দিয়ে ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শনের মাধ্যমে সমবেত মানুষকে সন্ত্রস্থ ও বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হলো।

সঙ্গে আসা ওই কাপুরুষগুলো একে একে সটকে পড়াতে হযরত মুসলিম একা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। বিষয়টি টের পেয়ে ইবনে যিয়াদ ঘোষণা দিলেন, 'মুসলিমকে যে-ই আশ্রয় দেবে তার নিস্তার নেই, আর যে তাকে গ্রেফতার করে আনবে অথবা গ্রেফতারে সহযোগিতা করবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এভাবে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের পরিণতি স্বরূপ ইমাম মুসলিম ও তাঁর সাথে আসা দুটি অবোধ শিশুকে ইবনে যিয়াদের নির্দেশে কতল করা হয়। নবীপরিবারের নিরীহ মুসাফিরের রক্তে এভাবে কারবালার রক্তাক্ত ঘটনার অভিশপ্ত সূচনা ঘটে। আবার ইমাম মুসলিম বিন আকীলকে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় হানী ইবনে উরওয়াকে।

অন্যদিকে ঘটনার পরিণতিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে ইমাম হুসাইন (রাদি.) অনেক প্রভাবশালী হিতাকাঙ্খীদের উপদেশ অনুরোধকে উপেক্ষা করে হিজরী ৬০ সনের যিলহজ্ব মক্কা মোকাররামা থেকে নিজ পরিবারের ছোট্ট কাফেলা নিয়ে কুফার পথে রওনা হলেন। তাঁকে মক্কা থেকে যাওয়ার পথে বাধা দেয়ার জন্য স্বয়ং গভর্নর আমর বিন সা'দ তার ভাইয়ের নেতৃত্বে লোকপর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। তবু তিনি নিবৃত্ত হননি। এভাবে বিখ্যাত আরবী কবি ফারাযদাকও তাঁকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। আবার আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর চিঠি পাঠিয়েও তাঁকে থামাতে চেয়েছিলেন। এমনকি তিনি গভর্ণর আমর বিন সাদের পত্রের মাধ্যমে তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে মক্কায় থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি যাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

অন্যদিকে ইমামের যাত্রার সংবাদ ইবনে যিয়াদ জানতে পারে। সে কাফেলার গতিরোধের ব্যবস্থা নিতে মনস্থ করে। সুতরাং সে তার প্রতিরক্ষা প্রধান হাছীন ইবনে নুমাইর তমীমীকে পরিকল্পনা মাফিক সৈন্য সামন্ত সহকারে পাঠিয়ে দিল। কাদেসিয়া নামক জায়গায় এসে সে তার সৈন্যদের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিল এবং কুফাবাসীর সাথে ইমামের যোগাযোগের সব পথ বন্ধ করে দিল। এদিকে ইমাম হুসাইন (রাদি.) তাঁর আগমনের সংবাদ ও উদ্দেশ্য অবহিত করে কুফাবাসীকে উল্লেখ করে একটি চিঠি কায়েস ইবনে মাসহার সায়দাভীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। কিন্তু পাহারায় আটকে তিনি গ্রেফতার হয়ে ইবনে যিয়াদের নিকট নীত হলে ইবনে যিয়াদের নির্দেশে তাঁকে হত্যা করা হয়।

কারবালার মুসাফিরের সাথে এভাবে পথে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুতী, যুহাইর বিন কাইন প্রমূখ ব্যক্তিদের সাক্ষাত ঘটে। সালাবিয়া নামক স্থানে এসেই তিনি জানতে পারেন মুসলিম ইবনে আকীল ও হানী ইবনে উরওয়ার শাহাদতের কথা। সংবাদটি আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইম ও মায়রানী বিন মুশা'মাল আসাদীর কাছ থেকে জানতে পারেন। এ সংবাদ জানতে পেরে ইমাম সঙ্গীদের শুভাকাঙ্খীদের শাহাদত, কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় অবহিত করে বললেন, "আমার জন্য তোমাদের আত্মাহুতির পথে এগুনোর আদৌ প্রয়োজন নেই। আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি, তোমাদের যার ইচ্ছে ফিরে যেতে পারো।"

কুফায় আগমনরত ইমামকে গ্রেফতারের জন্য ইয়াযীদের পক্ষে হুর বিন ইয়াযীদ রাইয়াহী তমীমীকে এক হাজার সশস্ত্র অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে পাঠানো হয়। সে 'যী হেশম' উপত্যাকায় এসে ইমামের মুখোমুখি অবস্থান নেয়। এখানে ইমাম এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। যার সারমর্ম হলো, "আমি তোমাদের কাছে উপযাচক হয়ে আসিনি; বরং তোমরাই আমাকে চিঠিপত্র ও দূত প্রেরণের মাধ্যমে এখানে ডেকে এনেছো। এখন আমার আগমন তোমাদের কাছে একান্ত অপ্রিয় হয়ে থাকলে আমি আমার পথে চলে যাবো। কুফায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সেনাপতি হুর বিন ইয়াযদ বলল, চিঠির সাথে কোন সম্পর্ক আমাদের নেই। বরং আপনাকে যে কোনভাবে ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এভাবে বহর ইমামকে পাহারা দিয়ে সাথে সাথে চলতে থাকল। আসতে আসতে তারা নীনওয়া ময়দানে এসে পৌঁছেন।

এখানে বহরের কাছে ইবনে যিয়াদের একটি চিঠি নিয়ে দূত আসে। যার বক্তব্য ছিল, "আমার এ চিঠি পাওয়ার পর ইমামকে কড়া পাহারায় রেখো। তাঁকে এমন উন্মুক্ত তেপান্তরে থাকতে বাধ্য করো যেখানে না কোন আশ্রয় বা সহায় আছে, না কোন পানি। এভাবে চলতে চলতে ৬১ হিজরী ৩ মুহররম বৃহস্পতিবার নিজ সঙ্গী-সাথী ও পরিবার-পরিজন নিয়ে এক উদাস, বিষন্ন তেপান্তরে এসে পৌঁছলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এ জায়গার নাম কি? উত্তরে বলা হল- 'কারবালা'। তখন ইমাম বললেন, "এটাই কারবালা, আমাদের সফরের মালপত্র রাখার স্থান, বাহনের পশুগুলো বাঁধার স্থান এবং আমাদের লোকজনের শাহাদতের স্থান। এখানেই ইমামের তাঁবু পড়লো।"

আমর বিন সাদ কুর্দী বিদ্রোহ দমনের শর্তে রায় অঞ্চল (তেহরান)'র গভর্ণর হয়ে চার হাজার সৈন্যসহ যাত্রা করেছিল। কিন্তু সে মূহুর্তে একজন দক্ষ সেনাধ্যক্ষ হিসাবে ইবনে যিয়াদ তাঁকে তাৎক্ষনিকভাবে হুসাইনের মোকাবেলায় নিয়োগ করে। অন্যথায় রায়'র গভর্ণরের পদ ছেড়ে দিতে বলা হয়। ক্ষমতার লোভে শেষ পর্যন্ত সে নবীর প্রিয় দৌহিত্রের বিরুদ্ধে যেতে সম্মত হয়ে যায়। অথচ তার ভাগ্নে হামযা বিন মুগীরা ইবনে শুবা এ ব্যাপারে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলো যে, মামা! যদি তোমাকে পৃথিবীর সমস্ত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকেও বের করে দেয়া হয় তবু সেটা আপনার জন্য হুসাইনের রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় আল্লাহর সামনে যাওয়া থেকে অনেক শ্রেয়। অবশেষে ৬১ হিজরীর ৩ মুহররম সেও চার হাজার সৈন্য সমেত কারবালায় এসে পৌঁছে। সে ইমামের এখানে আসার কারণ জানতে তাঁর কাছে প্রথমে আরযা বিন কায়েস আহমদীকে পাঠাতে চাইলে সে যেতে অপারগতা জানায়। কারণ ইমামকে চিঠি দিয়ে কুফায় আমন্ত্রনকারীদের মধ্যে সেও ছিল। তারপর কাসীর বিন আব্দুল্লাহ শাবী ঔদ্ধত্য দেখিয়ে ইমামের দিকে অগ্রসর হলে তাকে ইমামের পক্ষে আবু সুমামা থামিয়ে দেন। এরপর কুররা ইবনে কায়েস হানযালীকে পাঠানো হল। সে এসে ইমামের কাছে আমর বিন সাদের প্রস্তাব রাখল। ইমাম বললেন, "তোমাদের কুফার প্রভাবশালী লোকেরা অনুনয় করে চিঠি লিখে আমাকে এখানে এনেছো। এখন আমার আগমনে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকলে আমি ফিরে যাবো।" কুররা ইবনে সা'দকে তা অবহিত করে। ইবনে সা'দ উভয়ের বক্তব্য লিখে ইবনে যিয়াদের নিকট পাঠায়। উত্তরে ইবনে যিয়াদ সেনাপতি ইবনে সা'দকে জানাল, এখন ইয়াযীদের বশ্যতা ছাড়া হুসাইনের জন্য একটাই পথ আছে, তা হলো বিশাল ইয়াযীদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা। তুমিও এটা ছাড়া ভিন্ন প্রস্তাব দেয়ার মালিক নও। এটার পর পরই ইবনে যিয়াদের দ্বিতীয় চিঠি আসল, যাতে লিখা ছিল, "হুসাইন ও তাঁর সঙ্গীদের এবং ফোরাতের পানির মাঝে এভাবেই বাধার প্রাচীর হয়ে যাও, যাতে তাঁরা এক ফোঁটা পানিও নিতে না পাবেন। যেমনটি পূণ্যাত্মা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রাদি.)'র সাথে করা হয়েছিল।

ইমাম হুসাইন (রাদি.) আমর বিন সা'দের কাছে আলোচনার প্রস্তাব পাঠান। সৈন্য সামন্ত বাদ দিয়ে উভয়ের শীর্ষ বৈঠকে আলোচনাও হয় প্রচুর। এ আলোচনার মধ্যে উভয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাবনার কথা বর্ণিত আছে। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে আসীর, তাবারী প্রভৃতি গ্রন্থে একথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি তিনটি প্রস্তাব রেখেছিলেন (১) তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে চলে যাবেন (২) অথবা সীমান্তবর্তী অন্য কোন অঞ্চলে চলে যাবেন (৩) অথবা ইয়াযীদের কাছে গিয়ে তার হাতে হাত দেবেন এবং উভয়ের আলোচনায় ফায়সালা স্থির হবে। তবে শেষোক্ত প্রস্তাব যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এ ব্যাপারে উকবা ইবনে সমআনের বর্ণনাও রয়েছে, আমি মদীনা শরীফ থেকে শাহাদত পর্যন্ত বরাবর ইমাম হুসাইনের সঙ্গেই ছিলাম। এক মূহুর্তও তাঁর থেকে আলাদা হইনি। আমি তাঁর সবগুলো বক্তব্য শুনেছি, কিন্তু আল্লাহর শপথ, তিনি একটি বারও বলেননি যে, আমি ইয়াযীদের হাতে আনুগত্যের হাত দেবো। প্রতিবার তিনি একটি কথাই বলেছেন, আমার পথ ছাড়ো, আমি বিশাল পৃথিবীর কোথাও চলে যাবো। শেষ পর্যন্ত দেখবো, লোকেরা কী সিদ্ধান্ত নেয়।

যা হোক ইবনে সা'দ এ প্রস্তাবনাগুলো ইবনে যিয়াদের কাছে লিখে দিলে সে এর কোন একটি মেনে নিতেও চেয়েছিল। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়াল শিমার বিন যিল জওশন। সে জানাল, এটা ইবনে সা'দের অভিসন্ধি বৈ নয়; হুসাইনকে এখনই বাগে পাওয়া গেছে, কাজেই এখন বশ্যতা স্বীকার করানো ছাড়া আর কোন অবকাশ দিতে নেই। তখন শিমার'র পরামর্শে ইবনে যিয়াদ একটি চিঠি দিয়ে তাকে সেখানেই পাঠাল যেখানে ইমাম হুসাইন পরিবার পরিজন নিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে আছেন। চিঠিতে বলা ছিল, "আমি তোমাকে সালিশকার নিয়োগ করিনি। ওরা যদি আমার নির্দেশে গর্দান ঝুঁকায় তো তাদের আজ্ঞাবাহীর মত আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। অন্যথায় হামলা করে তাদের শেষ করে দাও, লাশের উপর ঘোড়া ছুটিয়ে দাও। এটাই তাদের প্রাপ্য। তুমি এটা করতে পারলে আনুগত্যের পুরস্কার পাবে। না পারো তো সৈন্য সামন্ত শিমারের হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি বিদেয় হও।

চিঠি পেয়ে বিচলিত ইবনে সা'দ তার নির্দেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে তার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে দিল। এসে গেল মুহররমের নয় তারিখের বিভীষিকাময় রাত। 'মার' 'মার' রবে ইয়াযীদ বাহিনী ছুটে আসলো। তারা এসে ইবনে যিয়াদের

হুকুম জানিয়ে দিল। অর্থাৎ ইয়াযীদকে মেনে নাও, নচেৎ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। হযরত আব্বাস বললেন, "থামো, আমি তোমাদের কথা আগে ইমামকে জানাই।" ইমাম তাদের কাছ থেকে একটি রাতের অবকাশ চেয়ে নিলেন। যাতে একটি রাত মন ভরে ইবাদত-বন্দেগী করে নিতে পারেন। ইমাম রাতে পরিবারের সবাইকে ডেকে বললেন, "এরা শুধু আমারই রক্তের তৃষ্ণা, আমাকে পেলে এদের আর কিছুর প্রয়োজন নেই। তাই শুধু আমারই জন্য তোমাদের এতগুলো জীবন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার কোন মানে হয় না। তোমরা নিরাপদ কোথাও চলে যাও এবং আজ রাতের মধ্যেই। একথা শুনে ইমামের সাথে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সমস্বরে শুধু একথাই বললেন যে, "আপনাকে যমের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার সামান্যতম ইচ্ছেও নেই।" নিবেদিত প্রাণ সঙ্গীরা আত্মোৎসর্গের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। এভাবে শেষ হলো আশুরার রাত। ইতোপূর্বে ইমাম হুসাইন দফায় দফায় তাদের বুঝাতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। শেষবারের মত ইয়াযীদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে আবারও বক্তব্য রাখলেন। এর ভাষা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী, শৈল্পিক ও প্রাঞ্জল। ইবনে আসীর ও তাবারীতে বর্ণিত এর কিছুটা নিম্নরূপ ঃ

"সমবেত জনতা! তোমাদের মধ্যে যদি কারো মনে সংশয় থাকে যে, আমি জান্নাতের যুবকদের সম্রাট, তবে এতে কি সন্দেহ আছে যে, আমি তোমাদেরই নবীর দৌহিত্র? আমারই রক্তের জন্য তোমরা এত তৃষিত হলে কেন? আমি কি কাউকে হত্যা করেছি কিংবা কারো সম্পদ হানি করেছি, যে তার প্রতিশোধ নিতে চাও? জনাকয়েকের নাম ধরেই ইমাম বললেন, "হে শাবস বিন রিবঈ, হিজায বিন আবজর, কায়েস বিন আশসাস, যায়েদ বিন হারেস, তোমরা আমাকে চিঠি লিখে আসতে অনুরোধ করোনি? তারা সরাসরি অস্বীকার করে বলল, "আমরা কোন চিঠি লিখিনি।" ইমাম বললেন, অবশ্যই তোমরা লিখেছিলে, আর এখন যদি আমার আগমন তোমাদের ভালো না লাগে, তবে আমার পথ ছেড়ে দাও।" এটুকু বলে তিনি থামলে তারা ইমামের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। যুহাইর বিন কায়েস ইমামকে আগলে নিজে এগিয়ে গেলেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদের নিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। কোন ফলোদয় হলো না।

ইমামকে পাহারা দিয়ে রাখতে গিয়ে হুর বিন ইয়াযীদ এতক্ষণ পর্যন্ত সব ঘটনা অবলোকন করলেন। মনে মনে তিনি আহলে বাইতের প্রতি সহানুভূতি রাখতেন। এবার বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে তিনি ইবনে সা'দকে শুধালেন, 'তিনটি প্রস্তাব থেকে একটিও গ্রহণ না করে তোমরা এঁদের সাথে যুদ্ধ করবেই? উত্তরে সে বলল, প্রচন্ড ও ভয়াবহ যুদ্ধই হবে। সেই চরম মূহুর্তে হুর বিন ইয়াযীদ ইয়াযীদের পক্ষ ত্যাগ করে ইমামের চরণে উপস্থিত হয়ে আত্মনিবেদনের অভিপ্রায় জানালেন। ইমাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। হুর এগিয়ে এসে ইয়াযীদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে তেজোদ্দীপক এক বক্তব্য রাখলেন। তাতে তারা তার প্রতি তীর বর্ষন শুরু করে। তিনি সরে গিয়ে ইমামের কাছে চলে আসলেন।

বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা ঃ যুদ্ধের পরিস্থিতি অনিবার্য হয়ে পড়লেও ইমামের কড়া নির্দেশ ছিল তাঁর পক্ষ থেকে যেন আক্রমণের সূচনা না হয়। দেখা গেল ইবনে সা'দ একটি তীর ইমামের দিকে নিক্ষেপ করে বলল, "তোমরা সাক্ষী থেকো, সর্বপ্রথম তীর আমিই নিক্ষেপ করেছি।" এই সেই সৌভাগ্যবান পিতার হতভাগ্য সন্তান। তার পিতা ছিলেন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস। যে সাহাবী উহুদের ময়দানে সর্বপ্রথম প্রিয়নবীর পক্ষে কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী। আজ তারই হতভাগা সন্তান নবীর প্রিয় দৌহিত্রের প্রতি প্রথম তীর নিক্ষেপ করল।

আমর বিন সা'দের তীর নিক্ষেপের সাথে সাথে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠল। উভয় পক্ষে তীর ছোঁড়াছুড়ি শুরু হয়ে গেল। ইমামের সঙ্গীরা যাঁরা তিন দিন পর্যন্ত দানা পানি থেকে বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ইমামের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তাঁরা একে একে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মরুর তৃষ্ণা তাঁদের ঐশী প্রেমে এতটুকু শিথিলতা আনতে পারেনি।

ইয়াযীদ বাহিনী থেকে ইয়াসার ও সালেম নামে দু'জন হুঙ্কার ছেড়ে ময়দানে আসল। তাদের মোকাবেলায় আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমাইর কলবী ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। দুজনকেই তিনি মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেন। এক সময় আরো ইয়াযীদীদের খতম করে তিনি শাহাদত বরণ করলেন। কারবালার তপ্ত মরু হুসাইনী বীরের শোণিত সিক্ত হলো। এভাবে তাঁর পক্ষে সান্ত্বনা জানাতে আসা বিবিও শহীদ হলেন। ধারাবাহিকতায় হযরত হানজালা, মুসলিম বিন আওসাজা, যুহাইর বিন কাইন, বীর বাহাদুর হুর বিন ইয়াযীদসহ প্রায় পঞ্চাশজন বীর মুজাহিদ আক্রান্ত এ ক্ষুদ্র কাফেলার পক্ষে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন।

নিবেদিত প্রাণ সঙ্গীদের সবাই জীবন দিয়েও খান্দানে রাসুলের এ নিরীহ ও পূণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গের কাউকে অক্ষত রেখে যেতে পারলেন না। তাই এদেরও একে একে বরণ করতে হল সে একই পরিণতি। নবী পরিবারের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ্ বিন আকীল, আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান, হযরত কাসেম ইবনে হাসান, ইমামের ভাগিনাদ্বয় ময়দানে আসেন আর শহীদ হন। এঁরা একেকজন ইমামের কাছ থেকে অনুমতি ও বিদায় গ্রহণ করতে আসেন, আর ইমামের মায়াভরা হৃদয় থেকে এক একবার নতুন করে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

ইমামের তাঁবুতে হঠাৎ বিশেষ শোরগোল শোনা গেল। ব্যাপারটা আর কিছু নয়; দুধের শিশু আলী আসগর পানির পিপাসায় ছটফট করছেন। দৃশ্যটা হযরত আব্বাস আলামদারের সইল না। তিনি মশক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। অতি দ্রুত ফোরাতের কাছে গিয়ে মশকে পানি ভরে কাঁধে উঠালেন। তিনি নিজে কিছুটা পান করতে চেয়েও পারলেন না, হয়তো আলী আসগরের চেহারা মনে পড়েছিল। পানির মশক নিয়ে ঘোড়া ছুটাতেই যালিম হায়েনার দল তাঁকে ঘিরে ফেললো। বীর বিক্রমে তাদের ব্যূহ ভেদ করে তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকেন। তীরের বৃষ্টি তাঁকে ঝাঁঝরা করে তুলল। একজন এসে তাঁর ডান হাত কেটে ফেলল। তিনি ঐ অবস্থায় মশক বাঁচিয়ে তা ডান হাতে নিলেন। পাষন্ডরা সে হাতও কাটলো। চরম কষ্টে মশকটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ছুটতে চাইলেন। আর একজন একটা তীর মশকের গায়ে নিক্ষেপ করে তা ফুটো করে দেয়। পড়ে গেলেন আব্বাস। পানি আনা আর হলো না। তিনিও শহীদবর্গের তালিকায় যুক্ত হলেন। মুহাম্মদ ও আউনের মত কিশোরদ্বয়ের শাহাদাত আরো করুণ।

এরপর ময়দানে আসলেন নবোদ্ভিন্ন যৌবন টগবগে তরুণ হযরত আলী আকবর। যিনি হুবহু রাসুলের আকৃতি ও প্রতিচ্ছবি ছিলেন। নবীর ছবি এ জওয়ান ছেলে পিতা হুসাইনের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি বিচলিত বোধ করলেন। বুকফাটা বেদনা সহ্য করেও বিদায় দিতে বাধ্য হলেন। আমর বিন সা'দ তার মস্তকের বিনিময়ে 'মোসেল'র রাজত্ব ঘোষণা করে দিলে লোভাতুর তারেক বিন শীশ আলী আকবরের মোকাবেলায় ছুটে আসল। পলকেই আঘাত তার দফা রফা করে দিল। পিতার এ মর্মান্তিক পরাজয় দেখে ছুটে আসল তার ছেলে উমর বিন তারেক। হুসাইন তনয় তারও একই দশা করে ছাড়লেন। পিতা ও ভাইয়ের প্রতিশোধ নিতে তেজ নিয়ে এগিয়ে আসল তালহা বিন তারেক। আলী আকবর তাকে নিস্তেজ করে ভূপাতিত করে রাখলেন। এবার তৃষ্ণার প্রচন্ডতায় ব্যাকুল হয়ে রাসুলের প্রতিচ্ছবি বীরত্বের অহঙ্কার হযরত আলী আকবর ঘোড়া ছুটিয়ে হঠাৎ হুসাইনের কাছে এসে গেলেন। বললেন, "আব্বা! যদি একটু পানি পেতাম, আমি যুদ্ধ কাকে বলে শত্রুকে জানিয়ে দিতাম।" ইমাম ছেলেকে বুকে জড়িয়ে বললেন, "বাবা! নবীর হাতের কাওসার ছাড়া এক্ষণে আমাদের জন্য আর পানি নেই। এক কাজ করো, মুখটা হা করো। আমার জিভটা চুষে কিছুটা পিয়াস নিবৃত্ত করো। আলী আকবর তাই করলেন। শেরে খোদার বিক্রম নিয়ে আবারও ছুটে গেলেন রণাঙ্গনে। ইয়াযীদ বাহিনীর অনেককে নরকে পাঠিয়ে শত্রুর তীর বৃষ্টিতে ক্রমশঃ জর্জরিত হতে হতে তিনি ডাক দিলেন, আব্বা, আমায় ধরুন, আপনার আলী আকবর যে মাটিতে পড়ে গেল। সে ডাক শুনে ইমাম ছুটে আসার আগেই শত্রুরা নবীর প্রতিচ্ছবিও শহীদ করে দিল।

এদিকে মাসুম আলী আসগরের অবস্থা শংকটাপন্ন হয়ে পড়ায় ব্যাকুল মা ইমামের কাছে হাত জোড় করে অনুনয় করলেন। দুধের শিশুটি নিয়ে যালিমদের দেখান, একটু দয়া হয়ে যদি অন্ততঃ তাঁর মুখে এক ফোঁটা পানি দেয়। তর সইতে না পেরে ইমাম সম্মত হলেন। কোলে করে প্রচন্ড তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগত প্রাণ অসহায় শিশুটিকে নিয়ে শত্রুবাহিনীর সামনে হাজির হলেন। বললেন, আমার জন্য পানি চাইনে, এ শিশুটিকে একটু দয়া করো। ফোরাতের পানি চিল, কাক, শৃগাল, কুকুর পান করে। তোমাদের নবীর রক্ত ছোট্ট এ শিশুটির জন্য এক ফোঁটা পানি দাও। হারমালা বিন কাহেল নামক এক হতভাগ্য বলল, ঠিক আছে ওর তৃষ্ণা মিটিয়ে দিচ্ছি, আর কখনো সে পানি চাইবে না, বলেই একটা তীর ছোট্ট কচি শিশু আসগরের কণ্ঠ নালিতে ছুড়ে দিল। কচি কণ্ঠ চিরে সে তীর ইমামের বাঁ হাতে গিয়ে বিধল। ইমাম তা টেনে খুলে নিলেন। শিশু আসগর একটু যেন শিহরিত হয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে চিরতরে নিস্তব্দ হয়ে গেলেন। ইমাম আসমানের দিকে চাইলেন। শিশু পুত্রের উষ্ণ তাজা লাশ কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে তাঁবুর কাছে আসলেন। বললেন, ধরো আসগরকে, তার তৃষ্ণার যন্ত্রনা আর কাউকে বিচলিত করবে না। নাও আমার সন্তানকে, নানার উম্মত নামের কুলাঙ্গারেরা তাঁকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। কারবালার তপ্ত বালুকার মাঝে সঞ্চিত হলো মাসুম ইমাম আলী আসগরের পবিত্র শোণিত।

এবারে শত্রুর হাঁক ডাকে ময়দানে আসলেন শহীদ কাফেলার একমাত্র আশ্রয় নবীর হৃদয়নিধি, ফাতেমার নয়নমনি, জান্নাতী যুবকদের সম্রাট হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি.)। তাঁর বিদায় গ্রহণ ও ময়দানে আসার মুহূর্তে তাঁবুর শিশু ও মহিলাদের কী অবস্থা হয়েছিলো তা বলা সম্ভব নয়। কখনো বোনেরা ডাকেন, কখনো কিশোরী সকীনা ডুকরে কেঁদে ওঠেন। শহর বানু, যয়নব-কার কান্না তিনি থামাবেন। প্রিয়তমা স্ত্রীর ছল ছল চোখ আসন্ন বিরহের আশংকায় আরো বেশি করুণ চাহনীতে ইমামের শোকের বুকে আরো হাহাকার তোলে। অসহায় কিশোর যয়নুল আবেদীন জ্বরের ঘোর বেহুঁশ ও কম্পমান। এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে ওদিকে শোনা যাচ্ছে শত্রুর আস্ফালন। সবাইকে ধৈর্য্যের অন্তিম উপদেশ দিয়ে শহীদ সম্রাট হৃদয়ের নাড়ি ছিড়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন।

ইমাম চতুর্দিকে চোখ বুলালেন। ফাঁকা, শুন্য তাঁবু। চারিদিকে স্তুপ হয়ে প্রিয়জনদের ছিন্ন ভিন্ন লাশ। জীবন উৎসর্গকারী কোন বান্ধব আর অবশিষ্ট নেই। উদ্ধত শত্রুদের অট্টহাসি তাঁকে আরো আনমনা করে তুলল। ইমাম শেষবারের মত বিশ্বাস

ঘাতকদের আবারো বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, "দেখো, আমি তোমাদের নবীরই দৌহিত্র। আমাকে তোমরা অনেক অনুনয় বিনয় করে এখানে ডেকে এনেছো। আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের কাছে আসিনি। রাজত্বের অভিলাষ থেকে আমি এখানে ছুটে আসিনি। তোমাদের মুক্তির ঐকান্তিক আবেদন, অনুরোধ ও সহস্র প্রতিজ্ঞার বারংবার উচ্চারণ আমাকে এ পর্যন্ত টেনে এনেছে। আমি যুদ্ধের নিয়তেও আসিনি। হেজাযের পবিত্র হেরমদ্বয়কে রক্তপাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে ইয়াযীদের কালো হাত প্রসারিত হচ্ছে দেখে আমি তোমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়েছিলাম। অনেক রক্ত ঝরেছে। নবীর প্রিয়তম এ দৌহিত্রের খুনের অপরাধ থেকে এখনও নিবৃত্ত হও। আমাকে তোমাদের উপর অস্ত্র চালনা থেকে অব্যাহতি চাই।

কিন্তু ওদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হলো না। তাদের বিশেষ ফৌজ ব্যাটেলিয়ন থেকে তমীম বিন কাহতাম প্রথম ইমামের প্রতি আক্রমন করে বসলো। তবে হায়দরী শমসের তাকে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দিল না। ইমামের রণ নৈপূণ্য তাকে মুহূর্তেই ধরাশায়ী করে দিলো। এরপর বদর বিন সুহাইল তার চার ছেলেকে একে একে ইমামের মোকাবিলায় পাঠালো। কিন্তু প্রতিবার তাদের জাহান্নামে গমন ত্বরান্বিত হয়ে যায়।

শেরে খোদার যোগ্য পুত্র বীরত্বের এমন চমক দেখালেন যে, কারবালার ময়দানে বড় বড় ইরাকী বীর জওয়ানদের লাশের স্তুপ ও রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিলেন। এ যুদ্ধটি ছিল এক অসম যুদ্ধ। নারী, শিশু ও আবাল বৃদ্ধ নিয়ে পারিবারিক একটি ক্ষুদ্র কাফেলার সাথে অসীম তেজস্বী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সুনিপূণ যোদ্ধার বিরাট বাহিনীর যুদ্ধ। ইয়াযীদ বাহিনীর এত লোক মারা যাওয়া সত্ত্বেও তেমন চোখে না পড়া ও ইমামের সঙ্গীদের শাহাদাত বেশি করে চোখে পড়ার এটাই অন্যতম কারণ। দেখা গেল কোন বীর পুরুষই একাকী ইমামের সামনে টিকতে পারছিল না। শত্রুমহলে শোর পড়ে গেল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল, তাকে চারিদিক থেকে একযোগে আক্রমন করা হোক।

চারিদিক থেকে আসলো তীরের ঝাঁক। লক্ষ্যস্থল একমাত্র ইমামের অস্তিত্ব। আবুল হুনুক নামে এক অভিশপ্তের ছোঁড়া তীর ইমামের কপাল বিদ্ধ করল। যে শুভ্র নিষ্পাপ ললাট মোবারক নিয়মিত ঝুঁকত আল্লাহর সিজদায়, যাতে স্নেহভরে চুমোয় চুমোয় সিক্ত করতেন প্রিয়নবী। জান্নাতের দুলহার চেহারায় রক্তের অলংকার হয়ে তা বয়ে যাচ্ছে। এবার খোলী ইবনে ইয়াযীদ রহমতুলিল্ল আলামীনের প্রিয় দৌহিত্রের মমতাপূর্ণ পবিত্র বুকে সহসা একটা তীর এমনভাবে ছুঁড়ে মারলো যা তাঁর হৃদপিন্ডে গিয়ে বিদ্ধ হলো। ঘোড় সওয়ার ইমাম এবার কারবালার মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সবাই তাঁকে ঘিরে ধরলো। শিমার উন্মত্ত বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে ওঠল, "তোমরা চেয়ে আছ কেন? তাড়াতাড়ি শেষ করে দাও।" হত্যার এ বিশেষ উৎসবের অগ্রনায়ক ছিল এ শিমার। আমর বিন সা'দের বিরুদ্ধে ইবনে যিয়াদকে প্ররোচিত করে এ ঘটনার মূল পরিকল্পনা সেই তৈরী করে। এ ন্যাক্কারজনক হত্যার কলঙ্ককে সে কৃতিত্বের জয়তিলক বলে মনে করেছিল। সে চিৎকার করতঃ সবাইকে উত্তেজিত করার সাথে নিজেই ধরাশায়ী ইমামের পবিত্র মুখে সজোরে তরবারের আঘাত হানল। এরপর আসল সিনান বিন আনাস নখঈর বর্শার আঘাত, যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সততার সিপাহশালার মহাপুরুষদের চির অহঙ্কার ইমাম হুসাইনের পবিত্র শরীরকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। চির অভাগা খোলী ইবনে ইয়াযীদ তাঁর মস্তক কেটে নিতে এগিয়ে এসেও ভয়ে থমকে গেল; কিন্তু তার কুলাঙ্গার ভাই হাশাল বিন ইয়াযীদ ঘোড়া থেকে নেমে সেই পবিত্র মস্তক এক মূহুর্তে বিচ্ছিন্ন করে তা খোলীর হাতে অর্পন করল। অনেকের মতে শিমারই তাঁর মস্তক বিচ্ছিন্ন করেছিল। এর পক্ষে তাঁরা প্রিয়নবীর এ হাদীস পেশ করেন, যা শেষ মূহুর্তে ইমাম হুসাইন তাঁর বুকে বসা শ্বেতরোগী শিমারকে দেখে বলেছিলেন, আল্লাহ্ ও রাসুল সত্য, নানাজী ইরশাদ করেছেন, "আমি এক ডোরাকাটা কুকুরকে আমার আহলে বাইতের রক্তে মুখ দিতে দেখছি।"

এভাবে মুসলিম জাহানের অবিসংবাদিত ইমাম বেহেশতের জওয়ানকুল সর্দার, শহীদ সম্রাট নানার হাতে কাওসার নিতে নিতে নশ্বর জগতকে বিদায় দিয়ে শাহাদত বরণ করলেন। ইন্না লিল্লাহে ------রাজেউন।

'তাযকেরায়ে সিবতে ইবনে জোযী'র বর্ণনা মতে, ইমামের পবিত্র দেহে ৩৩টি বর্শার আঘাত, ৪০টি তরবারির আঘাত এবং পিরহান মোবারকে ১২১টি তীরের ফুটো ছিল। এতটুকুতে পাষন্ডদের মন ভরেনি। তারা একে একে ইমামের পরনের সবকিছু খুলে নিল। কায়েস বিন মুহাম্মদ বিন আশআস জামা, কাহর বিন কাব পায়জামা, আসওয়াদ বিন খালেদ জুতো জোড়া, আমর বিন ইয়াযীদ পাগড়ী, ইয়াযীদ বিন শোবল চাদর, সিনান বিন আনাস নখঈ বর্ম আর আংটি, বনু নহলের এক ব্যক্তি তরবারীটা লুট করে নিল। এভাবে হত্যা ও লুণ্ঠনের মহোৎসবের নীরব সাক্ষী হয়ে কারবালার বুভূক্ষ যমীন শুষে নিল নবী পরিবারের বহু জোয়ানদের পবিত্র রক্ত, যাঁদের শিরায় শিরায় বইছিল প্রিয়নবীর শোণিত ধারা।

তথ্য সূত্র :

১. খাযায়িনুল ইরফান, কৃতঃ আল্লামা নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ)
২. আসসাওয়াইকুম মুহরিকা, কৃতঃ আল্লামা ইবনে হাজর হায়তমী মক্কী (রহঃ)
৩. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, কৃতঃ ইবনে কাসীর (রহঃ)
৪. তারীখুল খোলাফা, কৃতঃ আল্লামা জালালউদ্দীন সূয়ূতী (রহঃ)
৫. সওয়ানেহে কারবালা, কৃতঃ আল্লামা নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ)
৬. শানে কারবালা, কৃতঃ আল্লামা শফী উকাড়ভী (রহঃ)
৭. শহীদ ইবনে শহীদ, কৃতঃ সায়েম চিশতী
৮. মুহাররম নামা, কৃতঃ খাজা হাসান নিযামী
৯. কারবালা প্রান্তরে, অধ্যাপক মুস্তাফিযুর রহমান অনূদিত
১০. মাসিক তরজুমানে আহলে সুন্নাত (মুহাররম সংখ্যা)

খারিজী ও রাফিজী মতবাদ : একটি পর্যালোচনা

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন দর্শন। ইসলামের দাবী ও আবেদন বিশ্বজনীন, সার্বজনীন। মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল করীম ইসলামের অভ্রান্ত দলীল। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র সুন্নাহ তথা হাদিস শরীফ ইসলামের শাশ্বত নির্ভুল নির্দেশনা। কুরআন সুন্নাহ এজমা কিয়াস এর সমষ্টি দলীল চতুষ্টয় বিশ্ব মানবতার মুক্তির অবলম্বন। ইসলামের পূর্ণতায় বিশ্বাসী মুসলিম মাত্রই উপরোল্লিখিত বিধানাবলীর অনুসারী। দ্বীনের পুর্ণাঙ্গতা সৃষ্টিতে এসবের গুরুত্বও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। আল্লাহর নির্দেশিত প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত সত্যের মাপকাঠি আদর্শের মূর্ত প্রতীক মহান ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথ ও মতের উপর নিরঙ্কুশ আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে যারা শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছে ইসলামী আদর্শ ও দ্বীনের পয়গাম প্রচার প্রসারে অবদান রেখেছে তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের অনুসারী, যথার্থ মুসলিম। পক্ষান্তরে যারাই এর বিপরীতে অবস্থানকারী তারা বিপথগামী, দ্বীনের মুলস্রোত থেকে তারা বিচ্যুত, পথভ্রষ্ট, দিকভ্রান্ত দিশেহারা মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠধর্ম আল ইসলামকে কলংকিত করার প্রয়াসে ইসলামের ছদ্মাবরনে যুগে যুগে আবির্ভূত হয় অসংখ্য ভ্রান্ত দল-উপদলের, ইসলামের সুষ্ঠু, সুন্দর, নির্মল আদর্শকে কালিমাযুক্ত করার হীন প্রয়াসে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ভ্রান্ত মতবাদের, শিরোনামে উল্লেখিত "খারিজী ও রাফিজী" সম্প্রদায় দুটি ইসলামের নামে সৃষ্ট বাতিল মতবাদ। ওদের আকিদা বিশ্বাসও কর্মনীতির আলোকে তাদের ভ্রান্তি ও কুফুরী চিহ্নিত। ইতিহাসে তারা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কুরআন সুন্নাহ ও ইসলামী গবেষক ইমাম মুজতাহিদ পন্ডিত মনীষীদের গবেষণা ও মতামত পর্যালোচনার নিরিখে "খারিজী ও রাফিজী" ভ্রান্ত মতবাদদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় তাদের আক্বিদা বিশ্বাস ও ভ্রান্তনীতি পাঠক সমাজে তুলে ধরার মানসে আমার এ সংক্ষিপ্ত প্রয়াস।

খারিজীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

খারিজী শব্দের অর্থ "দলত্যাগী" সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দলত্যাগ করে চরমনীতি অনুসরন পূর্বক যে বার হাজার মুসলমান এক নতুন দল গঠন করে, সাধারণতঃ ইতিহাসে তারা খারিজী নামে অভিহিত।[১] হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পক্ষত্যাগকারী খারিজীরা কুফার হারুরা নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকে। এ কারণে হাদীস শরীফে খারিজীদেরকে "হারুরীয়া" নামেও অভিহিত করা হয়েছে।[২] খারিজীরা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে বহির্গত (খারিজ) বলে মনে করত। পক্ষান্তরে মুসলমানরা খারিজীদের উগ্রভাবধারা, অতি উৎসাহ ও উশৃঙ্খল কার্যাবলীর কারনে তাদেরকে ইসলামের সীমারেখা হতে বহির্গত মনে করত। একারনে তারা মুসলিম সমাজে খারিজীরূপে আখ্যায়িত।

খারিজীদের উৎপত্তি ঃ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে খলীফা নির্বাচন বিষয়টি কেন্দ্র করে এই মতবিরোধ দেখা দেয়। এ মতবিরোধের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। অনেকেই হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে তাঁর নির্বাচিত খলিফা মনে করতেন, কখনো অসুস্থতার সময় হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব দিতেন বলে অনেকে ধারণা করতেন যে, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যথার্থ উত্তরসূরী। বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। উদ্ভব হল বিভিন্ন মতবাদের

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী জগতের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। এরপর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পর উমাইয়া বংশের হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় বার বৎসর খলীফা পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর মুনাফিক সাবায়ীদের চক্রান্তে সৃষ্ট বিদ্রোহের এক পর্যায়ে কয়েকজন আতৃতায়ীর তরবারীর আঘাতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। তাঁর স্থলে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। এতে উমাইয়াদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। উমাইয়া গোত্রের বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। তারা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যাকারীদের বিচার দাবী করল। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের জন্য তদন্ত টিম গঠনপূর্বক অর্পিত দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হন। কিন্তু প্রতিপক্ষরা তাঁকে সময়

অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ-তৈয়াবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

দিতে সম্মত হননি। তারা উমাইয়াদের হাতেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব রাখার অভিপ্রায়ে নতুন নতুন রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করল। তারা প্রিয়নবীর দুইজন প্রিয় সাহাবা হযরত তালহা ও যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে সঙ্গবদ্ধ হল। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা ভিত্তিহীন অপপ্রচার শুরু করল। এরা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যার ঘটনার ব্যাপারে অসত্য তথ্য ও বিকৃত ধারনা দিয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে দারুনভাবে বিভ্রান্ত করল এবং ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করল। এভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গৃহযুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর নেতৃত্বে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে পরিচালিত এ যুদ্ধ 'উষ্ট্রের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা উটের পিটে আরোহন করে যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হওয়ার কারনে এ যুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধ। যুদ্ধে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জয়যুক্ত হন। ইতিমধ্যে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার গভর্নর হযরত আমীর মুয়াবিয়াকে পদচ্যুত করেন। মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার কথা ঘোষণা করেন, মুসলিম দুনিয়া দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। খিলাফতকে কেন্দ্র করে সৃষ্ঠ এ বিরোধে মুসলমানদের মধ্যে খারিজী ও শীয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো। ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মধ্যে সিফফীনের রণাঙ্গনে এক তুমুল যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যুদ্ধে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বিজয় সুনিশ্চিত ভেবে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া সেনাপতি আমর বিন আসের পরামর্শে বর্শার অগ্রভাগে পবিত্র কুরআন শরীফ বেঁধে সন্ধি প্রার্থনা করে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব করেন এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট কুরআনের বিধানানুসারে শালিসী দ্বারা বিরোধ মিমাংসা করার প্রস্তাব করেন। হযরত আলী এ কূটনৈতিক চাল বুঝতে পারা সত্ত্বেও প্রস্তাবে সম্মত হন। কারণ তাঁরা রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিলেন না। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সমর্থকদের মধ্যে একদল চরমপন্থী এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করল ও প্রতিবাদ জানাল। তারা উমাইয়াদের ইসলামের শত্রু মনে করে তাদের ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু হযরত আলী উমাইয়াদের ধ্বংসের পরিবর্তে নির্বাচিত বিচারকমন্ডলীর সহায়তায় বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করার চেষ্টা চালান। চরমপন্থীরা এতে অসন্তুষ্ট হল। তারা খিলাফতের ব্যাপারে মানুষের বিচার মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তারা শ্লোগান তুলল " لا حكما الا لله" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম নেই। অবশেষে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ৬৫৯ খৃষ্টাব্দে "দুমাতুল জুন্দল" নামক স্থানে অনুষ্ঠিত সালিসি বোর্ড এর উদ্যোগ দূর্ভাগ্যক্রমে আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পক্ষের লোকদের ভূমিকার কারনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অনুসারী চরমপন্থীরা সালিশী বোর্ডের এ পরাজয়কে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর চরম পরাজয় মনে করে তাঁর বিরুদ্ধাচরন করতে থাকে। চরমপন্থী বার হাজার সৈন্যের একটি দল হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পক্ষ ত্যাগ করে তারা কুফায় গিয়ে একটি নতুন দল গঠন করল, ইসলামের ইতিহাসে এরাই খারিজী নামে পরিচিত।[৩]

হাদীস শরীফের আলোকে বাতিল ফিরকার পরিচয় :

ইসলামের ইতিহাসে খারিজী সম্প্রদায় হচ্ছে সর্বপ্রথম বাতিল ফিরকা। সিহাহ সিত্তা তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস শরীফের গ্রন্থসমূহে খারিজীদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। পরবর্তীতে ইসলামের নামে ভ্রান্ত দল-উপদলের আক্বিদা বিশ্বাস ও চরিত্রের সাথে খারিজীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। পাঠক সমাজের জ্ঞাতার্থে খারিজী সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন বাতিল ফিরকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতিপয় হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো।

বিশ্বখ্যাত সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বোখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ডে হযরত ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি বাতিল সম্প্রদায় খারিজী ও মুলহীদের হত্যা করার বিধান সম্বলিত باب قتال الخوارج و الملحدين শিরোনামে একটি অধ্যায় উপস্থাপন করেন। উক্ত অধ্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন-

১. و كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা খারজীদেরকে আল্লাহর সৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করতেন।

২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে- عن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال سيكون في امتي اختلاف و فريقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرون القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لايرجعون حتي يرتد السهم علي فرقه هم شر الخلق و الخليقة طوبي لمن قتلهم و قتلوه يدعون الي كتاب الله و ليسوا في شئ من قاتلهم كان اولي بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق (مشكوة)

অর্থাৎ- প্রিয়নবী হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য ও ফিরকা সৃষ্টি হবে। এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে যারা সুন্দর ও ভালকথা বলবে, আর কাজ করবে মন্দ। তারা কুরআন পাঠ করবে, তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবেনা, তারা দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকারী থেকে বেরিয়ে যায়। তারা দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেনা, অথচ তীর ফিরে আসা সম্ভব। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধে তাদের দ্বারা শাহাদত বরন করবে। তারা মানুষকে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এর প্রতি আহবান করবে, অথচ তারা বিন্দুমাত্র আমার আদর্শের অনুসারী নয়। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে লড়বে সে অপারাপর উম্মতের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটতম হবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদের চিহ্ন কি ? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, অধিক মাথা মুন্ডানো।[৪] (মিশকাত শরীফ ৩০৮ পৃ.)

৩. মিশকাত শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে-

قال بينما نحن عند رسول الله ﷺ و يقسم قسما اتاه ذو الخويصرة و هو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك فمن يعدل اذ لم اعدل قد خبت و خسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر ائذن لي اضرب عنقه فقال دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلوته مع صلواتهم و صيامه مع صيامهم يقرون القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية (مشكوة ٥٣٥)

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, আমরা হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ছিলাম। তিনি গণীমতের মালপত্র বন্টন করছিলেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বনী তামীম গোত্রের যুল খোয়াইসারা নামক এক ব্যক্তি আসল, অতঃপর সে বলল হে আল্লাহর রাসুল, আপনি ইনসাফ করুন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। আমি যদি ইনসাফ না করি কে ইনসাফ করবে ? যদি আমি ইনসাফ না করতাম তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হতে। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার শিরচ্ছেদ করে ফেলব। অতঃপর হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই তার এমন অনেক অনুসারী আছে, তোমাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের নামাযকে তাদের নামাযের তুলনায় তুচ্ছ-হীন মনে করবে, অনুরূপ নিজের রোজাকে তার রোজার তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারী থেকে বেরিয়ে যায়।[৫] (মিশকাত শরীফ পৃ. ৫৩৫)

৪ . আলী (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- ياتي في اخر الزمان قوم حدثاء (احداث) الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية (يقولو ن من قول خير البرية) (يتكلمون بالحق) يمرقون من الاسلام (من الحق) كما يمرق السهم من الرمية لايجاوز ايمانهم حناجرهم فاذا لقيتموهم (فاينما لقيتموهم) فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة

অর্থাৎ শেষযুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা, বোকামী ও প্রগলভতায় পূর্ণ। মানুষ যতকথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। তারা সর্বোত্তম মানুষের কথা বলবে। তারা সত্য ন্যায়ের কথা বলবে। কিন্তু সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখাইে তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে। কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে।[৬] খারিজীদের অদূরদর্শিতা, উগ্রভাবধারা, চরমপন্থা অবলম্বন, অপরিপক্ক, বুদ্ধি অভিজ্ঞতার অভাব, জ্ঞান বুদ্ধির অহংকার তাদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছিল। বর্ণিত সূত্রে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধার্মিকতা সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। এ সকল হাদীস যদিও সার্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে। তবে সাহাবীদের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলেমগণ একমত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব ভবিষ্যৎবাণীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।[৭]

৫. খারিজীগণ জাহান্নামের কুকুর সমতুল্য। (ইবনে মাযাহ শরীফ)

৬ . তারা অধিক ইবাদত করবে। (তাবারী)।

৭. তার ঘনঘন মাথা মুন্ডাবে। (মিশকাত শরীফ)
৮. তারা সর্বদা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে। (ফতহুলবারী পঞ্চদশ খন্ড পৃ-৩২২)
৯. তারা সৃষ্টির সর্ব নিকৃষ্ট। (বোখারী শরীফ)
১০. আমার উম্মতের উত্তম ব্যক্তিগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।[৮] (মসনদে বাযযার)

খারিজীদের ভ্রান্ত আক্বিদাসমূহ :

১ খারিজীরা খোলাফায়ে রাশেদীনের দুই খলিফা হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) কে খলিফা হিসেবে স্বীকার করেনা।
২ খারিজীদের মতে, যে মুসলমান নামায পড়েনা, রোজা রাখেনা, সে কাফির।
৩ খারিজীদের মতে, একটি মাত্র অপরাধের জন্য যে কোন লোক ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।
৪ খারিজীদের মতে, খলিফা বা ইমাম ভুল করলে তাকে পদচ্যুত করতে হবে। প্রয়োজনে তাকে হত্যা করতে হবে।
৫ খারিজীরা তাদের বিরুদ্ধবাদী (যারা খারিজীয় নয়) তাদেরকে কাফির মনে করে।
৬ খারিজীদের মতে, ঋতুস্রাবকালীন মেয়েদের উপর নামাজ ফরজ।
৭ খারিজীদের মতে, যে কোন প্রকার কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি কাফির।
৮ খারিজীদের মতে, চোরের হাত বগল পর্যন্ত কর্তন করতে হবে।
৯ খারিজীদের মতে, সূরা ইউসুফ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়।
১০ খারিজীদের মতে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। যদিও কুফরী আক্বিদা পোষণ করে।[৯]
১১ খারিজীরা চরমপন্থী। তাদের মতে, পাপীকে শাস্তি প্রদান করতে হবে।
১২ খারিজীরা উমাইয়া খিলাফতের বিরোধী এবং তাদের নিন্দা ও সমালোচনা করেন।
১৩ খারিজীদের মতে, কোন মুসলিম পাপে লিপ্ত হলে সে কাফির।
১৪ খারিজীরা জিহাদকে ইসলামের মূলভিত্তি বা রুকন মনে করে, তারা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সাথে জিহাদকে ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে যুক্ত করে।[১০]
১৫ খারিজীদের মতে, খলিফা হওয়ার জন্য কোন গোত্র বা পরিবারের প্রয়োজন নেই। মুসলিম সমাজের যে কেউ খলিফা হতে পারেন।
১৬ খারিজীদের মতে, কোন প্রকার ত্রুটির কারণে খলিফা অপসারণযোগ্য ও হত্যাযোগ্য।
১৭ খারিজীরা নিজেদের বাইরে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী নয়।
১৮ খারিজীদের মতে, তারা নিজেরাই আল্লাহর পথের যাত্রী। তাদের সাথে যারা আল্লাহর পথে বের হয়না তারা কাফির।
১৯ খারিজীদের মতে, কাফিরদের সন্তানাদি তাদের পিতামাতার সাথে দোজখের আগুনে জ্বলবে।
২০ খারিজীদের মতে, কুরআন আক্ষরিক অর্থেই বুঝতে হবে, রূপক অর্থে নয়।

ইসলামের ছদ্মাবরনে বাতিল দল রাফিজী :

রাফিজী সম্প্রদায় ইসলামের মূলধারা হতে বিচ্যুত একটি বাতিল পথভ্রষ্ট সম্পদায়। চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রেযা (র.) তাঁর রচিত ঐতিহাসিক 'সালামে রেযা' কাব্যে আহলে বায়তে রসুলের মধ্যমনি হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর শানে লিখিত নিম্নোক্ত পংক্তিতে খারিজী রাফেজীদের ভ্রান্তি উল্লেখ করেন।

اولیں دافع ال رفض و خروج + چارمی رکن و ملت پہ لاکھوں سلام

ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج + حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ ১. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম রাফেজী ও খারিজীদের ভ্রান্ত আক্বিদা খন্ডন করেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তিনি শরীয়ত ও ইসলামী খিলাফতের চতুর্থ স্তম্ভ ও খলিফা। তাঁর উপর লাখো সালাম বর্ষিত হোক।
২. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাফিজী আক্বিদা তাফযিলী আক্বিদা ও খারিজীদের ভ্রান্ত আক্বিদার মূলোৎপাঠন কারী ও প্রতিরোধকারী। তিনি ইসলাম ধর্ম ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের সাহায্যকারী, তাঁর উপর লাখো সালাম বর্ষিত হোক।

রাফিজীরা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অধিক ভালবাসার দাবীদার পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী সম্প্রদায়। রাফিজীদের সম্পর্কে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন- يهلك في محبي مفرط অর্থাৎ আমার ভালবাসায় অধিক সীমা অতিক্রমকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে।[১১] হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- لايجتمع حب علي و بغض ابي بكر و عمر في قلب مومن

অর্থাৎ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতি ভালবাসা এবং হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতি বিদ্বেষ কোন মুমীনের অন্তরে একত্রিত হতে পারে না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে এক শ্রেণীর ভ্রান্ত মতবাদীরা হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতি কুটুক্তি গাল-মন্দ, সমালোচনা করার পরও নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে।[১২]

রাফিজীদের আক্বিদা হচ্ছে যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সত্য গোপন করেছেন এবং বাধ্য হয়ে খোলাফায়ে রাশেদার তিন খলিফার বায়আত মেনে নিয়েছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

রাফিজী ও খারিজী দু'দলই পথভ্রস্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত। একমাত্র ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরাই সিরাতুল মুস্তাকীম তথা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হযরত আলী (রা.) এর অতি মুহাব্বত প্রদর্শন করে সীমা অতিক্রম করে না এবং সাহাবা কেরামের প্রতি যথার্থ সম্মান ও প্রদর্শন করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- আমি ইলমের শহর, হযরত আবু বকর (রা.) এর ভিত্তি, ওমর (রা.) এর প্রাচীর, ওসমান (রা.) এর ছাদ, আলী (রা.) তার দরজা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে নববীর ভিত্তি প্রস্তর করেছিলেন প্রথম পাথর নিজে স্থাপন করেন, দ্বিতীয়টি হযরত আবু বকর, তৃতীয়টি হযরত ফারুকে আযম, চতুর্থটি হযরত ওসমান ও পঞ্চমটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম দ্বারা করিয়েছিলেন। এসব ঘটনাপ্রবাহ খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

ইসলামের এ ধারাবাহিকতা অমান্য করে রাফিজীরা ইসলাম বিচ্যুত হয়েছে। ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত তাদের বাতুলতা প্রমাণ ও মুসলিম মিল্লাতের সঠিক দিক নির্দেশনা দানে "রদ্দুর রফযা" নামক একটি তথ্যবহুল নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য কিতাব রচনা করেন।

এতে তিনি রাফিজীদের নিম্নোক্ত ভ্রান্ত আক্বিদা ও কুফরী আক্বিদাসমূহ প্রমাণ করেন।[১৩]

১. রাফিজীরা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) ও হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর খিলাফতকে অস্বীকার করেছে।
২. রাফিজীরা হুযুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া যতসব সম্মানিত আম্বিয়া কেরাম রয়েছেন, সকলের উপর হযরত আলী (রা.) ও আহলে বায়তের মর্যাদা অধিক মনে করেন।
৩. বর্তমান কুরআন শরীফ অসম্পূর্ণ। তাদের মতে, বর্তমান কুরআনের সূরা ও আয়াত আরো অধিক ছিল, যা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক কুরআন সংকলনের সময় বাদ দেয়া হয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ)
৪. রাফিজীদের মতে, কুরআন শরীফে হযরত আলী (রা.) ও আহলে বায়ত এর মর্যাদা সম্পর্কিত যতসব আয়াত ছিল হযরত ওসমান (রা.) তা বাদ দিয়েছেন।
৫. হযরাতে শাইখাইন ও অপরাপর সাহাবা কেরাম এর শানে ঘৃনা ও বিদ্বেষ পোষণ করা রাফিজীরা আবশ্যক মনে করেন।
৬. হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) ও অপরাপর সাহাবা কেরামকে তারা কাফির মনে করেন। ইত্যাদি।

রাফিজীদের উপরোক্ত আক্বিদার নিরিখে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রা.) পঞ্চাশের অধিক নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য কিতাবাদির আলোকে তাদের কুফরী প্রমাণ করেন। রাফিজীদের প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত শরয়ী বিধান কার্যকর মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

১. রাফিজীরা সর্বোতভাবে কাফির ও মুরতাদ।
২. রাফিজীদের জবেহকৃত পশু হারাম।
৩. রাফিজীদের সাথে বিবাহ বন্ধন কেবল হারামই নয়, ব্যভিচারের নামান্তর।
৪. রাফিজীদের সাথে মেলামেশা, লেনদেন, সালাম, কালাম কবীরাগুনাহ ও কঠোরতর হারাম।
৫. যে ব্যক্তি রাফিজীদের কুফরী অবগত হওয়ার পরও তাদেরকে কাফির বলতে সন্দেহ পোষণ করবে, সকল ইমামগণের ঐকামতের ভিত্তিতে সে নিজেই কাফির ও বেদ্বীন হবে।

রাফিজীদের কুফুরী প্রমাণে আ'লা হযরত (রহ.) প্রায় ১২টি কিতাব রচনা করেন। যথা-

١. ردالرفضة
٢ .شرح المطالب في مبحث ابي طالب
٣ .الادلة الطاعنة في اذان الملاعنة (১৩০৬)
٤ .جميع القران و بم غزوه بعثمان (১৩২২)
٥ . غاية التحقيق في امامة العلي و الصديق (১৩৩১)
٦ .اعتقاد الاحباب في الجميل و المصطفي و الال و الاصحاب (১৩৯৮)
٧ . بعبر الطالب في شيون ابي طالب (১২৯৪)
٨ .مطاع القمرين في ابانة سبقة العمرين (১২৯৭)
٩ . الكلام البهي في تشبه الصديق بالنبي (১২৯৭)
١٠. الزلال الانقي من بحر سبقه الاتقي (১৩০৫)
١١ . لمعة الشمعة لهدي شيعة الشنيعة (১৩১২)
١٢ . وحد المشوق بحلوة اسماء الصديق و الفاروق (১২৯৭)

ঃ.
৯

রাফিজীদের সম্পর্কে মুজতাহিদ ইমাম ও ফোকাহাদের অভিমত :
বিখ্যাত গ্রন্থ ফতহুল কদীর ১ম খন্ড ২৪৮ পৃ. আল্লামা আহমদ ছালাবী রচিত হাশিয়াবে তবীন ১ম খন্ড ১৩৫ পৃষ্টায় রাফিজী প্রসঙ্গে আলোকপাত হয়েছে-

في الروافض من فضل عليا علي الثلاثة فمبتدع و ان انكر خلافة الصديق او عمر رضي الله تعالي عنهما فهو كافر

অর্থাৎ রাফিজীদের মধ্যে যারা হযরত আলী (রা.) কে অপর তিন খলিফার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবে তারা পথভ্রষ্ট। যদি হযরত ছিদ্দিক আকবর (রা.) অথবা ফারুকে আজম (রা.) এর খিলাফত অস্বীকার করে কাফির হবে।
ইমাম কুরদরী রচিত ওয়াজিজ কিতাবের ২য় খন্ড ৩১৮ পৃষ্টায় উল্লেখ রয়েছে-

من انكر خلافة ابي بكر رضي الله تعالي عنه فهو كافر في الصحيح و من انكر خلافة عمر رضي الله تعالي عنه فهو كافر في الاصح

অর্থাৎ হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) এর খিলাফত অস্বীকারকারী কাফির। এটাই বিশুদ্ধ। হযরত ফারূক আজম (রা.) এর খিলাফত অস্বীকারকারীও কাফির। এটা বিশুদ্ধতম মত।
আজমাউল আনহার শরহে মুলতাকা আল আবহার ১ম খন্ড ১০৫ পৃষ্টায় আছে-

الرافضي ان فضل عليا فهو مبتدع و ان انكر خلافة الصديق فهو كافر

অর্থাৎ রাফিজীরা যদি হযরত আলীকে শ্রেষ্ঠত্বদানকারী হয়, তখন হবে বিদয়াতী আর যদি হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) এর খিলাফত অস্বীকারকারী হয়, তখন হবে কাফির।[১৪]
তানভীরুল আবছার গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে- كل مسلم ارتد فتوبته مقبولة الا الكافر بسب النبي روي الشيخين او احدهما

অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মত্যাগী মুরতাদের তওবা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন নবী বা হযরাতে শায়খাইন বা তাদের একজনের সাথে গোস্তাখীকারী সে কাফির, সে ব্যক্তির তওবা কবুল হবে না।
'ওয়াকিআতুল মুফতীয়ীন' কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় আছে-

يكفر اذا انكر خلافتهما او يبغضهما لمحبة النبي ﷺ لهما

যে শায়খাইনের খিলাফত অস্বীকার করবে, অথবা তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে সে কাফির। তারা তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয়পাত্র।------আল্লামা শিহাব উদ্দিন খাফাজী রচিত 'নসীমুর রিয়াজ শরহে শিফা' ইমামকাজী আয়াজ আলাইহির রহমাত এরশাদ করেন-

و من يكون يطعن في معاوية --------- فذاك من كلاب الهاوية

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) এর সমালোচনা করে, সে জাহান্নামের কুকুরসমূহের একটি কুকুর।
আল্লাহ পাক গোঁড়া ও চরমপন্থী রাফিজী খারিজীসহ তাদের পদাঙ্ক অনুসারী বর্তমান বিশ্বের ইসলাম নামধারী বিভিন্ন বাতিল সম্প্রদায়ের কুফরী আক্বিদা ও ভ্রান্তনীতি থেকে মুসলিম মিল্লাতকে হিফাজত করুন। মুসলিম উম্মাহকে সম্মিলিত কুফুরী শক্তি প্রতিরোধে পরস্পর ঐক্য সংহতি জোরদারপূর্বক আদর্শ সমুন্নত রাখার তৌফিক দান করুন। আমীন, বিহুরমাতি সৈয়্যাদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তথ্য নির্দেশ :

১. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান সম্পাদিত মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, আরাফাত পাবরিকেশন্স ১১. প্যারিদাস রোড়, বাংলাবাজার, ঢাকা।
২. মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মুঈনুদ্দিন আশরাফী- কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফিরকা, পৃ. ২৫
৩. ইসলামী বিশ্বকোষ ৯ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। পৃ. ৬৭৪-৬৭৬
৪.আল্লামা আরশাদ আলকাদেরী, তাবলীগ জামাত, প্রকাশনা মাকতাবা জামে নুর দিল্লী। ভারত পৃ. ১৯২, ১৯৩
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৬. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (২৫৬ হিঃ) বুখারী আসসহীহ ৩/১৩২১ বৈরুত দারু কাসীর, ইয়ামাছ, ২য় প্রকাশ ১৯৮৭
৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ ২য় সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬, প্রকাশনায় ইফাবা
৮. কাজী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দিন আশরাফী, কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফিরকা, পৃ. ৭২,৭৩, ১৪
৯. ইমাম ইবনে হাজর আসকালানি, ফতহুল বারী শরহে বোখারী, পঞ্চদশ খন্ড। প. ৩১২
১০. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, প্রকাশক, মাওলা ব্রাদার্স। পৃ. ৬৬
১১. বি.এম. জাকির হোসেন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম পর্ব, পৃ. ২৬২
১২. সুফী মুহাম্মদ আউয়াল কাদরী রিজভী 'সুহনে রেযা, প্রকাশনায় ফারুকীয়া বুক ডিপো, দিল্লী ,ভারত। পৃ. ৩৭৩-৩৭৬
১৩. আবদুস সাত্তার হামদানী, ইমাম আহমদ রেযা এক মজলুম মুফাক্কির, প্রকাশনায় রুমী পাবলিকেশন্স এন্ড প্রিন্টার্স, লাহোর, পৃ. ১৩৪-১৩৮
১৪. ইমাম আহমদ রেযা, রদ্দুর রফযা, প্রকাশনায় : জমিয়তে এশায়েত আহলে সুন্নাত পাকিস্তান, করাচি-৭৪০০০, পৃ. ৮-১২

বুস্তানে রিসালতের কুসুম কলি ঃ আর ফুটন্ত দুটি পুষ্পের কথা

মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন *

"কিয়া বাতে রেযা উস্ চেমনিস্তানে করম কি, যাহ্‌রা হায় কলী জিস্‌মে হুসাইন আওর হাসান ফুল"

আহলে বাইতে রাসূলের অদ্বিতীয় প্রেমিক আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান ফাজেলে বেরেলভীর নিবেদিত পংক্তি দিয়েই লেখার সূচনা। পৃথিবীর বুকে কত বাগান ছিল, আছে এবং হবে আবার বিলীন হয়ে গেছে, হচ্ছে এবং হয়ে যাবে। সব বাগানের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবে সবার থাকে। এসব বাগান আমাদেরকে সাময়িক বিনোদনে উদ্ভাসিত করে। আমি কিন্তু সেসব বাগানের কথা আজ বলছিনা, বলছি এমন একটি বাগানের কথা যা ছিল, আছে এবং কিয়ামতের পরও চিরকাল ধরে থাকবে। এ বাগান থেকে সুবাস ছড়ানো হবে নিরন্তর সব শ্রেণীর কাছে। পবিত্র এ বাগান, পবিত্র তার পত্র-পল্লব আর কুসুম-কলি, পুষ্পরাজি সুশোভিত। দান তাদের অবারিত ঝর্ণাধারার মতো প্রবাহিত। আমি বাগে রিসালতের কলি, বেহেশতের রমনীদের সর্দারনী আর পুষ্পযুগল বেহেশতের যুবকদের সর্দারদের কথা বলছি।

এবার মূল আলোচনা শুরু করা যাক। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের করুনার আধার, উম্মতের কান্ডারী নবীয়ে দু'জাহাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর আবৃতাবস্থায় বসে আছেন। এমন সময় নবী তনয়া ফাতিমা যাহরা এগিয়ে এলে নবীজি তাঁকে চাদরের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। একটু পরে আগমন ঘটল আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)'র। নবীজি তাঁকেও শামিল করলেন চাঁদরের অভ্যন্তরে। পর্যায়ক্রমে দুই আদরের দৌহিত্রও এগিয়ে এসে চাদরে ঢুকে গেলেন।[১] ঘনিষ্ট এ চারজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘোষণা করলেন- اللهم هولاء اهل بيتي و حاصتي فاذهب عنهم الرجس

আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত এবং বিশেষ ঘনিষ্টজন। আপনি এদেরকে অপবিত্রতামুক্ত করুন।[২]
অতঃপর পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয় ঃ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا
অর্থাৎ হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে । (সূরা আযহাব- ৩৩ নং আয়াত)
এভাবে পবিত্র কুরআনে আরো বহু আয়াতে আহলে বাইতের শান-মান বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে-
مرج البحرين يلتقيان ـ بينهما برزخ لايبغيان অর্থাৎ তিনি দুটি দরিয়া প্রবাহিত করেন যারা পরস্পর মিলিত হয়ে চলে; উভয়ের মধ্যখানে রয়েছে একটি পর্দা একটি অপরটির উপর প্রাধান্য লাভ করে না।[৩]
হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন- في قوله تعالي مرج البحرين يلتقيان قال هو علي و فاطمة و يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان قال الحسن و الحسين

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার এই বাণীতে দু'দরিয়া দ্বারা হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.) কে বুঝানো হয়েছে এবং উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল অর্থাৎ ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।[৪]
উল্লেখ্য যে, এখানে দুই দরিয়ার একটি হল নবুয়তের দরিয়া অপরটি বেলায়তের দরিয়া। কারন, মা ফাতিমাতুয যাহরার ব্যাপারে নবীজি নিজেই এরশাদ করেছেন- فاطمة بضعة مني অর্থাৎ ফাতেমা আমার অংশ। অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, যে আমার ফাতেমাকে কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দেয় আর যে তাকে আনন্দ দেয় সে আমাকেই আনন্দ দেয়। কেয়ামত দিবসে মানব জাতির সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আমার বংশধরের আত্মীয়তা, শ্বশুর ও জামাতার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত আমার বংশলতিকার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।[৫]
বক্ষমান প্রবন্ধে আমি একটি কলি এবং তার প্রস্ফুটিত দুই পুষ্পের কথা বলতে প্রিয় নবীর কলিজার টুকরা বেহেশতের রমনীদের সর্দারনী মা ফাতেমাতুয যাহরা (রা.) এবং পুষ্পযুগল বেহেশতের যুবকদের সর্দার ইমামাঈনে করীমাঈন হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) কেই বুঝাতে চেয়েছি, যারা সত্যিই বাগে রিসালতের পুষ্পকলি ও ফুল। ফাতেমাতুয যাহরা হলেন নবীজির বংশ বিস্তারের উৎস। তাঁরই পবিত্র গর্ভে ইমাম হাসান-হোসাইনের জন্ম এবং এঁরাই হলেন আহলে বাইতে রাসূলের মূলধারা আর সেই আহলে বাইতই পরবর্তী উম্মতের অনুসরণীয়, অনুকরণীয় আদর্শ। যেমন হাদীস শরীফে নবীজি ইরশাদ করেন- يا ايها الناس اني تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله و عترتي و اهل بيتي
অর্থাৎ হে মানবজাতি! আমি তোমাদের নিকট এমন এক বস্তু রেখে যাচ্ছি, এটা যদি তোমরা আকড়ে ধর তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তন্মধ্যে একটা হল- আল্লাহর কিতাব, অপরটি হল- আমার আহলে বাইত।[৬]
অপর হাদীসে নবীজি ইরশাদ করেন- يا فاطمة ان الله عز و جل يغضب بغضبك و يرضي لرضائك
অর্থাৎ হে ফাতেমা! আল্লাহ তায়ালা তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট হন আর তোমার সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট হন।[৭]

* প্রভাষক (আরবী), কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে নবীজি ইরশাদ করেন- হে ফাতেমা! আল্লাহ তায়ালা না তোমাকে আযাব দেবেন আর না তোমার বংশধরকে।[৮]

আহলে বাইতের অন্যতম জোতিষ্ক ইমাম হাসান (রা.)

পাক-পাঞ্জাতনের অন্যতম সদস্য, প্রিয়নবীর আদরের দৌহিত্র, মাওলা আলীর কলিজার টুকরা, মা ফাতিমার নয়নের মনি ইমাম হাসান (রা.) হিজরী তৃতীয় সনের ১৫ রমজান মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর হতে নবীজি তাঁকে অত্যন্ত আদর করতেন। সব সময় নিজের কাছেই রাখতে ভালবাসতেন। একদা মিম্বরে আরোহন করে ইরশাদ করেছিলেন- ان ابني هذا سيد يصلح الله علي يديه بين فئتين অর্থাৎ আমার এই দৌহিত্র হল সৈয়দ। আল্লাহ তায়ালা তার দ্বারা দু'টি বড় দলের মধ্যখানে চুক্তি সম্পাদিত করবেন।[৯]

ইমাম হাসান (রা.) এর জন্মের পর হযরত জিব্রাঈল (আ.) নবীজির হাতে একটি বেহেশতী সাদা রেশমী কাপড় পেশ করলেন যাতে নাম লেখা ছিল 'হাসান'। তাই বুঝা যায়, তাঁর নাম বেহেশতের মধ্যেই হাসান রাখা হয়েছে।

জন্মের পর শিশু হাসানকে নবীজির কোলে দেয়া হলে তিনি তাঁর ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামত পাঠ করলেন।[১০] আর নিজের জিহ্বা মোবারক দৌহিত্রের মুখে লাগিয়ে দিলে তিনি চুষতে থাকেন আর এদিকে নবী দোয়া করলেন- আয় আল্লাহ! আপনি আমার এই সন্তানকে এবং তাঁর ভবিষ্যত বংশধরকে হেফাযতে রাখুন।

অধিকন্তু নবীজি ইরশাদ করেন- কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি ঐ সন্তানের ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত পাঠ করা হয়, ঐ সন্তান মৃগী রোগ থেকে মুক্ত থাকবে।[১১]

ইমাম হাসান (রা.) এর বয়স যখন সাত দিন নবীজি স্বয়ং আকীকা করলেন আর মাথা মুন্ডানোর পর চুলের ওজন পরিমান রূপা সদকা করেছিলেন।[১২]

নবীজি ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) কে ভালবাসতেন আর বলতেন, আমি এরা দুইজনেক ভালবাসি, যে এদেরকে ভালবাসে সে যেন আমাকে ভালবাসে।

একদা নবীজি ইমাম হাসানকে কাঁধে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। জনৈক সাহাবী এই দৃশ্য দেখে বললেন, শাহজাদা! তোমার সওয়ারী কতইনা উত্তম! তখন নবীজি বললেন যে, তুমি এই কথা না বলে বরং বলো আরোহী কতইনা উত্তম।[১৩]

একদা নবীজি মসজিদের মিম্বরে দাড়িয়ে খোৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় দূর থেকে দেখা গেল শিশু হাসান হাঁটার সময় কাপড়ে জড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন। তৎক্ষনাৎ নবীজি খোৎবা ছেড়ে দিয়ে মিম্বর থেকে নেমে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। আর ইরশাদ করলেন- الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما অর্থাৎ হাসান-হোসাইন বেহেশতের যুবকদের সর্দার আর তাঁদের পিতা তাঁদের চাইতে উত্তম।[১৪]

ইমাম হাসান (রা.) শৈশবে নানাজানের উপর যে ওহী নাযিল হত তা হুবহু মুখস্থ করে আম্মাজানের কাছে গিয়ে পাঠ করে শুনাতেন।[১৫]

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, ইমাম হাসান (রা.) এর শরীরের অর্ধেক তথা উপরের অংশ নবীজির শরীর মোবারকের সাদৃশ ছিল আর নিচের অংশ মাওলা আলী (রা.) এর সাদৃশ ছিল।

অপর এক বর্ণনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তায়ালা হাসানের মধ্যে নেতৃত্ব ও গম্ভীরতা আর হোসাইনের মধ্যে সাহস ও নির্ভীকতা প্রদান করেছেন।[১৬]

ইমাম হাসান (রা.) অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। সারারাত জেগে জেগে মহান আল্লাহর ইবাদত করতেন আর কান্নাকাটি করতেন। বৎসরের অধিকাংশ সময় রোজা রাখতেন। কমপক্ষে পচিশবার পায়ে হেঁটে হজ্ব করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অসীম সাহসিকতা দেখে সবাই অবাক হয়ে যেতেন। কখনো যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসেননি।[১৭]

ক্ষমাপরায়ন ঃ ইমাম হাসান (রা.) ছিলেন অসাধারণ ক্ষমাপরায়ন। তার উদারতা, দানশীলতা ও ক্ষমাপরায়নতা বিশ্বের বুকে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

একদা ইমাম নিজ বাড়ীতে কতিপয় মেহমানসহ খাবার খাচ্ছিলেন। মেহমানদের প্রতি তদারকী ও খাবার পরিবেশনের জন্য স্বীয় গোলামকে নির্দেশ দিলেন। আদেশ মতে গোলাম তরকারি নিয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তরকারির বাটি হাত ফসকে নিচে পড়ে গিয়ে ঝোল ছিটকে পড়লো, এমনকি ইমামের কাপড়েও কিছু অংশ গিয়ে লাগল। এই দৃশ্য দেখে গোলাম সন্ত্রস্থ চেহারায় ইমামের দিকে তাকিয়ে ঝটপট করে পবিত্র কুরআনের আয়াতাংশ পড়ে দিল- و الكاظمين الغيظ (রাগ সম্বরনকারী) এই আয়াত শুনে ইমাম বললেন, আমি রাগ সম্বরন করলাম। অতঃপর পড়ল- و العافين عن الناس (লোকদেরকে ক্ষমাকারী) তিনি উত্তরে বললেন, আমি ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর গোলাম পড়ল- و الله يحب المحسنين (মানুষের উপর অনুগ্রহকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন।) এ আয়াতাংশ শুনে ইমাম বললেন- যাও, আজ তোমাকে আযাদ করে দিলাম।[১৮]

ইমামের প্রতি আমিরে মুআবিয়া (রা.) এর শ্রদ্ধা

হযরত আমিরে মুয়াবিয়া (রা.) এর শাসনামলে ইমাম হাসান (রা.) এর জন্য বার্ষিক এক লক্ষ দেরহাম সম্মানী প্রদান করা হত। কোন এক বৎসর সম্মানী প্রদানে বিলম্ব হলে ইমাম হাসান (রা.) আর্থিক টানাপোড়েনে পড়ে যান। তিনি চিন্তা করলেন, বিষয়টি আমিরে মুয়াবিয়াব বরাবরে জানানো প্রয়োজন। এক পর্যায়ে লিখার জন্য কলম হাতে নিয়ে আবার কেন জানি বিরত হয়ে গেলেন। ঐ রাত্রেই স্বপ্নে নবীজির সাথে সাক্ষাৎ হয়। নবীজি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, দোয়াত-কলম হাতে নিয়েছ তোমার অভাবের কথা জানানোর উদ্দেশ্যে? জবাবে ইমাম বললেন, নানাজান! কষ্টে অসহ্য হয়ে অভিযোগ করতে অনেকটা বাধা হয়েছিলাম। অতঃপর নবীজি তাকে একটা দুআ শিখিয়ে দিলেন- اللهم اقذف في قلبي رجائك

اقطع رجائي عمن سواك حتي لارجو احدا غيرك اللهم و ما ضعفت عنه و قوتي و قصرعنه عملي و لم تنته اليه رغبتي

و لم تبلغه مسئلتي و لم يجر علي لساني مما اعطيت من الاولين و الاخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين

ইমাম হাসান (রা.) বলেন, এই ঘটনার পর এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আমিরে মুয়াবিয়া (রা.) আমার নিকট একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন। আমি আল্লাহর প্রশংসা করলাম আর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। অতঃপর স্বপ্নে নবীজির সাথে আবারও সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, ওহে আমার হাসান! কী অবস্থা? আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া। অতঃপর তিনি বললেন, মহান আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে তার কাজ এভাবেই হয়ে যায়।[১৯]

উল্লেখ্য, আমিরে মুয়াবিয়া (রা.) ইমাম হাসান (রা.) কে এত বেশি সম্মান করতেন যে, সেই এক বৎসর সম্মানী প্রদান করতে বিলম্ব হওয়ার কারনে পরবর্তীতে আরো পঞ্চাশ হাজার যোগ করে বার্ষিক সম্মানী নির্ধারণ করেছিলেন দেড় লাখ দিরহাম।

বেহেশতের ফল ঃ ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) শৈশবকালে দু'টি কাগজে কিছু লিখে একে অপরকে বলতে লাগলেন, আমার লেখা সুন্দর হয়েছে। চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য তাঁরা উভয়ে আব্বাজান হযরত মাওলা আলী (রা.) এর কাছে এসে একজন বলেন- আমার লেখা সুন্দর, অপরজন বলেন- আমার লেখা সুন্দর। তাঁদের উভয়ের আবেগ দেখে কাউকে খুশী করতে গেলে অপরজন মনক্ষুন্ন হবে এই আশংকায় মাওলা আলী (রা.) বললেন, তোমাদের এই মুকাদ্দামাটি তোমাদের আম্মাজানের কাছে নিয়ে যাও। আম্মাজানও একই জবাব দিলেন, তোমরা বরং তোমাদের নানাজানের কাছে যাও। শেষ পর্যন্ত দুই ভাই নানাজান নবী পাক সরদারে দু'জাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কাছে এসে হাজির। নানাজান তাদের উভয়ের দাবী শুনে বললেন, আসমান হতে জিব্রাঈল (আ.) এসেই তোমাদের ফায়সালা করবেন। এদিকে হযরত জিব্রাঈল (আ.) হাজির হয়ে বলে ওঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিষয়টি বড় কঠিন। আমি জিব্রাঈলের সাধ্যের বাইরে। বরং স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই বিষয়টির চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল (আ.) কে নির্দেশ দিলেন বেহেশত হতে একটি ফল নিয়ে এস আর ঐ ফলখানা হাসান-হোসাইন উভয়ের লিখিত কাগজের উপর ছেড়ে দাও। এরপর অবলোকন কর যার লিখার উপর গিয়ে ঐ বেহেশতী ফল দাড়িয়ে যাবে ঐ লিখাটাই সুন্দর বলে প্রমাণিত হবে। আদেশ মতে হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাই করলেন। আর যেইমাত্র বেহেশতী ফল উভয়ের কাগজের উপর ছেড়ে দিল অমনি দেখা গেল, ফলটি দুই টুকরো হয়ে এক টুকরো গিয়ে দাড়িয়ে গেল ইমাম হাসান (রা.) এর কাগজের উপর, অপর টুকরো দাড়িয়ে গেল ইমাম হোসাইনের (রা.) কাগজে। এতে করে ফায়সালা হয়ে গেল, উভয়ের লেখাই সুন্দর।[২০]

এখানে লক্ষনীয় হল, এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ চাননি যে, দু'ভাইয়ের কেউ কষ্ট পাক বরং উভয়েই সন্তুষ্ট থাকুক। ঠিক অদ্রুপ তাদের মধ্যে একজনের লেখা সুন্দর বললে অপরজন মন ছোট করবে সেটি স্বয়ং আল্লাহ পাকও চাননি।

ইমাম বুখারী (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন সদকার খেজুর আনা হল আর খেজুরের স্তুপের উপর শিশু অবস্থায় ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) খেলাধুলা করছিলেন। খেলতে খেলতে ইমাম হাসান একটা খেজুর মুখে দিয়ে দিলে নবীজি তা দেখে বললেন, হে হাসান! তুমি কি জাননা আমাদের উপর সদকা হারাম? আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, শিশুকালেও ইমাম হাসানকে সদকার খেজুর খেতে নিষেধ করে বললেন, যা মুখে দিয়েছ তাও ফেলে দাও। ফেলে দাও। তুমি জাননা, আমাদের উপর সদকার বস্তু খাওয়া হারাম।[২১]

উল্লেখ্য, আওলাদে রাসূল তথা সৈয়দ বংশের লোকেরা গরীব হলেও সদকা, ফিৎরা, যাকাতের টাকা খাওয়া বৈধ নয়।

একদা হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (রা.) ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) কে নিয়ে হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার খেদমতে হাজির হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদেরকে কিছু দান করুন। হুজুর ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ নিশ্চয় দান করবো। আমি আমার জ্ঞান ও খোদাভীতি হাসানকে আর বীরত্ব ও করুণা হোসাইনকে দান করলাম।[২২]

ইমাম হাসান (রা.) ভীষণ উদার ও দানশীল ছিলেন। কেউ কোন সাহায্য চাইলে কোন সময় তিনি সাহায্য প্রার্থীকে ফেরৎ দিতেন না। আশে-পাশের গরীব দুঃখী অভাবগ্রস্থদের যথাসাধ্য সব সময় সাহায্য করতেন। একদা বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ৫০ হাজার দিরহাম এবং প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন আর দানকৃত মালামাল বহন করার জন্য একজন মজুর ঠিক করে সেই মজুরকে মজুরী বাবদ নিজের পরনের জামা দান করে দিয়েছিলেন।[২৩]

একবার হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন এবং আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) হজ্বব্রত পালনে যাচ্ছিলেন। যে উটটির উপর তাঁদের মাল-পত্র এবং খাদ্য দ্রব্য ছিল সেটা তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পথিমধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক বুড়ির কুঁড়ে ঘরে গিয়ে উঠলেন এবং বুড়িকে বললেন, পান করার মত কিছু আছে কি? বুড়ি বলল, হ্যাঁ নিশ্চয় আছে। এই বলে বুড়ি গৃহপালিত ছাগীর দুধ দোহন করে তাঁদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বুড়িকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, খাবারের কোন কিছু আছে কি? সে বলল, খাবার তৈরী করা নেই। তবে ইচ্ছা করলে আপনারা ছাগীটা জবেহ্ করে খেয়ে নিতে পারেন। বুড়ির অনুমতি সাপেক্ষে তাঁরা ছাগীটা জবেহ্ করে তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন আর বিদায় বেলায় বুড়িকে বললেন, আমরা কুরাইশ বংশের লোক, মদীনা মুনাওয়ারায় থাকি। সময়মত আমাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য দাওয়াত রইল। ইনশাআল্লাহ, আপনার এই এহছানের বদলা দিয়ে দিব। রাত্রে বুড়ির স্বামী ঘরে ফিরে এসে বুড়ির কথাবার্তা ও কর্মকান্ড শুনে অগ্নিশর্মা। বলল, আমাদের একমাত্র সম্বল ছাগীটা তুমি এমন লোকদেরকে খাইয়ে দিলে যাদেরকে তুমি চিননা। কিছুদিন পর বুড়াবুড়ি উভয়ে অভাবের তাড়নায় ঘুরতে ঘুরতে মদীনা শরীফ এসে পৌছল আর লক্ষাহীনভাবে রাস্তায় অলিতে গলিতে ঘুরাফেরা অবস্থায় ইমাম হাসান (রা.) প্রথম দেখাতেই বুড়িকে চিনে ফেললেন। তিনি ধীরগতিতে বুড়ির নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে চিন? বুড়ি বললো- না। তিনি পরিচয় দিলেন, আমি সে ব্যক্তি যাকে সেদিন তোমার একমাত্র ছাগীটা জবেহ্ করে মেহমানদারী করেছিলে। এবার বুড়ি গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে বলল, হ্যাঁ এবার চিনলাম। হ্যাঁ আপনি আমার কুঁড়ে ঘরে গিয়েছিলেন। ইমাম হাসান (রা.) এক হাজার ছাগল এবং একহাজার দিনার বুড়িকে উপহার দিয়ে ইমাম হুসাইন (রা.) এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম হুসাইন (রা.)ও বুড়িকে দেখে চিনে ফেললেন আর জিজ্ঞাসা করলেন ভাইজান কি দিয়েছেন? বুড়ি এক হাজার ছাগল আর একহাজার দিনারের কথা বলল। জবাব শুনে ইমাম হুসাইন (রা.)ও এক হাজার ছাগল ও এক হাজার দিনার উপহার দিয়ে বুড়িকে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা.) এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইমাম হাসান-হুসাইন তোমাকে কি দিয়েছেন? বুড়ি জবাবে দুই হাজার ছাগল ও দুই হাজার দিনারের কথা বলল। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফরও দুই হাজার ছাগল ও দুই হাজার দিনার উপহার দিলে বুড়ি সর্বমোট চার হাজার ছাগল ও চার হাজার দিনার নিয়ে স্বামীর কাছে হাজির হয়ে বললো, এইসব উপহার ঐ সমস্ত মেহমান দিয়েছেন, যাদেরকে আমি সেদিন ছাগল জবেহ করে মেহমানদারী করেছিলাম।[২৪] আহলে বাইতের দানশীলতার দৃষ্টান্ত বিরল।

ইমাম হাসান (রা.) এর খেলাফত লাভ ঃ রাসূলের বাণী- الخلافة من بعدي ثلاثون سنة (আমার পর খেলাফত ব্যবস্থা ত্রিশ বৎসর থাকবে) এর মর্ম অনুসারে ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয় ৪১ হিজরী সনের ৯ই রবিউল আউয়াল। খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) আততায়ীর হামলায় শাহাদত বরণ করেন ৪০ হিজরী সনের ২০ রমজান। আর ২২ রমজান ইমাম হাসান (রা.) খিলাফতের মসনদ লাভ করে পরবর্তী ৪১ হিজরী সনের ৯ই রবিউল আউয়াল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাই তাঁকে ইসলামের ইতিহাসে পঞ্চম খলিফা হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়। আর নবীজির হাদীসের মর্ম খেলাফতের সময়কাল ত্রিশ বৎসর কথাটি ইমাম হাসান (রা.) এর শাসনামলের সমাপ্তির মাধ্যমে সত্যায়িত হয়। মাত্র ছয় মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন শেষে নিজেই সে দায়িত্ব হতে সরে দাঁড়ান।[২৫]

ইনতেকালের পূর্বাভাষ ঃ ইমাম হাসান (রা.) একরাত্রে স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে قل هو الله احد লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ স্বপ্ন তাঁর পরিবার-পরিজনেরা শুনে আনন্দিত হলেন। কিন্তু স্বপ্নটি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা.) এর কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, যদি ইমাম বাস্তবিকই সেই রকম স্বপ্ন দেখে থাকেন তাহলে এর ব্যাখ্যা হল- তিনি এই দুনিয়াতে বেশিদিন থাকবেন না। তাঁর আয়ুকাল ফুরিয়ে এসেছে। স্বপ্নের তা'বীর সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। এর কিছুদিন পরে তিনি শাহাদত বরণ করেন।[২৬]

ইমাম হাসান এর ইনতেকাল ছিল শাহাদতের ইনতিকাল। কারণ, দুশমনেরা তাঁকে ষড়যন্ত্র করে বিষপান করালে তাঁর পাতলা পায়খানা ও বমি শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাঁর পেটের নাড়ি-বুড়ি, কলিজা ইত্যাদি টুকরো টুকরো হয়ে বের হয়ে আসে। এ অবস্থায় তিনি চল্লিশদিন অতি কষ্টের মাধ্যমে অতিবাহিত করেন। ইনতেকালের পূর্ব মুহূর্তে তাঁর ছোট ভাই ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি তার প্রতিশোধ নেব।

ইমাম হাসান (রা.) বললেন, যার প্রতি আমার সন্দেহ সে যদি বাস্তবিকপক্ষে দোষী হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই তার প্রতিশোধ নিবেন। আর যদি সে প্রকৃত দোষী না হয়, তাহলে আমি চাইনা একজন নিরপরাধ লোক শাস্তি পাক।[২৭]

পরিশেষে ৫০ হিজরী সনের ২৮ সফর মুমূর্ষ অবস্থায় ভাই ইমাম হুসাইন এবং বোন জয়নব ও কুলসুমকে ডেকে কিছু অসিয়ত করলেন এবং চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে নিলেন। কিছুক্ষন পর চক্ষুদ্বয় আবার খুলে বললেন, "ভাই হুসাইন! আমার সন্তানদেরকে তোমার হাতে সোপর্দ করলাম" এই বলে চিরদিনের জন্য তাঁর চক্ষুদ্বয় বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর শাহাদতের পর ইমাম হুসাইন (রা.) গোসল দিয়ে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন। জানা যায়, ইমামতি ইমাম হুসাইন (রা.) করেছিলেন। অতঃপর তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

ইমাম হুসাইন (রা.) ঃ বুস্তানে রিসালতের কুসুমকলি ফাতেমা জননীর আরেক ফুটন্ত গোলাপের নাম "হুসাইন"। পারিবারিক নাম আবু আবদুল্লাহ, উপাধি সাইয়্যিদ সিবতে আসগর শহীদে আকবর, সাইয়িদুশ শোহাদা।

জন্ম ঃ হিজরী চতুর্থ সনের ৩রা শাবান মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চাচা হযরত আব্বাস (রা.) এর বিবি উম্মুল ফজল (রা.) একরাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে নবীজির কাছে এসে বর্ণনা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখলাম, আপনার পবিত্র নূরানী শরীর মোবারকের এক টুকরো মাংস বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার কোলে এসে পড়ল। এই ধরনের ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে আমি এখন ভীতসন্ত্রস্থ। স্বপ্ন শুনে নবীজি মুচকি হেসে বললেন, আপনি ভাল স্বপ্নইতো দেখেছেন। ভয় পাওয়ার কোন কারন নেই। এবার শুনে নিন আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। ইনশাআল্লাহ কয়েকদিন পরই আমার ফাতিমার ঘরে একটা পুত্র সন্তান জন্ম নেবে আর সেই সন্তানকে সর্বপ্রথম আপনার কোলেই দেয়া হবে। নবীজির ভবিষ্যতবাণী মতে কয়েকদিন পর ইমাম হুসাইন (রা.) এর জন্ম হয় এবং বরাবরই সর্বপ্রথম তাঁকে হযরত উম্মুল ফজল (রা.) এর কোলে দেয়া হয়।[২৯]

উম্মুল ফজল (রা.) একদা শিশু হুসাইনকে কোলে করে নিয়ে এসে নবীজির কোলে দিলেন। নবীজি আদরের দৌহিত্রকে কোলে নিয়ে অনেক আদর করলেন। উম্মুল ফজল বলেন, আমি লক্ষ্য করলাম নবীজির চক্ষু দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনন্দের এই মুহূর্তে আপনার চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে ব্যাপারটি কি? জবাবে নবীজি ইরশাদ করলেন- ان امتي ستقتل ابني هذا (আমার উম্মতেরাই আমার এই শিশুকে অচিরেই শহীদ করবে)[৩০]। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম, আপনার আওলাদকে কতল করবে? নবীজি বললেন, হ্যাঁ। জিব্রাঈল (আঃ) এসে আমাকে এইমাত্র সংবাদটা দিয়ে গেলেন আর তাঁর শাহাদতস্থলের মাটিও আমাকে এনে দিয়েছেন। কিন্তু সাবধান! এই শাহাদতের সংবাদ কখনই ফাতেমাকে দিবেন না। কারন সে এ সংবাদ শুনলেই ভীষণভাবে বিচলিত হবে।

নবীজির অন্তরে ইমাম হুসাইনের মুহব্বত

হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন উভয়ে রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। নবীজি ইরশাদ করেন- ان الحسن و الحسين هما ريحاني من الدنيا অর্থাৎ নিশ্চয়ই হাসান ও হুসাইন দুনিয়াতে আমার দু'টি ফুল।[৩১] নবীজি আপন সন্তান থেকে তাঁদেরকে বেশি ভালবাসতেন। আল্লামা জামী (রা.) বর্ণনা করেন- একদা সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হুসাইন (রা.) কে ডানে এবং স্বীয় সাহেবজাদা হযরত ইব্রাহীম (রা.) কে বামে বসিয়ে আদর করছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিব্রাঈল (আ.) উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা এদের দুজনকে আপনার কাছে থাকতে দিবেন না। ওনাদের একজনকে ফিরিয়ে নেবেন। অতএব, আপনি এদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পছন্দ করুন। নবীজি বললেন, যদি আপন সন্তান ইব্রাহীমকে নিয়ে যায় তাহলে আমিই কষ্ট পাব। কিন্তু যদি হুসাইনকে নিয়ে যায় তাহলে তাঁর বিরহে তাঁর মা ফাতিমা ও বাবা আলী খুবই কষ্ট পাবে, আমার মনটাও ক্ষুন্ন হবে। সুতরাং কষ্ট পেলে কেবল আমিই পাই, তবুও আমার আলী ও ফাতেমা যেন কষ্ট না পায়। এ ঘটনার তিনদিন পর ইব্রাহীম (রা.) ইনতেকাল করেন। এরপর থেকে ইমাম হুসাইন যখনই নবীজির কাছে আসতেন, তখনই কোলে তুলে নিতেন, কপালে চুমু দিতেন আর বলতেন, আমি হুসাইনের জন্য আমার সন্তান ইব্রাহীমকে কুরবানী দিয়েছি।[৩২]

নবীজি আরো ইরশাদ করেন- حسين مني و انا من حسين احب الله من احب حسينا (হুসাইন আমার আর আমি হুসাইনের; যে হুসাইনকে ভালবাসবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালবাসবে)[৩৩] হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমি নবীজির খিদমতে হাজির হয়ে দেখলাম, তিনি কম্বল গায়ে দিয়ে বসে আছেন। আমার অনুভব হলো, নবীজির কম্বলের ভিতরে আরো কিছু রয়েছে। আমি আবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-বাবা আপনার কদমে উৎসর্গীত হোক, আমি কি জানতে পারি কম্বলের ভিতরে কী রয়েছে? নবীজি কম্বল উঠিয়ে দিলে দেখলাম- দুপার্শ্বে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রা.) বসে আছেন। অতঃপর নবীজি দুআ করলেন- اللهم اني احبهما فاحبهما و احب من يحبهما

(আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালবাসি, তুমিও ভালবাস। আর যারা এদেরকে ভালবাসে তাদেরকেও তুমি ভালবাস)৩৪ একদা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে নামাজের ইমামতি করছিলেন। এমতাবস্থায় নবীজি সিজদায় গেলেন, এদিকে ঘর হতে বের হয়ে শিশু হুসাইন (রাঃ) নবীজির গর্দানের উপর উঠে বসে গেলেন। এদিকে নবীজি গর্দানের উপর হুসাইন আরোহন করেছেন বুঝতে পেরে সিজদা লম্বা করলেন। পরিশেষে, হুসাইন স্বেচ্ছায় নেমে গেলে নবীজি সিজদা হতে মাথা মোবারক উঠালেন। নামাজ শেষে উপস্থিত সাহাবারা জানতে চাইলেন, এয়া রাসুলাল্লাহ! নামাজে সিজদা দীর্ঘ করার ব্যাপারে কি কোন ওহী নাযিল হয়েছে? নতুবা আজকে সিজদা এত দীর্ঘ করার কারণটা কি দরকারে আমাদেরকে বলবেন কি? নবীজি জবাব দিলেন ওসব কিছু না বরং আমরা যখন সিজদায় গিয়েছিলাম তখন হুসাইন এসে আমার গর্দানের উপর এসে বসে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় মাথা উঠালে হুসাইন পড়ে যাবে তাই স্বেচ্ছায় নামা পর্যন্ত সিজদা দীর্ঘ করলাম।৩৫

শৈশবকাল : ইমাম হুসাইন আল্লাহর নিকট কত প্রিয় ছিলেন তার দৃষ্টান্ত অনেক। একদা হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জনৈক সাহাবী একটি হরিণির বাচ্চা শিকার করে ঐ বাচ্চাটি নবীজির দরবারে হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে আসলে নবীজি হাদিয়াটি কবুল করে ইমাম হাসান (রা.) কে দিয়ে দিলেন। ইমাম হাসান (রা.) ঐ হরিণির বাচ্চাটি নিয়ে খেলতে খেলতে ঘরে পৌছলেন। ইমাম হুসাইন বাচ্চাটি দেখে বললেন, ভাইজান! হরিণির বাচ্চাটি আমাকে দাও। বড় ভাই বললেন, যাও তুমিও নানাজানের কাছ থেকে একটা নিয়ে এস। ইমাম হুসাইন (রা.) নানাজানের খিদমতে হাজির হয়ে আবেদন করলেন- নানাজান! আমারও একটি হরিণির বাচ্চা লাগবে। আর এই আবেদন করতে করতে এক পর্যায়ে কেঁদে ফেললেন। এদিকে জঙ্গলের এক হরিণ দৌড়ে দৌড়ে এসে নবীজির দরবারে হাজির। সাথে একটি বাচ্চা। এসে নবীজির কাছে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইতোপূর্বে যে বাচ্চাটি আপনার দরবারে আনা হয়েছিল সেটি আমার বাচ্চা ছিল। আপনি ঐ বাচ্চাটি ইমাম হাসানকে দিয়েছেন। এদিকে ইমাম হুসাইনের ক্রন্দন দেখে আমি আমার অপর বাচ্চাটিও আপনার দরবারে নিয়ে আসলাম। আমি আমার বাচ্চার বিচ্ছেদের বিরহ সহ্য করতে পারব কিন্তু ইমাম হুসাইনের কান্না আমার সহ্য হচ্ছে না। হুজুর! মেহেরবাণী করে আমার এই হাদিয়াখানা কবুল করে আমাকে ধন্য করুন।

বড় বড় পরীক্ষা : কথায় বলে- "গাছ যত বড়, বাতাসও তত বেশি"। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাহ তথা বড় বড় নবী রাসূলদেরকেও অনেক পরীক্ষা করেছিলেন যার কিঞ্চিৎ বর্ণনা পবিত্র কুরআন করিমে এসেছে। ইমাম হুসাইনও (রা.) যেহেতু মহান আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন সেহেতু তাঁর উপর বড় বড় অনেক পরীক্ষা হয়েছিল। অসীম সাহস, ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তিনি ঐ সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

লম্পট ইয়াজিদের বাইয়াত প্রত্যাখান : হযরত আমিরে মুআবিয়া (রা.)'র ইনতেকালের পর যখন ইয়াজিদ সিংহাসন দখল করে চতুর্দিকে প্রশাসকদের এই মর্মে চিঠি পাঠিয়ে দিল, যেন সবাই তার আনুগত্য করে। মদীনার প্রশাসক ইমাম হুসাইনের খেদমতে হাজির হয়ে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হওয়ার কথা বললে ইমাম হোসাইন (রা.) ইয়াজিদকে তার দুষ্কর্মের জন্য খিলাফতের অনুপযুক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন এবং কোন অবস্থায় জালিমের আনুগত্য করবেন না বলে প্রশাসককে জানিয়ে দিলেন।৩৭

মদীনা মুনাওয়ারা হতে মক্কা মুয়াজ্জমায় হিজরত : ইমাম হুসাইন (রা.) ইয়াজিদের আনুগত্য স্বীকার করেনি জেনে ইয়াজিদ প্রচন্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ল আর মদীনার প্রশাসককে নির্দেশ দিল যেন ইমাম হুসাইনকে তার হাতে বাইয়াতের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়, অন্যথায় তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইয়াজিদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইমাম হোসাইন (রা.) জালিম ইয়াজিদের এই নির্দেশের কথা জানতে পেরে মদীনা মুনাওয়ারা ত্যাগ করে মক্কা মুয়াজ্জমায় চলে যাবার মনস্থ করলেন। মদীনা শরীফ ত্যাগের পূর্বরাতে নানাজান সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রওজা মোবারকে হাজির হয়ে রওজায়ে পাক জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে ইয়াজিদের নিষ্ঠুর আচরণের বর্ণনা দিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর চোখে ঘুম এসে গেলে প্রিয় নবীজি স্বপ্নে তাঁকে সাক্ষাৎ দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন আর কপালে চুমু দিয়ে বললেন, হুসাইন! জালিমেরা শীঘ্রই তোমাকে কারবালা ময়দানে ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শহীদ করবে। তোমার মা, বাপ ও ভাই হাসান তোমার অপেক্ষায় আছে। তোমার জন্য বেহেশত নতুন সাজে সজ্জিত করা হয়েছে। সেই বেহেশতে এমন একটা মহান সুউচ্চ মর্যাদার আসন রয়েছে, যা তুমি শহীদ হওয়া ব্যতীত অর্জন করতে পারবে না। যাও তুমি ধৈর্যসহকারে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে শহীদ হয়ে আমার কাছে চলে এসো। তবুও অন্যায়ের কাছে মাথানত কর না। ঘুম হতে চৈতন্য ফিরে এলে তিনি আহলে বাইতের সদস্যদের কাছে এসে স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন এবং মদীনা শরীফ ত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আম্মাজানের কবরের কাছে আরয করলেন- "আম্মাজান! আজ তোমার হুসাইন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছে" এই বলে আখেরী সালাম পেশ করলেন।৩৮

কুফার চিঠি : ইমাম মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌছার পরপরই কুফাবাসীদের পক্ষ হতে এই মর্মে চিঠি আসতে লাগল, "হে ইমাম হুসাইন! আমরা আপনার পিতা আলী (রা.) এর অনুসারী। আমরা আহলে বাইতের ভক্ত। আমরা ইয়াজিদের মত জালিম শাসকের হাতে কখনো বাইয়াত গ্রহণ করতে পারিনা। আপনি মেহেরবাণী করে কুফায় তাশরীফ আনুন। আমরা সবাই আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করব।" এভাবে প্রায় দেড়শত চিঠি ইমামের কাছে আসে। এ ধরনের একের পর এক চিঠি পেয়ে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কয়েকজনের সাথে পরামর্শ করে প্রথমে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর চাচাত ভাই হযরত মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় প্রেরণ করেন। ইমাম হুসাইনের প্রতিনিধি হযরত মুসলিম বিন আকীলকে পেয়ে কুফাবাসীরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে প্রথমে সংবর্ধনা দিলেও পরবর্তীতে টাকার লোভে পড়ে বেঈমানী করে বসল। এক পর্যায়ে তারা মুসলিম বিন আকীল (রা.) এর উপর বিভিন্ন প্রকার অকথ্য নির্যাতন করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে শহীদ করে দিল। এদিকে হযরত মুসলিম বিন আকীল কুফাবাসীদের প্রাথমিক আন্তরিক পরিবেশ দেখে ইমাম হুসাইন (রা.) এর কাছে চিঠি লিখলেও পরবর্তীতে তাদের বেঈমানী অবস্থার খবর পৌছাবার পূর্বেই ইমাম হুসাইন ৮২ জন সঙ্গী-সাথী নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। কুফায় পৌঁছে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দেখে তিনি হতবাক হয়ে পড়লেন আর হযরত মুসলিম বিন আকীল (রা.) এর শাহাদতের কথা শুনে আরো ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু তকদীরের ফয়সালা যা, তা-ই মেনে নিতে হয়। সুতরাং 'আর পেছনে যাওয়ার সুযোগ নেই' এই মন্ত্রে সম্মুখপানে এগিয়ে চললেন।

কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন : ইমাম হুসাইন (রা.) এর জীবনে যত পরীক্ষা এসেছে তন্মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা ছিল কারবালার ময়দানের পরীক্ষা। অভিশপ্ত এজিদ বাহিনী সেদিন ৬১ হিজরী সনের ১০ই মুহররম কারবালার উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর ইমাম হুসাইন (রা.) কে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। ইমাম সেদিন নিজের শির দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা ইসলামের শিক্ষা নয়। ইমাম সেদিন নিজের জীবন উৎসর্গ করে দ্বীন ইসলামকে চিরদিনের জন্য জীবিত করেছেন। আজকের বিশ্বের যে সমস্ত মুসলিম নেতৃবর্গ (তথাকথিত) ক্ষমতা আর অর্থের লোভে বিজাতিদের সামনে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিচ্ছে তারা এজিদের প্রেতাত্মা। পক্ষান্তরে বাতিল অপশক্তির মোকাবিলায় যারা সর্বক্ষণ সোচ্চার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন তাঁরা হুসাইনের উত্তরসূরী।

উপসংহার : পরিশেষে বলতে হয়, বিশ্বের মানচিত্রে একবার দৃষ্টি বুলালে আজ হৃদয়-মন হু' হু' করে কেঁদে উঠে। চারিদিকে মুসলমানদের অবস্থা করুণ। অত্যাচার-নির্যাতনের রোলার আজ নিরপরাধ দুর্বল মুসলিম নারী-পুরুষ আর শিশুদের বুকের উপর। তাগুতী শক্তির লেলিহান শিখা ধেয়ে আসছে অসহায় মুসলিম আবাল বৃদ্ধ বনিতার উপর। কুখ্যাত বুশ-ব্লেয়ার আর তথাকথিত মুসলিম নেতৃবর্গ মুনাফিকদের বলির পাঠা ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, ইরাক আফগানিস্তানের মুসলিম যুবকেরা। তাই জাতির এই চরম ক্রান্তিলগ্নে আরেকজন ইমাম হুসাইনের প্রয়োজন ছিল, যিনি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বিশ্বের নির্যাতিত মানবতাকে মুক্ত করে ছাড়বে। তাই বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন, অর্থ-ক্ষমতার লোভে পড়ে নিজেদের মূল্যবান ঈমান বিপন্ন করার পরিবর্তে জেগে উঠুন, সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে গড়ে তুলুন ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধন। গর্জে উঠুন কারবালার হাতিয়ার নিয়ে বদর, উহুদ, খন্দকের সেই সব বীর মোজাহিদদের আদর্শে উজ্জীবিত হোন। নতুন আমেজে মহিমান্বিত হোন ত্যাগের দৃষ্টান্ত নিয়ে। মুহররমের স্মৃতিচারণ করে, কেবল শোক মাতম করে আর যেন কালক্ষেপন না হয়, এগিয়ে আসুন মুক্তির সংগ্রামে।

"ফিরে এলো আজ সেই মুহররম মাহিনা, ---------- ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।"

তথ্য নির্দেশক :

১. তাফসীরে রুহুল মাআনী ২য় খন্ড ১২ পৃষ্ঠা
২. তাফসীরে খাজেন ৩য় খন্ড ৪৪৯ পৃঃ
৩. সূরা আর রাহমান আয়াত নং- ১৯,২০।
৪. তাফসীরে দুররে মনছুর ৬ষ্ঠ খন্ড পৃঃ ১৪৩ ৫. আহমদ হাকেম
৬. তিরমীজি টীকা ২য় খন্ড ৭৩৫ পৃঃ, মিশকাত ৫৬৯ পৃঃ
৭. মাসায়েকুল উকুবা ৩৯ পৃঃ, আলে রাসুল ৩০৯ পৃঃ
৮ কানযুল উম্মাল
৯. তিরমীজি, মুস্তাদ্রেকে আলী শাইবাহ, মিশকাত ৫০১ পৃঃ
১০. বায়হাকী ১১. বায়হাকী ১২. তিরমীজি ১ম খন্ড ১৮৩ পৃঃ
১৩. আল জামে লিত তিরমীজি ২য় খন্ড ২১৮ পৃঃ বাবু মানাকিবিল হাছান ওয়াল হোছাইন, আস সুনান লি-ইবনি মাজাহ ১ম খন্ড ১২ পৃঃ, আল মুস্তাদরাক লিল হাকেম ৩য় খন্ড ১৬৬ পৃঃ, আল মুসনাদ লি আহমদ ৩য় খন্ড ৬২ পৃঃ, আদ দুররুল মনছুর ৪র্থ খন্ড ২৬২ পৃঃ, শরহুস সুন্নাহ : আল বাগভী ১৪ খন্ড ৩১ পৃঃ।
১৪. মিশকাত ১৫. উদ্ধৃত : নবী (দঃ) এর বংশধর। ১৬. প্রাগুক্ত
১৭. প্রাগুক্ত ১৮. তাফসীরে রুহুল বয়ান ১ম খন্ড ৩৬৭ পৃঃ
১৯. তারীখুল খোলাফা ১৩৫ পৃঃ, আস সুয়ূতী (র.)
২০. আবদুর রহমান আস সাফুরী : নাজহাতুল মাজালিস ২য় খন্ড ৩৯১ পৃঃ
২১. উদ্ধৃত : নবী'র (দঃ) এর বংশধর। কৃতঃ মোল্লা খানম
২২. আল আমান ওয়াল উলা ২৩. প্রাগুক্ত
২৪. কিমিয়ায়ে সাদাত : ইমাম গাজ্জালী ২৫৯ পৃঃ
২৫. ইসলামের ইতিহাস, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা হতে প্রকাশিত।
২৬. আস সুয়ূতী : তারীখুল খোলাফা ১৩০ পৃঃ ২৭. প্রাগুক্ত ১৩৪ পৃঃ
২৮. নবীর বংশধর : মোল্লা খানম ২৯. মিশকাতুল মাছাবীহ ৫৭২ পৃঃ
৩০. প্রাগুক্ত ৫৭২ পৃঃ ৩১. তিরমীজি শরীফ ২য় খন্ড ২৪১ পৃঃ
৩২. শাওয়াহিদুন নবুওয়াত : আবদুর রহমান জামী (র.) ৩০৫ পৃঃ
৩৩. তিরমীজি শরীফ ২য় খন্ড ২৪২ পৃঃ
৩৪. তিরমীজি, সূত্র : মিশকাতুল মাছাবিহ ৫৭০ পৃঃ
৩৫. আল মুসতাদরাক ১ম খন্ড ১৬৬ পৃঃ ৩৬. নঈমী খুতবাতঃ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদুদ্দীন নঈমী, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, জামেয়া নঈমিয়া, মুরাদাবাদ হতে প্রকাশিত।
৩৭. সিররুশ শাহাদাতাইন ১৩ পৃঃ
৩৮. তাযকিরায়ে হুছাইন ২৭ পৃঃ, কারবালার প্রান্তরে ৫১ পৃঃ

রাজনীতি নয় দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কারবালার সংঘাত

সৈয়দ আহমদুল হক*

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রগণ রাজনীতির একাধিক সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত। ইংরেজীর Politics শব্দের বাংলা অর্থ রাজনীতি। রাজনীতির একটি আধুনিক সংজ্ঞা দিয়াছেন সাউদারেন্ ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার বিখ্যাত রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও লোক প্রশাসন বিশেষজ্ঞ জন এম্ ফিফ্নার এবং ফ্রেঙ্ক পি. সের উড। তাঁহারা বলেন, " Politics is the process by which power and influence are acquired and exercisd" অর্থাৎ রাজনীতি হইল এমন একটি প্রক্রিয়া যাহার দ্বারা ক্ষমতা ও প্রভাব অর্জন করা ও খাটান যায়। এই ক্ষমতা কি জিনিষ? মেরি পার্কার ফলেট্ বলেন, "Power might be defined as simply the ability to make things happen" অর্থাৎ ক্ষমতার সংজ্ঞা হইল কোন কিছু ঘটাইবার শক্তিমাত্র আর Process হইল "A Systematic series of action directed to some end". অর্থাৎ প্রক্রিয়া হইল কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিয়মাবদ্ধ ধারাবাহিক কার্যাবলী। হজরত হোসেনের কোন পদক্ষেপই ঐ সংজ্ঞাগুলির আওতায় আসে না।

হজরত হোসেন ছিলেন হজরত মোহাম্মদ ছল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াছাল্লাম এর দৌহিত্র। যিনি সব সময় আঁ-হজরতের আদর্শ অনুসরণ করিতেন। আঁ হজরত ১২ লক্ষ বর্গমাইল বিশিষ্ট রাজ্যের মালিক হইয়াও খেজুর পাতার বিছানায় শুইতেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার পরম স্নেহময়ী কন্যা হজরত ফাতেমা যাহারাকে তৈল ধার করিয়া আনিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার গায়ের কাপড় তালি যুক্ত ছিল। তাঁহার মাতা ছিলেন হজরত ফাতেমা যাহারা, তাঁহার পিতা ছিলেন হজরত আলী যিনি খলিফা হইয়াও ফকিরের মত জীবন যাপন করিতেন। হজরত হাসান, হজরত হোসেন, হজরত ফাতেমা যাহারা এবং হজরত আলী ছিলেন আহ্লুল বায়েতের সদস্য। পবিত্র কোরানের ছুরা আহ্যাবের ৩৩নং আয়াতে বলা হইয়াছে, انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا

অর্থ ঃ হে নবী পরিবার, আল্লাহ কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে সমস্ত অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও কলঙ্কমুক্ত করিতে। যেহেতু হজরত হোসেন আহ্লুল বায়েতের একজন সদস্য, আল্লাহ্র বাণী অনুযায়ী তিনি পবিত্র এবং কলঙ্কমুক্ত। যেহেতু ইহা আল্লাহ্র কালামের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহা প্রত্যেক মুসলমানকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। আপনারা অনেকেই জানেন এই আয়াত কি অবস্থায় নাজেল হইয়াছিল। একদিন আঁ হজরত তাঁহার কন্যা হজরত ফাতেমা যাহারার ঘরে আগমন করিলে তিনি তাঁহার গায়ে একটি এমনি যুব্বা পরিধান করেন। এই জুব্বায় পর পর হজরত হাসান, হজরত হোসেন, হজরত ফাতিমা যাহারা এবং হজরত আলী প্রবেশ করেন। ঐ সময় আঁ হজরত তাঁহাদিগকে পবিত্র ও কলঙ্কমুক্ত করার জন্য আল্লাহ্র নিকট আরজি করেন, তখন উপরোক্ত আয়াতে করীমা নাজেল হয়। (সুত্র-জামাখশারী তাফসীর আল কাশাফ)

কোরান শরীফের বিখ্যাত ভায্যকার আল্লামা ইউসুফ আলী বলেন, নবী পরিবার বলিতে আঁ হজরতের স্ত্রীগণ এবং হজরত হাসান, হজরত হোসেন, হজরত ফাতিমা যাহারা এবং হজরত আলীকে বুঝান হইয়াছে।

সুতরাং যেহেতু হজরত হোসেন আহ্লুল বায়েত বা আঁ হজরতের পরিবারভুক্ত ছিলেন আল্লাহ্ তাঁহাকে পবিত্র ও কলঙ্কমুক্ত করেন। এই অবস্থায় তাঁহার নিকট কোন জাগতিক লোভ-লালসা বা কোনরূপ অপবিত্রতা থাকিতে পারে না। মৌলানা রুমী বলেন, هر کرا جامه ز عشق چاک شد ..... او ز حرص و عیب کلی پاک شد

হারকেরা জামা যে এশ্ক্ চাক্ শোধ ----------- উজে হেরছ্ ও আয়েব কুল্লে পাকশোধ।

প্রেমের দরুন যাঁহার গায়ের বস্ত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তিনি সমস্ত লোভ ও দোষ ত্রুটি হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

কারবালার সংঘাতের মূল কারণ কি ছিল? এই সম্বন্ধে যেই সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য রহিয়াছে উহা হইতে বুঝা যায় যে, হজরত হোসেন ক্ষমতার জন্য নয়, দ্বীনের জন্য শাহাদাত বরণ করেন। আঁ হজরতের তিরোধানের পর মুসলমানগণ দেশ শাসনের ব্যাপারে ব্যক্তি বিশেষের গুণাবলী বিবেচনা করিয়া খলিফা নির্বাচন করিতেন। এই নিয়মে আঁ হজরতের পর হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওছমান ও হজরত আলী খলিফা নির্বাচিত হন।

হযরত মাবিয়ার (রাঃ) পূর্ব পর্যন্ত ইসলামই ছিল শাসন প্রণালীর মূলনীতি। রাজ্য শাসনের চাবিকাঠি ছিল "খিলাফত আল্ নবুয়াহ্" অর্থাৎ নবীর খলিফা। এই খেলাফতকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইবনে খালদুন তাঁহার 'আল মুকাদ্দিমা'তে বলেন "খেলাফত অর্থ হইল ধর্মের সংরক্ষণ ও পার্থিব শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ধর্ম্ম প্রতিনিধিত্ব করা। ধর্ম প্রবর্ত্তক দুইটি বিষয়ে

* বিশিষ্ট লেখক ও মরমী গবেষক

তৎপর হন, একটি হইল ধর্মীয় বিধি নিষেধের যথাবিহিত প্রচারণা এবং মানুষকে তৎসম্পর্কে কর্তব্য পালনের জন্য উৎসাহিত করা, অন্যটি হইল মানব জীবনের কল্যাণকে সম্মুখে রাখিয়া পার্থিব শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। খেলাফত যদি ইসলামী হয়, তাহা হইলে উহার মধ্যে রাজশক্তি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং কখনও উহার অনুসারীও হয়, কিন্তু উহা যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে উহা রাজশক্তি হইয়া দাঁড়ায়। খেলাফত সামগ্রিকভাবে জাতির ধর্মীয় ও পার্থিব অবস্থাদির পর্যবেক্ষণ এবং তৎসম্পর্কীয় ধর্মীয় বিধি নিষেধ প্রবর্তন করে।"(আল মুকাদ্দিমা- ইবনে খালদুন - গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত পৃঃ- ৩৭৯.)

হজরত মাবিয়ার সময় 'খেলাফত আল নবুয়াহ্'র পরিবর্তন ঘটে এবং উহা মুলক বা জাগতিক সার্ব্বভৌমত্বে অর্থাৎ Temporal sovereignty তে পরিণত হয়। প্রথম চারি খলিফা তাঁহাদের কোন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন নাই। খলিফা নির্বাচনের ব্যাপার ছিল অনেকটা গণতান্ত্রিক। ইবনে খালদুন বলেন, "হজরত উমর ইবনে আল খত্তাব (রাঃ) যখন সিরিয়া উপস্থিত হইয়া হজরত মাবিয়াকে রাজশক্তি সুলভ বৈভব ও ভূষণ এবং সভাসদ ও অনুষদের মধ্যে দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা কি পারস্য রাজের বেশ ভূষা নহে, হে মাবিয়া?" (আল মুকাদ্দিমা)

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের মালিক আল্লাহ্, অন্য কেহ ইহার মালিক হইতে পারে না। হজরত মাবিয়ার সময়ের পর হতে এই নীতির বিচ্যুতি ঘটে। এয়াজিদের খলিফা হওয়ার উপযুক্ততা ছিল কিনা তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমরা দেশে ও বিদেশে দেখিতেছি, উপযুক্ত না হইলেও এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণের সমর্থন না থাকিলেও নানা কৌশলে কেহ কেহ শাসন ক্ষমতা দখল করেন। হজরত মাবিয়ার পুত্র এয়াজিদের বেলায়ও হইয়াছিল তাহাই। তিনি ছলে, বলে, কৌশলে defacto অর্থাৎ অধিকার বলে হউক বা না হউক রাজা হইয়া গিয়াছিলেন। আপনারা জানেন ইহুদী ও খৃষ্টান লেখকগণ ইসলামকে হেয় করার জন্য প্রায় সময় ইসলামের শত্রুকে বড় করিয়া দেখায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এয়াজিদের চরিত্রহীনতার ব্যাপারে প্রায় সব ইহুদী ও খৃষ্টান লেখকগণ একমত। উদাহরণ স্বরূপ Hitti (হিট্টি) তাঁহার ইতিহাস History of the Arabs এ লিখিতেছেন "When Yazid well known for his frivolity and dissipation succeeded to the throne Abdullah openly declared against the new Caliph". অর্থঃ- যখন এয়াজিদ যিনি তাঁহার চপলতা ও চরিত্রহীনতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন, সিংহাসন আরোহন করেন, তখন আবদুল্লাহ্ খোলাখুলিভাবে নিজকে নূতন খলিফার বিপক্ষে বলিয়া ঘোষণা করেন।

একজন মদ্যপায়ী দুশ্চরিত্র লোককে কোন প্রকৃত মুসলমান খলিফা বলিয়া মানিয়া নিতে পারে না। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছল্লল্লাহু আলাইহে ওয়াছল্লামের দৌহীত্র হজরত হোসেনের পক্ষে ইহা মানিয়া নেওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। এয়াজিদ তাঁহাকে খলিফা মানিয়া নিবার জন্য হজরত হোসেনের উপর চাপ সৃষ্টি করেন এবং তাহার হাতে বায়েত হইবার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। হজরত হোসেন কি করিয়া একজন অপবিত্র চরিত্রহীন লোকের হাতে বায়েত গ্রহণ করিবেন? বায়েত শব্দটির অর্থ আপনারা অনেকেই জানেন। এই সম্বন্ধে ইব্নে খালদুন তাঁহার "আলমুকাদ্দিমা"তে কি বলেন দেখুন, "জানিয়া রাখুন আরবী বায়েত শব্দের অর্থ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ। শপথ গ্রহণকারী তাহার সর্দারকে এই বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয় যে, নিজের জন্য ও মুসলমানদের জন্য তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি মানিয়া লইবে এবং কোন ব্যাপারে তাঁহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইবে না। এতদ্ব্যতীত সর্দার তাহাকে যেই দায়িত্ব পালন করিতে দিবেন, তাহা ভাল হউক বা মন্দ হউক সে উহা পালন করিবে।

এইভাবে তাহারা যখন কোন সর্দারের আনুগত্য স্বীকার করিয়া শপথ গ্রহণ করে তখন বিষয়টিতে গুরুত্ব সৃষ্টির জন্য তাঁহার হাতে তাহাদের নাস্ত করে। উহা যেন ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্কের মত হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য উহাকে বায়েত বলা হয়। উহা "বা-আ" শব্দের ক্রিয়া বিশেষ্য এবং বায়েতের অর্থ হয় করমর্দন। (আলমুকাদ্দিমা পৃঃ ৩৬৪)

চিন্তা করিয়া দেখুন, হজরত হোসেনের পক্ষে উহা সম্ভব ছিল কিনা। তাঁহার পক্ষে উহার বিরোধিতা করাই ছিল স্বাভাবিক। তিনি ইসলাম ধর্ম রক্ষার্থে উহার বিরোধিতা করেন। বছরাবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁহার এক চিঠিতে তিনি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন যে, হজরত মোহাম্মদ ছল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াছল্লামের সুন্নত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তিনি সকলকে দ্বীন রক্ষা করিতে অনুরোধ জানান। তিনি তাঁহার বিভিন্ন ভাষণে বার বার উল্লেখ করেন যে, তিনি ক্ষমতার লোভে লোভী নহেন। তিনি কেবল ইসলামকে রক্ষা করিতে চাহেন।

একজন দুশ্চরিত্র মদ্যপায়ীকে মুসলমানদের খলিফা বানাইলে ইসলাম রক্ষা হইতে পারে না। আঁ হজরতের নাতি এজিদের হাতে বায়েত গ্রহণ করিলে সমগ্র মুসলিম জগতকে উহা অবনত মস্তকে মানিয়া নিতে হইত এবং কেয়ামত পর্যন্ত উহা একটি কলঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিত। ইহা তিনি চাহেন নাই। অসত্যের কাছে, অধর্মের কাছে তিনি মাথানত করেন নাই। আগেই বলা হইয়াছে, তিনি ক্ষমতার লোভে লোভী ছিলেন না। কুফাবাসীদের আমন্ত্রণক্রমে তিনি যখন কুফার দিকে

রওনা হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ করার বা যেই কোনরূপ সংঘাতে লিপ্ত হইবার মনোভাব ছিল না। যদি অন্যরূপ হইত তাহা হইলে তিনি পরিবার পরিজন ও দুগ্ধ পোষ্য শিশু নিয়া কারবালায় উপস্থিত হইতেন না। তাঁহার হৃদয় ছিল সরল, স্বচ্ছ ও পবিত্র। তিনি ক্ষমতার জন্য কোন কিছু ঘটাইবার মানসে বাহির হন নাই। তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন। তাঁহাকে যখন চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়া পানি বন্ধ করিয়া এবং তাঁহার সঙ্গীদের একের পর এককে বধ করিয়া তাঁহাকে এয়াজিদের হাতে বায়েত নিবার জন্য বাধ্য করিবার প্রচেষ্টা চালান হয়, তখন তিনি উহা রুখিয়া দাঁড়ান। তিনি তাঁহার জীবন বিসর্জ্জন করেন কিন্তু সত্যকে, ধর্মকে বা আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে অস্বীকার করেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা একমাত্র আঁ হজরতের দৌহিত্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, হজরত হোসেনের সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা ছিল মাত্র দুইশত; অপর পক্ষে এজিদের সৈন্য সংখ্যা ছিল চারি হাজার। এই অসম এবং অন্যায় যুদ্ধের পরিণতি উপলব্ধি করিয়াও হজরত ইমাম হোসেন আদর্শচ্যুত হন নাই। সত্যিকার মুসলমানদের কাজ হইল পাপ কাজে লিপ্ত স্বৈরাচারী ও একনায়কের বিরুদ্ধে আমরণ জিহাদ ঘোষণা করা। ইহাতে ইসলামের অমরত্ব নিহিত রহিয়াছে। এই জন্য বলা হয়, "ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কি বাদ"। প্রকৃতপক্ষে কারবালার ঘটনা হজরত ইমাম হোসেনকে অমর করিয়াছে আর এয়াজিদের মৃত্যু আনয়ন করিয়াছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন এইরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট। যাঁহারা প্রাণের বিনিময়ে ধর্মকে বা নিজের মতবাদকে রক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে হজরত ঈসা ও ইমাম আবু হানিফার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। হজরত ঈসা যদি রোমান রাজার গভর্নর পন্টিয়াস পিলেট (২৬-৩৬ খৃঃ) ও গেলিলির শাসনকর্তা হেরোডের কথামত চলিয়া তাঁহার ধর্মমত বিসর্জ্জন দিতেন, তাহা হইলে হয়ত বা তিনি প্রাণে বাঁচিতেন কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম পৃথিবীতে থাকিত না। হজরত ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭ খৃঃ) যদি খলিফা আল মনসুরের কথামত জবরদস্তিমূলক শাসন ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এগার বৎসর কারাগারে থাকিয়া পরিশেষে বিষপানে প্রাণ দিতে হইত না। তিনি তাঁহার প্রাণের বিনিময়ে হানাফি মজহাবকে রক্ষা করেন। তিনি তাঁহার মতবাদে দৃঢ় না থাকিলে তাঁহার প্রবর্ত্তিত মজহাবের প্রতি মানুষের আস্থা থাকিত না এবং আমরা এতগুলি লোক তাঁহার অনুসারী থাকিতাম না। কিন্তু বীরত্ব ও অন্যান্য সব দিক হইতে পৃথিবীর ইতিহাসে ইমাম হোসেনের শাহাদতের কোন তুলনা নাই। আঁ হজরতের দৌহীত্র হইয়া তিনি যদি এয়াজিদের পাপাচারকে সমর্থন জানাইতেন, তাহা হইলে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি হইত। তিনি প্রাণের বিনিময়ে ইসলামকে রক্ষা করিয়াছেন। ইসলামের আদর্শের নিকট এয়াজিদ পরাজিত হইয়াছে। এয়াজিদ যুদ্ধে জয়ী হইলেও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে এবং সমগ্র জগতের নিকট রোজ কেয়ামত পর্যন্ত সে একজন ঘৃণিত জীব হিসাবে পরিচিত থাকিবে। হজরত হোসেন ইসলামের গৌরব। তাঁহার শাহাদতের পর লক্ষ লক্ষ লোক ইসলামের জন্য, ন্যায়ের জন্য, আদর্শের জন্য শাহাদত বরণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। ইহা না হইলে ইসলামের বিরুদ্ধে যেইসব ষড়যন্ত্র আগে চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে উহা ইসলামকে ডুবাইয়া দিত। হজরত ইমাম হোসেন ধর্ম রক্ষার্থে সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্য শাহাদতের যেই দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন উহা ইসলামকে এই পর্যন্ত রক্ষা করিতে সহায়ক হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত সহায়ক হইবে। ইমাম হোসেন সমগ্র মানব জাতির হৃদয়ে বাঁচিয়া আছেন। তাঁহাকে মুসলিম, খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিয়া, সুন্নী সকলেই শ্রদ্ধা করেন। এই জন্য কবি বলিয়াছেন,

کشتگان خنجر تسلیم را　　هر زمان از غیب جانے دیگر ست

ইসলামের জন্য যাঁহারা শহীদ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রতি যুগে ভিন্নভাবে প্রাণবন্ত থাকেন। কবি হাফেজ বলেন,

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق　　ثبت ست بر جریده عالم دوام ما

আল্লাহর প্রেমে যাঁহার হৃদয় উজ্জীবিত হইয়াছে, তাঁহার কোন দিনই মৃত্যু হয় না। ভূপৃষ্ঠের রেকর্ডে চিরকালের জন্য তাঁহাদের নাম লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হজরত হোসেন ৬১ হিজরীর ১০ই মহররম মোতাবেক ১০ই অক্টোবর ৬৮০ খৃষ্টাব্দে শাহাদত বরণ করেন।

আমি ১৯৮৯ ইংরেজীর ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ হজরত হোসেনের শাহাদতের এক হাজার তিনশত বৎসর পরে কারবালায় সপরিবারে তাঁহার মাজার জিয়ারত করিতে যাই। পৃথিবীতে যদি এমন কোন স্থান থাকে যেই স্থানে দিন রাত্রি বিরামহীন কান্না চলিতেছে ঐ স্থানটি হইল ইমাম হোসেনের শাহাদতের স্থান। ঐ স্থানটিকে রক্তাভ অনিক্স্ পাথরে নির্মিত প্রাচীরে ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে এবং মেঝেটিও রক্তাভ অনিক্স্ পাথরে নির্মিত। উহাতে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন এইমাত্র হজরত হোসেন শাহাদত বরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পবিত্র রক্তের ছিটকানি মেঝেতে এবং দেওয়ালের গায়ে তাজা অবস্থায় লাগিয়া আছে। হাজার হাজার নারী ও পুরুষ রাত্রি বা দিনে ঐ স্থানে পৌঁছিতেছে এবং কান্নার রোল তুলিতেছে।

কত নেতা কত রাজা কত মহারাজা ও লোকজন যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন এবং করিতেছেন কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর লোক তাঁহাদের কাহারও জন্য অত ব্যথা অনুভব করে না, যতখানি ব্যথা তাহারা ইমাম হোসেনের শাহাদাতের জন্য অনুভব করে। কবি, ঐতিহাসিক ও লেখক এই শাহাদতকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে বিলাপ করিয়াছেন, কবিতা ও মর্সিয়া লিখিয়াছেন এবং উহাদের প্রত্যেকটাই করুণ ও অশ্রু উদ্রেককারী। ইহার কারণ একটি, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন।

কবি মুন্সী এয়াকুব তাহার জঙ্গনামাতে লিখিতেছেন-

যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে
শির যুদা কৈল যদি ইমামের তরে
আরশ কুরশ লওহ কলম সহিতে
বেহেস্ত, দোজখ, আদি লাগিল কাঁদিতে
আসমান, জমিন আদি পাহাড় বাগান
কাঁদিতে অস্থির হইল কারবালা ময়দান
আফতাব মাহতাব, তারা কাল হইয়া গেল
জানোয়ার হরিণ পাখি কাঁদিতে লাগিল
বালক সকল মায়ের দুধ যে হইতে
না উম্মেদ রহে সবে ইমাম শোকেতে
বাঘ ভাল্লুক কান্দে আর মহিষ গভার
বাচারে না দেয় দুধ কান্দে জারে জার।

'বিষাধ সিন্ধু'তে মীর মোশারফ হোসেন লিখিয়াছেন-

"সীমার যখন তীরবিদ্ধ স্থানে খঞ্জর স্পর্শ করিল, অমনি হোসেন শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। আকাশ, পাতাল, অন্তরীক্ষ, অরণ্য, সাগর, পর্ব্বত, বায়ু ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে রব উত্থিত হইতে লাগিল "হায় হোসেন, হায় হোসেন, হায় হোসেন"।

নজরুল বলেন-

পুত্র হীনার আর বিধবার কাঁদনে,
ছিড়ে আনে মর্মের বত্রিশ বাধনে!
হলকুমে হানে তেগ, ওকে বসে ছাতিতে?
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাত্রিতে
আসমান ভরে গেল গোধূলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে।

হজরত হোসেনের শাহাদতের মধ্যে যেই শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে উহা নজরুলের 'মোহররম' নামক কবিতায় সুন্দররূপে বিধৃত হইয়াছে। উহার শেষাংশ আবৃত্তি করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই।

জাগো ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাঁক, শহীদের খুনে সব লালে লাল হয়ে যাক!
নওসার সাজ নাও, খুন-খচা আস্তীন, ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস দিন!
হাসানের মত পিব পিয়ালা সে জহরের, হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের।
আসগর সম দিব বাচ্চারে কোরবান, জালিমের দাদ নেবো দেব আজ গোরজান
সকীনার শ্বেত বাস দেব মাতা কন্যায়, কাসিমের মত দেবো জান রুধি অন্যায়
মোহররম কারবালা কাঁদো হায় হোসেনা, দেখো মরুসূর্য এখুন যেন শোষে না।

মাওলা আলী ও মা ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা

মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন আজহারী*

তাক্বদিম ঃ মাওলা আলী ও মা ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) যাঁদের পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। হযরত রাসুলে করিম (দঃ) যাঁদেরকে প্রানাধিক স্নেহ করতেন। যাঁদের বংশধারায় প্রবাহিত হয়েছে বেলায়তের প্রসবন। তাঁরা এমন সুজন যাঁদেরকে ভালবাসা অপরিহার্য করা হয়েছে মাখলুকের উপর। পক্ষান্তরে তাঁদের প্রতি কোন প্রকার হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন- قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى الاية

অর্থাৎ বলুন (হে রাসুল দঃ) আমি তোমাদের কাছে উহার (দ্বীনের দাওয়াত) উপর কোন বিনিময় চাই না, শুধু কোরবা তথা নিকটাত্মীয়ের ভালবাসা ব্যতীত।[১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন রাখলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! ঐ নিকটাত্মীয় কারা, যাদেরকে ভালবাসা আমাদের উপর অপরিহার্য করা হয়েছে? উত্তরে রাসুল (দঃ) বললেন- তারা হলেন হযরত আলী, মা ফাতেমা ও তাঁদের দু'নয়ন ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ)।[২]

মাওলা আলী (রাঃ) ও মা ফাতিমা (রাঃ) উভয়ই ছিলেন আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য। তাঁদের একজন হলেন- শেরে খোদা, অপরজন খাতুনে জান্নাত। এছাড়া তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ছিলেন সফল। তাঁদের নছল থেকেই বৃদ্ধি পায় নবী পরিবারের বংশধারা। সায়্যেদুশ শুহাদা ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ) এর শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা। যাঁদের শাহাদাতের মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণজীবন লাভ করে।

এ প্রবন্ধে হযরত আলী ও মা ফাতেমার জীবনচিত্র অংকনসহ তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষনীয়গুলো আমাদের উপকারের জন্য উপস্থাপন করা হবে। উদ্দেশ্য হবে আহলে বাইতের আলোচনা হতে আমরা সবাই যাতে উপকৃত হতে পারি।

হযরত মাওলা আলী (রাঃ)

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ শেরে খোদা মাওলা আলী (রাঃ) ছিলেন হযরত রাসুলে আকরম (দঃ) এর চাচাত ভাই। পিতা আবু তালেব, মা সায়্যেদা ফাতেমা বিনতে আছাদ বিন হাশেম। তাঁর বংশধারা মাতৃ-পিতৃ উভয় দিক হতেই রাসুলে খোদা (দঃ) এর সাথে মিলিত হয়েছে। এ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়েছে রাসুল তনয়া মা ফাতিমা (রাঃ) এর সাথে হযরত আলীর (রাঃ) বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারনে।

তিনি নবুয়তের ১০ বৎসর পূর্বে ৬০০ খ্রীঃ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর সংস্পর্শে বড় হতে থাকেন।[৩]

উপনাম ঃ মাওলা আলীর (রাঃ) উপনাম ছিল আবুল হাছান ও আবু তুরাব (মাটি)। রাসুলে পাকের দেয়া এ উপনাম ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। একদা তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে ছিলেন। হুজুর করিম (দঃ) তাঁকে জাগাতে গিয়ে তাঁর কপালে মাটি দেখতে পেয়ে বললেন-قم ابا تراب অর্থাৎ হে মাটির পিতা! উঠ।[৪] অবশ্য তিনি উপনামের চেয়ে আসল নামেই বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইসলাম গ্রহন ঃ হযরত আলী (রাঃ) নবীগৃহে লালিত হবার সুবাদে খুব কাছে থেকে ইসলামের সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ হয়েছে। হযরত রাসুলে করিম (দঃ) ও মা খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) যখন নামাজ পড়তেন, তখন তিনি অবাক দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতেন। বর্ণিত আছে, তিনি কম বয়সীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলামে দীক্ষিত হন। তাঁর বয়স তখন ১০ বৎসর, মতান্তরে ১৩, ১৫, ১৬ বৎসরের কথাও উল্লেখ আছে। তিনিই সর্বপ্রথম রাসুলে পাকের সাথে নামাজ আদায় করেন। জাহেলী যুগের কোন পংকিলতাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। যাঁর মাথা কখনো মূর্তির জন্য নত হয়নি। এ কারনেই তাঁর নামের পর (আল্লাহ তাঁর চেহারাকে সম্মানিত করেছেন) বলা হয়।[৫]

অন্য বর্ণনায় আছে, যেহেতু খারেজী সম্প্রদায় হিংসার বশিভূত হয়ে প্রকাশ্য খুতবায় হযরত আলীকে (রাঃ) 'আল্লাহ তার চেহারা মলিন করুক' বলে গালি দিত। তাই প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীগণ তাঁর সম্মানার্থে এবং খারেজীদের কথাকে রদ করার জন্য বলেন। যেহেতু সাহাবাগণকে মন্দ না বলার জন্য হাদিসে তাগিদ আছে।[৬]

বাল্যজীবন ও শিক্ষা দীক্ষা ঃ বাল্যকাল থেকেই হযরত আলীর মধ্যে বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর বিচক্ষণতার বড় প্রমাণ হল, তিনি কম বয়সেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। লেখা-পড়া ছাড়াও তিনি অসি চালনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। যে কারনে 'যুল ফিকার' নামের দামী তরবারীটি তাঁরই ভাগ্যে জুটে। অসীম জ্ঞানের কারনেই তিনি

* ফক্বীহ্, নেছারিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রাসুলে করিম (দঃ) এর পক্ষ থেকে 'ইলমের দরজা' হিসেবে সার্টিফিকেট পান। আর অদম্য সাহসিকতার কারনেই হুজুর করিম (দঃ) জেহাদের ঝান্ডা হযরত আলীর (রাঃ) হাতে দিতেন। খায়বার যুদ্ধের ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করে। তৎকালে শিক্ষার্জনের কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না থাকায় তিনি সরাসরি রাসুলে পাকের কাছ থেকেই জ্ঞান আহরন করেন। কোরআনের ব্যাখ্যায় তিনি এত বেশি পারদর্শী হয়ে উঠেন যা তাঁর খোতবায় প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। খোদার কসম করে বলছি, তোমরা আমাকে কোরআনুল করিমের যে কোন স্থান থেকে অথবা যে কোন আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন কর, আমি তার উত্তর দেব। যেহেতু আমি কোরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত।[৭]

বৈবাহিক জীবন ঃ ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত বিয়ের মধ্যে একটি হল- হযরত আলী ও মা ফাতেমার (রাঃ) বিবাহবন্ধন। স্বয়ং আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের (দঃ) ইচ্ছায় এ বিয়ে সংঘটিত হয়। যে বিয়ের পাত্র-পাত্রী দু'জনই আহলে বাইতের সদস্য। তাঁদের একজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত, অন্যজন জান্নাত বাসীনীদের সর্দার।

হযরত আলী (রাঃ) বৈবাহিক জীবনে একজন সফল স্বামী। দায়িত্বশীল পিতা ও কর্তব্যপরায়ন অভিভাবক হিসেবে স্বীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। হিজরী ২য় সনে বদর যুদ্ধের পর মসজিদে নববীতে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের বিয়ে সংঘটিত হয়।

সে যুগে বহু বিবাহের প্রচলন থাকলেও হযরত আলী (রাঃ) মা ফাতেমার জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন নাই।[৮] কথিত আছে, বিয়ের সময় এরকমই শর্ত দেয়া ছিল রাসুলে খোদা (দ.) এর পক্ষ থেকে। কারন, তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করলে মা ফাতিমা (রাঃ) মনে কষ্ট পাবেন আর সেটা হবে খোদ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (দঃ) এর মনোকষ্টের কারন।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন- মা ফাতেমার (রাঃ) হাত ধরা অবস্থায় রাসুল (দঃ) আমাদের নিকট এসে বললেন, ইনি কে চিনতে পেরেছ? যারা চিনে তারা ভাল করেই জানে, আর যারা চিনে না তাদের জন্য বলছি, এটা ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (দঃ). সে আমার দেহের অংশ, আমার প্রাণের টুকরা। যে তাকে কষ্ট দিল, সে মূলতঃ আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকেই কষ্ট দিল।[৯]

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দিবে তাদের পরিণতি সম্পর্কে কোরানের ফায়সালা হল-

ان الذين يوذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الاخرة و اعدلهم عذابا مهينا= الاية

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দিবে তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত দিবে এবং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।[১০]

শরীয়তে দ্বিতীয় বিয়ের সুযোগ থাকা সত্বেও বিয়ে না করার শর্ত জুড়ে দেয়া সালতানাতে মুস্তফা বা রাসুল (দঃ) শরীয়তের মালিক হওয়ার বড় দলিল।[১১]

ফাতিমা (রাঃ) এর জীবদ্দশায় হযরত আলীর (রাঃ) দ্বিতীয় বিয়ে না করাটাই ছিল তাঁর জন্য কল্যাণকর। অন্যথায় সেটা হত তাঁর জন্য ক্ষতির কারণ।[১২]

হযরত ফাতিমার ঘরে তাঁর তিন ছেলে ও দুই মেয়ে সন্তান ছিলেন। তাঁরা হলেন-হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন, হযরত মোহসিন, ছৈয়্যদা জয়নব ও উম্মে কুলসুম (রাঃ)। হযরত মোহসিন বাল্যকালে ইন্তেকাল করাতে তাঁর কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।[১৩]

অবশ্য হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতিমার ইন্তেকালের পর আরো একাধিকবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সে সংসারেও ছেলে সন্তান জন্ম লাভ করেন।[১৪]

খেলাফত লাভ ঃ হুযুর করিম (দঃ) এর ইন্তেকালের পর অনেকেই মনে করেছিলেন, হযরত আলীই (রাঃ) হবেন ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা। কিন্তু রাসুলে করিম (দঃ) এর ইশারা ও সাহাবায়ে কেরামের সম্মতিতে খলিফা নিযুক্ত হন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)। তিনি প্রথমে খলিফা নিযুক্তির ব্যাপারে তাঁর সাথে পরামর্শ না করার কারনে অসন্তুষ্ট হলেও পরবর্তীতে আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। বরং খেলাফত পরিচালনার বিষয়ে তাঁকে সকল প্রকার সহযোগীতা দিয়ে যান। এমনিভাবে পরবর্তীতে যাঁরাই খলিফা নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি হযরত আলীর (রাঃ) সহযোগীতার হাত ছিল মুক্ত-প্রসারিত। হযরত ওসমান (রাঃ) এর শাহাদতের ৬ দিন পর সাহাবায়ে কেরামের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ৬৫৬ খ্রীঃ ২৩শে জুন তিনি খলিফা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।[১৫]

খেলাফত কাল ঃ হযরত আলী (রাঃ) খেলাফতকাল তেমন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বরং প্রচন্ড ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর খেলাফতকাল অতিবাহিত হয়। তাঁর খেলাফতকালেই বিভিন্ন ধর্মীয় দল উপদলের সৃষ্টি হয়। তৎকালে যেমন ছিল তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী প্রেমিক দল, তেমনি ছিল প্রাণঘাতী শত্রু। প্রথম আত্মঘাতি গৃহযুদ্ধের সুচনা হয় তাঁর শাসনামলেই।

যেমন উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফ্ফিনের যুদ্ধ ইত্যাদি। অবশ্য এসবের জন্য হযরত আলী (রাঃ) কে কোনভাবেই দায়ী করা যায় না। ইতিহাসবিদরাও এ ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। ওলামায়ে কেরামও বলেন, তাঁর শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে সমস্ত বিবাদের মূলে ছিল ইজতিহাদগত ভুল। যেটা ইসলামী শরীয়তে ক্ষমাযোগ্য। অনেক সময় পূণ্যেরও বটে। বিস্তারিত জানার জন্য ইতিহাসের বইগুলো প্রনিধানযোগ্য।[১৬]

অবশ্য তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে এসব বিবাদের মোকাবিলা করেছেন এবং তাঁর খেলাফতকালকে সুন্দর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর খেলাফত কাল প্রায় ৪ বৎসর ৯ মাস স্থায়ী ছিল।[১৭]

শাহাদত বরণ ঃ ৪০ হিজরীর ১৭ই রমজান কুফার একটি মসজিদে ফজরের নামাজ আদায়রত অবস্থায় আব্দুর রহমান বিন মুলজিম নামে এক খারেজীর[১৮] বিষাক্ত ছুরির আঘাতে তিনি আহত হন। এর তিন দিন পর তিনি শাহাদতের সুরা পান করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বৎসর। মতান্তরে ৬৫ অথবা ৫৭ বৎসরের কথাও উল্লেখ আছে।[১৯]

হযরত ইমাম হাছান (রাঃ) তাঁর নামাজে জানাযার ইমামতি করেন এবং ইরাকের 'হেরা' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। পরবর্তী ইমাম হাছান (রাঃ) ইসলামের পঞ্চম খলিফা হিসেবে শপথ নেন। অবশ্য তাঁর খেলাফত বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মুসলিম উম্মাহকে গৃহযুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে স্বেচ্ছায় খেলাফত ত্যাগ করেন। ইসলামের জন্য তাঁদের এ ত্যাগ মানুষ আজীবন স্মরণ করবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে হযরত আলীর (রাঃ) অবদান ঃ তিনি একাধারে ছিলেন ইমাম, রাষ্ট্রনায়ক, শাসক, জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক বাহক ও প্রচারক। তাঁর খেলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তারের সাথে সাথে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইলমে শরীয়ত ও মারফাতে কামিল, মুকাম্মিল ছিলেন। বেলায়তের মহান সম্রাট হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে রাসুলে করিম (দঃ) এর মহান বাণীর انا مدينة العلم و علي بابها অর্থাৎ 'আমি জ্ঞানের স্বর্গরাজ্য আর আলী তার দরজা' বাস্তবতায় অনেকেই পরবর্তীতে এ শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের ভাগিদার হয়েছিলেন, যা এখনো প্রবাহমান এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

তিনি কোরান ও হাদীসে পারদর্শী ছাড়া বিভিন্ন শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। ইলমে নাহু বা আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্ভাবক। তৎকালে কোরান শরীফে কোন হরকত না থাকায় অনারব পাঠকগণ কোরান শরীফ ভুল পড়ার কারনে তিনি এমন একটি বিষয়ের অভাব অনুভব করলেন যার মাধ্যমে কোরান হাদিস শুদ্ধভাবে পড়া যায়। তাই তিনি আবুল আছাদ দুয়াইলীকে (রাঃ) আদেশ দিলেন এমন এমন কিছু নিয়ম কানুন গঠনের জন্য যার মাধ্যমে মানুষ ব্যাকরণগত ভুল হতে মুক্ত হতে পারেন। হযরত দুয়াইলীর আবিষ্কৃত কায়দা-কানুনগুলিই পরবর্তীতে নাহুশাস্ত্ররূপে পরিচয় লাভ করে।[২০]

তাছাড়া তিনি আরবী পদ্য, গদ্য, বক্তৃতায়ও সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন। 'দিওয়ানে আলী' নামের পদ্যগ্রন্থ যার প্রমাণ বহন করে। ইলমে ফিকহ ও গবেষণার ক্ষেত্রেও তিনি সুপন্ডিত ছিলেন আর বিচারক হিসেবে ছিলেন সফল ব্যক্তিত্ব। কেননা এ ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর রাসুলের (দঃ) নেক দোয়া পান। ইয়ামন প্রেরণকালে রাসুল (দঃ) তাঁকে এ বলে দোয়া করেন- اللهم اهد قلبه و سدد لسانه অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আপনি তাঁর কলব ও জবানকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এ দোয়ার পর আমি কখনো কোন ফায়সালার ব্যাপারে বিব্রতবোধ করিনি।[২১]

নবী নন্দিনী ফাতেমা জননী (রাঃ)

নবীপরিবারের উজ্জ্বল তারকা, তৈয়্যবা তাহেরা, মা ফাতেমাতুজ যাহরা। পৃথিবীর বুকে রাসুলে খোদা (দঃ) এর সবচেয়ে প্রিয়ব্যক্তিত্ব ও আদরের মানুষ হলেন মা ফাতেমা (রাঃ)। যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন- انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছাতো এটাই যে, হে আহলে বাইত! আপনাদের যত পঙ্কিলতা দূর করে পূতঃপবিত্র করা।[২২]

অত্র আয়াতে 'আহলে বাইত' বলতে হযরত আলী, মা ফাতেমা ও ইমাম হাসান, হোসাইন (রাঃ) কে বুঝানো হয়েছে।[২৩]

এজন্য মা ফাতেমার অন্য এক নাম তাহেরা। এছাড়া তিনি ছিদ্দিকা, মুবারাকা, মুহাদ্দেছা, যকিয়্যা, রাদ্বিয়া ও মারদ্বিয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। উজ্জ্বল্য ও লাবন্যতার কারনে তাঁর উপাধী ছিল "যাহরা।" আবেদা, যাহেদা হওয়ার কারনে বলা হত- "বতুল"।[২৪] তাঁর উপনাম ছিল ام ابيها (উম্মে আবিহা)। এটা একদিকে যেমন পিতৃ ও মাতৃ উভয় দিক হতে সম্মানী হবার অর্থ প্রকাশ করে, অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে তাঁর গভীর স্নেহ-মমতার অর্থ বুঝায়।[২৫]

ইসলামের সর্বপ্রাচীন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'জামেয়াতুল আজহার' তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এক শিয়া মুসলিম সেনাপতি শিয়া মতবাদ প্রচারের মানসে এর গোঁড়া পত্তন করলেও পরবর্তীকালে তা সুন্নীদের হস্তগত হয়ে, সুন্নীয়ত প্রচারে ব্রত আছে।

জন্ম ঃ ২০ জমাদিউসসানী নবুয়তের ১ম বৎসর মা ফাতেমা (রাঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন কুরাইশরা কাবা ঘর মেরামতে ব্যস্ত ছিলেন। কারো মতে, তিনি নবুয়তের পাঁচ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন।[২৬] দ্বিতীয় মতটিই উত্তম বলে মনে হয়।

ফাতেমা নামকরণের হেতু ঃ হযরত আলী (রাঃ) ফাতেমা নামকরণের হেতু জানতে চাইলে সরকারে দো'আলম (দঃ) বলেন- ان الله قد فطمها و ذريتها من النار الي يوم القيامة অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে (ফাতেমা) এবং তাঁর বংশধরকে কিয়ামত পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন।[২৭] ফিতাম শব্দের অর্থ- বিচ্ছিন্ন করা বা আলাদা করা।[২৮] তিনি ছিলেন রাসুলে পাকের কনিষ্ঠা কন্যা এবং একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই রাসুলে খোদা (দঃ) এর বংশধারা চালু আছে। পুত্র সন্তান জীবিত না থাকায় মেয়ের মাধ্যমে বংশধারা চালু থাকা এটাও হুজুরে পাকের এক বিশেষত্ব।

বাল্যকাল ঃ জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়ার রীতি থাকলেও রাসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় কন্যাগণকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। মাতৃবিয়োগের পর ফাতিমা (রাঃ) এর প্রতি রাসুলে পাকের অনুরাগ আরো প্রবল হয়ে উঠে। তিনি ঘোষণা দেন- فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبني অর্থাৎ ফাতেমা (রাঃ) আমার শরীরের অংশ। যে তাঁকে রাগান্বিত করল মূলতঃ সে আমাকেই রাগান্বিত করল।[২৯]

হযরত রাসুলুল্লাহ (দঃ) যখন শেয়াবে আবু আলিবে অবরুদ্ধ ছিলেন, মা ফাতিমাও তাঁর সাথে ছিলেন। তথায় তাঁকে আদর-মমতায় আচ্ছন্ন রাখতেন শেরে খোদার মাতা ফাতেমা বিনতে আছাদ।[৩০] ইতিপূর্বে তিনি রাসুলে পাককেও লালন-পালন করেছেন। মা ফাতিমা রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে হিজরত করতে না পারলেও পরে তিনি হিজরত করে মদীনা শরীফে হুজুর পুর নুর (দঃ) এর সাথে মিলিত হন।

চরিত্র মাধুর্য্য ঃ স্বর্গীয় পরিবেশে যাঁদের জন্ম, নুরের দোয়ায় যাঁরা বেড়ে উঠেছেন, তাঁদের চরিত্র কেমন হবে তা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীর যত ভাল গুণ আছে, সবই মা ফাতেমার চরিত্রে সন্নিবেশিত ছিল। তাইতো তিনি سيدة نساء اهل الجنة অর্থাৎ 'জান্নাতী মহিলাদের সর্দার' হবার গৌরব অর্জন করেছেন। মহিলাদের মধ্যে যারা পূর্ণতা লাভ করেন তিনি তাদের অন্যতম। বর্ণিত আছে- كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء الا مريم ابنة عمران و اسية بنت مزاحم امرأة فرعون و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد صلي الله عليه و سلم

অর্থাৎ পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা পেলেও মহিলাদের মধ্যে চার জন ব্যতীত আর কেউ পাননি। তাঁরা হলেন হযরত মরিয়ম, ফেরআউনের স্ত্রী আছিয়া, মা খাদিজাতুল কোবরা ও মা ফাতেমাতুয যাহরা (রাঃ)।[৩১]

বৈবাহিক জীবন ঃ মদিনায় হিজরতের পরই তিনি বিয়ের বয়সে উপনীত হন। বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকলে রাসুলুল্লাহ (দঃ) এ বলে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে যে, এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।[৩২] এর কিছু দিনের মধ্যেই তিনি কাঙ্খিত আদেশ পেয়ে যান স্বীয় প্রভূর তরফ থেকে । হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন- একদা আমি রাসুলে পাকের নিকট থাকা অবস্থায় অহির প্রভাব তাঁকে আচ্ছাদিত করল এবং কিছুক্ষণ পর তা কেটে গেলে তিনি বললেন, "আমার নিকট হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে বললেন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আদেশ করেছেন যে, ফাতিমার (রাঃ) শাদিয়ে মোবারক যাতে হযরত আলীর (রাঃ) সাথে হয়।"[৩৩]

রাসুলে পাকের ইচ্ছাও তাই ছিল। ফলে তিনি কালবিলম্ব না করে আদেশ বাস্তবায়নে ব্রতী হন। বদর যুদ্ধের পর ২য় হিজরীর জিলকদ মাসে মতান্তরে জিলহজ্ব মাসে ৫০০ দিরহাম দেন মোহরে তাঁদের বিয়ে সংঘটিত হয়। খোদ রাসুলে খোদা (দঃ) এ বিয়ের আক্দ পড়ান। তখন ফাতিমার (রাঃ) বয়স ছিল ১৬ বৎসর মতান্তরে ১৮ বা ১৯ বৎসর। মসজিদে নববী শরীফে অনুষ্ঠিত এ বিয়েতে আগত মেহমানবৃন্দকে আপ্যায়ন করা হয় মধুর শরবত ও খেজুর দিয়ে।[৩৪] অবশ্য এখনো আরব দেশে বিয়েতে এ নিয়ম চালু আছে। হালকা নাস্তা-পানির ব্যবস্থা ছাড়া খাবারের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হয় না।

এ বিয়েতে উপহার স্বরূপ ১টি খাট, দুটি তোষক, ১টি গরম চাদর, বালিশ, পানির মশক ও লোটা দেয়া হয়।[৩৫]

এতে বুঝা যায়, বিয়েতে মেয়ের পক্ষ থেকে ছেলেকে উপহার দেয়া বৈধ। তবে সেটা দাবী করা অন্যায়। এখানেই যৌতুক ও উপহারের মধ্যে পার্থক্য। যৌতুক ভিক্ষার নামান্তর।

বিয়ের কিছুদিন পর রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর আদেশ পালনার্থে হযরত আলী (রাঃ) ওয়ালিমা করেন। ওয়ালিমা করা সুন্নাতে মোস্তফা (দঃ)।

দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ ঃ তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল অনাড়ম্বর, অথচ সুখে-শান্তিতে ভরপুর। হযরত আলী (রাঃ) যেমন ফাতিমা (রঃ) কে সম্মান ও ভালবাসতেন, তেমনি হযরত ফাতিমাও (রাঃ) স্বামীর অনুগত থেকে তাঁর সেবায় সদা সচেষ্ট থাকতেন। তদুপরি তিনি কখনো স্বামীর কাছে কোন অন্যায় আবদার করেননি, যা মিটাতে স্বামীর কষ্ট হবে।

তাই তাঁদের দাম্পত্য জীবন আমাদের জন্য আদর্শের মূর্ত প্রতীক।

বর্তমান যুগে পারিবারিক জীবনে এসব গুণাবলীর অভাব থাকায় পরিবারগুলি পরিণত হয়েছে অশান্তির কারাগারে। অবশ্য তাঁদের সংসারে যে অভাব ছিল না এমনটি নয়। অথচ এ অভাব-অনটন তাঁদেরকে সততা ও খোদাভীরুতা হতে বিচ্যুত করতে পারেনি।

একদা রাসুলে খোদা (দঃ) মা ফাতিমার (রাঃ) ঘরে গিয়ে দেখলেন তিনি অসুস্থ। কেমন আছ? জানতে চাইলে উত্তরে মা ফাতিমা বলেন- আমি অসুস্থ, তদুপরি ঘরে খাবার নেই। এতে রাসুলে পাকের নয়ন অশ্রুসিক্ত হল এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- يا بنية اما ترضين انك سيدة نساء هذه الامة অর্থাৎ প্রিয় নন্দিনী! একথার উপর কি তুমি সন্তুষ্ট নও যে, তুমি হবে উম্মতের মহিলাদের সর্দারিনী?[৩৬] এত অভাবের সংসারেও তিনি এতিম, মিসকিন ও বন্দীকে খাবার দিতে কৃপনতা করেননি। আল্লাহ বলেন- و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيما و اسيرا

অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহর ভালবাসায় এতিম, মিসকিন ও বন্দীকে খাদ্য দেন।[৩৭]

সন্দেহের অবসান ঃ হযরত আলী (রাঃ) ও মা ফাতিমা (রাঃ) সম্পর্কের দিক দিয়ে চাচা-ভাতিজি। হযরত আলী (রাঃ) রাসুলে পাকের চাচা আবু তালেবের পুত্র। প্রশ্ন হল, চাচা-ভাতিজির মাঝে বিবাহ বৈধ হল কিভাবে?

উত্তরে বলা যায়- তাঁরা আপন চাচা-ভাতিজি ছিলেন না বরং হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর বংশধারা এক দিকে এবং আবু তালেবের বংশধারা অন্য দিকে প্রবাহিত হয়। সুতরাং এ ধরনের বৈবাহিক বন্ধনে শরয়ী কোন প্রতিবন্ধকতা নেই আর সামাজিক যে অসঙ্গতি মনে হচ্ছে আরব দেশে তা আমলে নেয়া হয় না।

হাবীবে খোদার ভালবাসা ঃ হাবীবে খোদা (দঃ) হযরত আলী ও মা ফাতিমাকে (রাঃ) অত্যধিক ভালবাসতেন। যেহেতু তাঁরা দু'জনই নবী পরিবারের সদস্য, তাই দু'জনেই মর্যাদায় সমান। মা আয়েশাকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হল- اي الناس احب الي رسول الله صلي الله عليه و سلم قالت فاطمة فقيل من الرجال قالت زوجها رواه الترمذي

অর্থাৎ মানুষের মাঝে রাসুলের (দঃ) নিকট সবচেয়ে প্রিয়ভাজন কে? উত্তরে তিনি বললেন, ফাতেমা (রাঃ)। আর পুরুষের মাঝে? তিনি উত্তরে বললেন, তাঁর স্বামী (আলী রাঃ)।[৩৮]

রাসুলে পাক (দঃ) দুজনের কাকে বেশি স্নেহ করেন? হযরত আলীর (রাঃ) এমন প্রশ্নের উত্তরে হুজুর (দঃ) বলেন- انت اعز علي منها و هي احب الي منك অর্থাৎ তুমি আমার নিকট তার চেয়ে বেশি সম্মানিত, আর সে তোমার চেয়ে বেশি প্রিয়।[৩৯] এমন হেকমতভরা উত্তর শুনে দুজনই খুশি হলেন।

জীবন সায়াহ্নে মা ফাতিমা ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনের গন্ডি পেরিয়ে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি স্বীয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি ইন্তিকালকে নিজের জন্য আনন্দের মনে করলেও নবী প্রেমিকদের জন্য ছিল বড়ই বেদনার। প্রিয়নবী (দঃ) হায়াতে জিন্দেগীতে থাকতেই তিনি চির বিদায়ের সংবাদ অবহিত হন।

মা আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলেন- প্রিয় নবীর (দঃ) শেষ শয্যায় মা ফাতিমা (রাঃ) তাঁকে দেখতে এলে- مرحبا يا ابنتي বলে তিনি মা ফাতিমাকে স্বাগত জানিয়ে নিজের পাশে বসান। তিনি মা ফাতিমাকে কানে কানে কিছু কথা বলার পর তিনি কেঁদে উঠলেন। দ্বিতীয় বার কিছু কথা বলাতে তিনি হাসলেন। মা আয়েশা (রাঃ) এর হেতু জানতে চাইলে ফাতিমা (রাঃ) রাসুলে পাকের জীবদ্দশায় তা জানাতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। অবশ্য পরে তিনি তা প্রকাশ করেন এভাবে- প্রথমবার আমি রাসুলে খোদা (দঃ) এর ইন্তিকালের আবাস পেয়ে কেঁদেছিলাম। পরের বার তিনি বললেন, আমিই আহলে বাইতের মধ্যে সর্বপ্রথম পরকালে তাঁর সাক্ষাৎ করব। এটা শুনেই আমি খুশিতে হাসলাম।[৪০]

এ হাদিছ বাস্তবে প্রমাণিত হয় রাসুলে পাকের ইন্তিকালের ছয় মাস পর মা ফাতিমার (রাঃ) ওফাতের মধ্য দিয়ে। ওয়াকেদির বর্ণনা মতে- তিনি ১১ হিজরী সনের ৩রা রমজান মঙ্গলবার রাতে ইন্তিকাল করেন।[৪১]

অন্তিম ইচ্ছা ঃ মা ফাতিমার অন্তিম ইচ্ছা ছিল তাঁর লাশ বহন করে নেয়ার সময় এমনভাবে নেয়া, যাতে এটা কি পুরুষ না মহিলার লাশ কেউ বুঝতে না পারে। তাঁকে যেন রাত্রি বেলায় দাফন করা হয়।

হযরত আলী (রঃ) ও উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁকে গোসল দেন। ইমাম আলী বিন হোসাইনের মতে- হযরত আলী (রাঃ) তাঁর নামাজে জানাযায় ইমামতি করেন এবং রাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৪২]

অন্য বর্ণনায় আছে, ইন্তিকালের আগেই তিনি ভাল করে গোসল করে নেন এবং সেই গোসলেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৩]

মারকাদ শরীফ ঃ প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে মা ফাতিমার (রাঃ) মাজার শরীফের অবস্থান জান্নাতুল বাকীতে। অপর বর্ণনা মতে- রওজায়ে মুতাহ্হারার পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৪] প্রথম মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য।

পরিশেষে বলা যায়- মা ফাতিমা ও হযরত আলী (রাঃ) এর জীবনীতে আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষনীয় অনেক বিষয়। পারিবারিক সুখ-শান্তি অনেকাংশে নির্ভর করে মেয়েদের উপর।

ছেলে-মেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে মায়ের কোন বিকল্প নেই। হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর মত মা পাওয়ার কারণে ইমামদ্বয়ের (ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ)) মর্যাদা এত উপরে। পরবর্তীতে তাঁরা ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হননি। সেজন্য তাঁরা ইসলামের ইতিহাসে 'সাইয়্যেদুশ শুহাদা'র আসন অলংকৃত করেছেন।

আমাদের মা-বোনেরা যদি তাঁদের পথ অনুসরণ করেন, তাহলে সংসারে অবশ্যই শান্তি আসবে। তাঁদের ছেলেরা হাসনাইনে করিমাইনের ন্যায় সম্মানিত হবে।

আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ঈমানের পরিচায়ক আর বিদ্বেষ রাখা পাপ। তবে তা হবে بين الافراط و التفريط অর্থাৎ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আহলে বাইতের প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে অন্য সাহাবা বিশেষ করে শাইখাইনকে মন্দ বলা ভ্রষ্টতা।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে আহলে বাইতের উছিলায় দুনিয়া ও আখিরাতে নাজাত দান করুন। আমিন, বেহুরমতে নবীয়্যিল আমিন।

তথ্য নির্দেশক ঃ

১. সুরাতুশ শুরা- আয়াত নং- ২৩
২. এহয়াউল মাইত বেকাদ্বায়িলি আহলিন বাইত- আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি (রঃ) পৃষ্ঠা-১৪
৩. আল ইছাবা ফি তমঈজিস সাহাবা- ইবনে হাজার- ২য় খন্ড, পৃঃ ২৬৯
৪. সংক্ষিপ্ত সিরাতে ইবনে হিশাম- ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬২
৫. সাইয়্যেদুনাল ইমাম হোসেন- মুহাম্মদ মাহমুদ আব্দুল হালিম, পৃঃ ২২
৬. উসুলু আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাত-আবুল হাসান আশয়ারী, পৃঃ ৯৬
৭. তাহজিবুত তাহজিব- ইবনে হাজার আসকালানী ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৭০
৮. ইসলামী বিশ্বকোষ- ১৪তম ৰ্ড, পৃঃ ৫৬৬
৯. সাইয়্যেদুনাল ইমাম হোসেন- মুহাম্মদ মাহমুদ আব্দুল হালিম, পৃঃ ১৬
১০. সুরাতুল আহযাব, আয়াত ৫৭
১১. সালতানাতে মুস্তফা- মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ) পৃঃ ৩৪ (উর্দু)
১২. মেরকাত- মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) ১১তম খন্ড, পৃঃ ৩৭৪
১৩. ইসলামী বিশ্বকোষ- ১৪তম খন্ড, পৃঃ ৫৬৯
১৪. সিয়ারুস সাহাবা-শাহ মঈনুদ্দীন নদভী- ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৪৭
১৫. ইসলামের ইতিহাস- কে. আলী
১৬. সিয়ারুস সাহাবা-শাহ মঈনুদ্দীন নদভী- ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪৮
১৭. আল ইছাবা - ইবনে হাজার-২য় খন্ড, ২৬৯
১৮. খারেজী একটি বাতিল ফিরকার নাম। বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা শাহারাস্তানীর কিতাবুল মিলাল ওয়ান নিহাল দ্রঃ
১৯. তাহজিবুত তাহজিব- ইবনে হাজার আসকালানী ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৭১
২০. সিয়ারুস সাহাবা-শাহ মঈনুদ্দীন নদভী- ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৭
২১. তাহজিবুত তাহজিব- ইবনে হাজার আসকালানী ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৭০
২২. সুরাতুল আহযাব, আয়াত ৩৩
২৩. আল হিদায়া, ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১৫৮
২৪. সাইয়্যেদুনাল ইমাম হোসেন- মুহাম্মদ মাহমুদ আব্দুল হালিম, পৃঃ ১৫
২৫. ইসলামী বিশ্বকোষ- ১৪তম খন্ড, পৃঃ ৫৬৭
২৬. ইসলামী বিশ্বকোষ- ১৪তম খন্ড, পৃঃ ৫৬১
২৭. ইমাম হোসাইন- পৃঃ ২০
২৮. আল মাওরিদ- ড. বালাবাক্কী
২৯. মেরকাত শরহে মেসকাত- মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) ১১তম খন্ড, পৃঃ ৩৩৪
৩০. আল ইছাবা - ইবনে হাজার-৪র্থ খন্ড, ১৬০
৩১. বোখারী শরীফ
৩২. ইসলামী বিশ্বকোষ- ১৪তম খন্ড, পৃঃ ৫৬৬
৩৩. ঈমাম হোসাইন (রাঃ) পৃষ্ঠা ১৬
৩৪. ইসলামী বিশ্বকোষ- ১৪তম খন্ড, পৃঃ ৫৬৬
৩৫. প্রাগুক্ত।
৩৬. ইমাম হোছাইন- পৃঃ ১৮
৩৭. সুরাতুল দাহর/ইনসান, আয়াত ৮-২২
৩৮. মেরকাত শরহে মেশকাত, ১১তম খন্ড পৃঃ ৩৮৭
৩৯. ইমাম হোছাইন, পৃঃ ১৯
৪০ মেরকাত শরহে মেশকাত, ১১তম খন্ড পৃঃ ৩৭২
৪১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪তম খন্ড পৃঃ ৫৬৬
৪২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪তম খন্ড পৃঃ ৫৬৭
৪৩. আল ইছাবা, ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১৫৭
৪৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪তম খন্ড পৃঃ ৫৬৭

আহলে বায়তে রাসূল (দ.) এর মর্যাদা

মুহাম্মদ শায়েস্তা খান*

নবী করিম (দঃ) এর আওলাদগণকে আহলে বায়ত রাসূল (দঃ) বলা হয়। ইসলামী দুনিয়ার আকাশে তাঁরা যেন সুউজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি। তাঁরা সর্বস্তরের মানুষের আদর্শ। ইসলামের প্রতিটি নীতিমালা বাস্তবায়ন হয় তাঁদের জীবনেই। তাঁরা মানবতার মুক্তির দিশারী। তাঁদের অনুসরণই ইসলাম, তাঁদের প্রতি ভালবাসাই ঈমান। তাঁরা নবীজীর অসীম জ্ঞানসমুদ্র থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। নবীজীর দেখানো পথে তাঁরা তাঁদের জীবন পরিচালিত করেন। তাঁদের চাল-চলনে কুরআন সুন্নাহ সমুজ্জ্বল। তাই তাঁদের চরিত্র অনুপম। তাঁরা কুরআন-সুন্নাহর ধারক বাহক। নবুয়তের সমাপ্তির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের মাধ্যমেই বেলায়তের ধারা অব্যাহত থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের মাধ্যমেই ইসলাম জীবিত থাকবে। ইসলামে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা সুউচ্চ। কোরান সুন্নাহতে তাঁদের মান-মর্যাদার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা মু'মিন মাত্রেই ওয়াজিব। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাঁদেরকে মহব্বত করা মানেই রাসুল (দঃ) কে মহব্বত করা। তাঁরাই সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে আল্লাহর বানী পৌঁছে দিয়েছেন, দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে গিয়েছেন অসংখ্য মানুষকে ঈমানের মত মহামূল্যবান নেয়ামত দান করেছেন। কুফরী-শিরকীর অন্ধকার থেকে মানব সমাজকে আল্লাহর পথে নিয়ে এসেছেন। তাঁরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় জান-মাল, ধন-সম্পদ, আওলাদ-ফরজন্দ কোরবানী দিতে দ্বিধা করেননি। যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তা-ই আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী দিয়েছেন। কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা তার উজ্জ্বল প্রমান। যেখানে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) স্ব-পরিবারে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাই মুসলমান মানেই তাঁদের নিকট ঋণী। আল্লাহ এবং রাসুলেরও নির্দেশ তাঁদেরকে মহব্বত করা, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى অর্থাৎ হে হাবীব (দঃ)! আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে আমার দাওয়াতের জন্য (দ্বীন প্রচারের বিনিময়ে) আমার আত্মীয়-স্বজনের মহব্বত ব্যতীত কোন কিছুই চাই না। (শুরা- ২৩)

আন্তরিকতাপূর্ণ নিষ্কলুষ ভালবাসার এই দাবী মু'মিনদের উপর কেবল মাহবুবে খোদা (দঃ) এর নিকটাত্মীয়ের জন্যই রাখা হয়েছে। অত্র আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মুমিনদেরকে নবী করিম (দঃ)র আত্মীয় তথা বংশধরদের প্রতি মহব্বত প্রদর্শন করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অতএব ঈমানদারের উপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (দঃ) এর পরে আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) এর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা একান্ত অপরিহার্য। এ আয়াতের আলোকে বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইমাম বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (রঃ) বলেছেন "আল্লাহ তায়ালা ভাল করেই জানেন যে, আহলে বায়তের মাধ্যমেই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ ইসলাম পাবে, তাঁদের অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে। তাই পবিত্র কুরআনেই আল্লাহ তায়ালা তাঁদের মুহব্বতকে অবধারিত করে দিয়েছেন। মূলত স্বীয় স্বার্থেই মুমিনদের ঈমানী জীবনে এটি এক অপরিহার্য কর্তব্য।

আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) সর্বদা মানবতার কল্যাণকামী, পূত পবিত্র তাঁদের ব্যক্তিসত্ত্বা, নিষ্কলুষ তাঁদের জীবন চরিত। তাঁরা খোদাভীরু। তাঁরা সর্বদাই আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট। তাঁরাই আল্লাহর পূন্যাত্মা বান্দা। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের থেকে সব রকমের নাপাকী ও পঙ্কিলতা দূর করেছেন। এই মর্মে কুরআন পাকে তিনি ইরশাদ করেন-

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهر كم تطهيرا " হে নবী পরিবারবর্গ! আল্লাহ তো তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সর্বোতভাবে পবিত্র রাখতে চান। (আহযাব- ৩৩)

প্রিয়তম রাসূলের (দঃ) আহলে বায়ত, তাঁর পূণ্যবতী স্ত্রীগণ, তাঁর নূরানী বংশধরগণ সর্বোতভাবে পবিত্র এবং আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়।

অত্র আয়াতে নবী করিম (দঃ) এর পরিবারবর্গের ফজিলত ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের মর্যাদাকে সুউচ্চ করেছেন এবং তাঁদেরকে সর্ব প্রকারের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে পূত পবিত্র করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষনীয়। আয়াতে বলা হয়েছে- আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে পবিত্র করতে ইচ্ছা করেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা করেন বা করতে চান তা অবশ্যই করেন। যেমন- তিনি বলেছেন, "বস্তুত তাঁর সৃষ্টিকার্য এরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে বলেন হও, অমনি তা হয়ে যায়। (ইয়াসীন- ৮২)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- رحمة الله و بركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد হে আহলে বায়ত! আল্লাহর রহমত ও বরকতসমূহ তোমাদের প্রতিই রয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনিই সমস্ত প্রশংসার মালিক এবং সম্মানের অধিকারী।

* মুদাররিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, যোলশহর, চট্টগ্রাম।

বিশুদ্ধ মত অনুসারে আহলে বায়তে রাসূল (দঃ)গণ হচ্ছেন- খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ্জাহরা (রাঃ) ও শেরে খোদা ইমাম আলী (রাঃ) দম্পতির মাধ্যমে আওলাদে রাসূলের যে বংশ ধারা অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন ও সৈয়দা যয়নব (রাঃ) এর বংশধরগণ। কোন কোন মনীষী, নবীজীর সহধর্মিনীগণ তথা উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণকে আহলে বায়তের অর্ন্তভূক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আহলে বায়তে রাসুল (দঃ) এর ফজিলত

হুজুর নবী করিম (দঃ) এর আহলে বায়ত হওয়ার গৌরব অর্জন করা মানে দুনিয়া আখিরাতে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হওয়া। কারন রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর বংশধারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম বংশধারা। কারন তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীবের (দঃ) সন্তান। তাঁদের সাথে রাসুল (দঃ) রক্তের সম্পর্ক।

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণ এ কথার উপর ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, আওলাদে রাসূল (দঃ) তথা সৈয়দজাদাগণ বংশের দিক থেকে সর্বোত্তম মানুষ। তবে শরীয়তের অন্যান্য হুকুম আহকামের ব্যাপারে তারা সাধারণ মানুষের মত। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহতে আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) এর প্রশংসায় অনেক প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, "(হে আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) গণ!) আল্লাহ তায়ালা আপনাদের থেকে সকল প্রকার অপবিত্রতা দূরীভূত করতে ইচ্ছা করেছেন এবং তিনি আপনাদেরকে পূতঃ পবিত্র করবেন।"

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, অত্র আয়াতে "আহলে বায়ত শব্দটি পরিবারের সদস্য ও বংশধরদেরকে শামিল করে। তাই রাসূল (দঃ) এর বিবিগণ তাঁর পরিবারের সদস্য হিসেবে আহলে বায়ত। আর তাঁর (দঃ) আত্মীয়-স্বজন বংশধর হিসেবে আহলে বায়ত।

এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে নবী করিম (দঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর প্রসঙ্গে। অর্থাৎ আয়াতে আহলে বায়ত দ্বারা তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ অভিমতের সমর্থনে আরো বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। যেমন ঃ একদা নবী করিম (দঃ) তাঁদেরকে নিয়ে এক জায়গায় বসে একটি চাদর দ্বারা আবৃত হলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়ত, এরা আমার প্রিয়ভাজন। তাঁদের থেকে আপনি সব প্রকারের পঙ্কিলতা দূর করুন এবং তাঁদের পূত পবিত্র করুন। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁদের উপর চাদর রাখলেন এবং তাঁর হস্ত মোবারক তাঁদের উপর রেখে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! এরা মুহাম্মদ (দঃ) এর পরিবারবর্গ। আপনার অফুরন্ত রহমত ও বরকতের ধারা তাঁদের প্রতি অহরহ বর্ষণ করুন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও অতীব সম্মানিত।

যে সমস্ত আয়াতে করীমা আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) এর ফজিলত বর্ণনা পূর্বক অবতীর্ণ হয়েছে তন্মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রনিধানযোগ্য। মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন فمن حاجك فيه من بعد ما جائك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم و نسائنا و نسائكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين

"অত:পর হে মাহবুব! যে ব্যক্তি আপনার সাথে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিতর্ক করে আপনার নিকট ওহী আসার পরও তবে তাদেরকে বলে দিন, এসো আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের। অতঃপর "মোবাহেলা" করি। তারপর মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত দিই।" (আলে ইমরান - ৬১)

তাফসীরবেত্তাগণ বলেছেন, যখন উক্ত আয়াতে অবতীর্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রাঃ) কে ডাকলেন। অত:পর ইমাম হোসাইন (রা:)কে কোলে নিলেন এবং ইমাম হাসান (রাঃ) এর হাত ধরে চলতে লাগলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাঁর পেছনে এবং হযরত আলী (রাঃ) উভয়ের পেছনে চলতে লাগলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (দঃ) দোয়া করলেন- হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়ত।

উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিয়মান হয় যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আওলাদগণ এবং তাঁদের বংশধরদেরকেই রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সন্তান বলা হয়। তাঁদের বংশীয় ধারা রাসুল (দঃ) এর দিকে বিশুদ্ধ রূপে প্রবাহিত। আর এহেন বংশানুক্রমিক ধারা তাঁদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে উপকৃত করবে।

কথিত আছে যে, একবার বাদশাহ হারুনুর রশীদ ইমাম মূসা কাজেম (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কিভাবে দাবী করেন যে আপনারা রাসূল (দঃ) এর বংশধর? অথচ আপনারা হযরত আলীর বংশধর। কারন বংশের নিসবত বা সম্পর্ক হয় দাদার দিকে, নানার দিকে নয়। উত্তরে তিনি নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন-

و من ذريته داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون و كذالك نجزي المحسنين - و زكريا و يحيي و عيسى و الياس

আর তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে দাউদ, সোলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা এবং হারুনকেও এবং আমি অনুরূপভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি সৎকর্মপরায়নদেরকে এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও।

হযরত ঈসা (আঃ) এর পিতা ছিল না। এতদসত্বেও তাঁকে নবীগণের বংশধর বলে কুরআন পাকে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা করা হয়েছে মায়ের দিক থেকে। এভাবে আমরাও রাসূল (দঃ) এর সাথে আওলাদের সম্পর্কে সম্পৃক্ত হয়েছি আমাদের মা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুজ্জহরা (রাঃ) এর মাধ্যমে। হারুনুর রশীদকে সম্বোধন করে তিনি আরো বলেন, "হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, যখন আয়াতে "মোবাহেলা" অবতীর্ণ হয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান, হোসাইন (রাঃ) ব্যতিত অন্য কাউকে ডেকে ছিলেন?

পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) এর ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপূর্বক অসংখ্য হাদীস শরীফও রয়েছে। যেমন ঃ হযরত আবু ইয়ালা (রাঃ), হযরত সালমা বিনতে আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "তারকারাজি আসমানবাসীদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে, আমার আহলে বায়ত আমার উম্মতদেরকে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ রাখে।"

ইমাম আহমদ (রঃ) এর অন্য বর্ণনায় আছে, নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "আমার আহলে বায়তগণ যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখনই দুনিয়াবাসীদের নিকট ঐ সমস্ত বালা-মুসিবত আসবে, যেগুলোর ব্যাপারে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল।" ইমাম হাকেম (রাঃ) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তায়ালা আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তারা যদি আল্লাহ তায়ালার ওয়াহদানিয়্যাত (একত্ববাদ) স্বীকার করে এবং আমাকে রাসূল হিসেবে মেনে নেয়, তাহলে তাঁদেরকে কোন ধরনের আজাবের সম্মুখীন হতে হবে না।"

ইমাম তিরমিজী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে যা কিছু রেখে গেলাম তা যদি তোমরা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে আমার অবর্তমানে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। মূলত আমি যা রেখে যাচ্ছি তার একটির চেয়ে অপরটি বড় ও মর্যাদাপূর্ণ। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। যার বিস্তৃতি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত। আর অপরটি হচ্ছে আমার আওলাদগণ, আহলে বায়তগণ। তাঁরা কখনো আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, এভাবে আমি 'হাউজে কাওসারে' উপনীত হব। অতএব ভেবে দেখ, তাঁদের সাথে তোমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত। অন্য এক বিশুদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে, নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "আমার আহলে বায়ত তোমাদের মধ্যে হযরত নূহ (আঃ) এর কিস্তিস্বরূপ। যারা তথায় আরোহন করবে (যারা তাঁদেরকে সম্মান করবে, ভালবাসবে, অনুসরণ করবে) তারা নাজাত পাবে; আর যারা তা থেকে দূরে সরে যাবে, ত্যাগ করবে, তারা ডুবে মরবে, ধ্বংস হবে। আমার আহলে বায়ত তোমাদের মধ্যে "বাবে হিত্তা" স্বরূপ; যারা তথায় প্রবেশ করবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।

ইমাম দায়লামী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "মুহাম্মদ (দঃ) এবং মুহাম্মদ (দঃ) এর পরিবারবর্গের উপর দরূদ না পড়া পর্যন্ত কোন দোয়া আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না।"

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) তার রচিত কবিতায় বলেছেন, "হে আহলে বায়তে রাসূলগণ! আপনাদের প্রতি মহব্বত প্রদর্শন ফরজ করণপূর্বক আল্লাহ তায়ালা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। আপনাদের অসীম সম্মানের জন্য এইটুকু যথেষ্ট যে, আপনাদের উপর যারা দরূদ পড়বে না তাদের নামাজ হবে না।"

মুহাক্কেকীন ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, "বাস্তবতার নিরিখে একটু চিন্তা করলেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) যুগে যুগে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার লক্ষ্যে তথা দিশেহারা মানুষকে হেদায়াত করার জন্য তাঁরা মাতৃভূমি ত্যাগ করে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে গিয়েছেন। তাঁরাই নবী করিম (দঃ) এর আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার প্রিয়ভাজন হিসেবে সমধিক পরিচিত হয়েছেন। তাঁদের আলেমগণ শরীয়তের ধারক বাহক, জুলুম-অত্যাচারকে নিশ্চিহ্নকারী। তাঁরা উম্মতের জন্য বরকতের আধার, দুশ্চিন্তার নিরাময় তাঁদের সান্নিধ্য। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের উছিলায় যুগে যুগে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবেন। তাঁরাই দুনিয়াবাসীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়, যেমনিভাবে তারকারাজি আসমানবাসীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়। হুজুর (দঃ) কি তাঁদের সম্পর্কে বলেন নি যে, "তোমরা তাঁদের কাছ থেকে শেখো, তাঁদেরকে শেখাতে যেও না। আর যদি তোমরা তাঁদের বিরোধিতা কর, তাহলে তোমরা শয়তানের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাঁদের অনুসরণকারী কখনো গোমরাহ হবে না। তাঁরা তোমাদেরকে কখনো বিভ্রান্ত করবেন না এবং কখনো তোমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না। তাঁরাই এই উম্মতের নিরাপদ আশ্রয়। আল্লাহ তায়ালা প্রজ্ঞা এবং হেকমত তাঁদের মধ্যেই দিয়েছেন। খোদার

রহস্যময় জ্ঞানভান্ডারের অধিকারী আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকেই করেছেন। যে তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে পথভ্রষ্ট। যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে মুনাফিক। তাঁরা হাউজে কাউছারের পাড়ে নবীজীর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত কখনো বিচ্ছিন্ন হবেন না"।

কিন্তু অপরদিকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, "হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (দঃ)! হে সাফিয়া বিনতে আব্দুল মোত্তালিব! হে আব্দুল মোত্তালিবের বংশধরগণ! তোমরা নিজেদেরকে দোজখ থেকে বাঁচাও। কেননা, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে কোন কিছুর অধিকারী নই।"

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম এ প্রসঙ্গে বলেন, উল্লেখিত হাদীস এবং আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) এর শানে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। হাদীসটির অর্থ হচ্ছে , তিনি আল্লাহর নিকট কারো লাভ-ক্ষতি করার মালিক হননি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মালিক বানিয়েছেন শুধুমাত্র তাঁর আত্মীয়-স্বজনের জন্য নয় বরং তিনি সকলের জন্যই শাফায়াতের মাধ্যমে কল্যাণকারী। অর্থাৎ তিনি স্বেচ্ছায় কোন কিছুর মালিক হননি কিন্তু তাঁর প্রভু অনুগ্রহপূর্বক যা কিছুর মালিক বানিয়েছেন তিনি সেগুলোর মালিক। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তা তো তিনি (দঃ) নিজ থেকে হন নি। আল্লাহ তাঁকে করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর নিকট তোমাদের উপকারের জন্য আমি যথেষ্ট নই।" অর্থাৎ আমি নিজ থেকে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। বরং যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছেন। যেমন ঃ শাফায়াত, মাগফিরাত ইত্যাদি দ্বারা তোমাদের উপকার করব। এতে তিনি (দঃ) তাঁর উছিলায় আল্লাহর রহমত বর্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আহলে বায়তকে উদ্দেশ্য করে রাসূল (দঃ) বলেছেন, তোমাদের জন্য আল্লাহর রহমতের বারি অবধারিত। তা তোমাদেরকে আমি সিক্ত করব। অর্থাৎ তিনি তাঁদেরকে আল্লাহর রহমত দ্বারা বেষ্টিত করবেন। কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে তিনি তাঁদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। সাথে সাথে তাঁদের উপর অহরহ আল্লাহর রহমত বর্ষণের ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নবী করিম (দঃ) এর প্রতি আহলে বায়তের সম্বন্ধই তাঁদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা ও সম্মানিত হওয়ার অন্যতম কারন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম হাকেম (রঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "ফাতেমা আমার অঙ্গ বিশেষ। তাঁকে কেউ কষ্ট দিলে তা দ্বারা আমি কষ্ট পাই। তাঁকে কেউ সন্তুষ্ট করলে তাতে আমি সন্তুষ্ট হই। কিয়ামতের দিন সমস্ত রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন হবে কিন্তু আমার রক্তের সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে না।" অর্থাৎ কিয়ামতের কঠিন মূহুর্তেও আহলে বায়তে রাসূল (দঃ)গণ এই পবিত্রতম সম্পর্কের কারণে উপকৃত হবেন, সম্মানিত হবেন। শুধু নিজেরাই নাজাত পাবেন না বরং গুনাহগার উম্মতের নাজাতের উছিলা হবেন।

ইমাম হাকেম (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, আমার বংশধরদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাত (একত্ববাদ) স্বীকার করবে এবং আমার রেসালতকে মেনে নেবে তাঁদেরকে আজাব দেয়া হবে না।

ইমাম ইবনে হাজর (রঃ) তাঁর ফতোয়াগ্রন্থে বর্ণনা করেন, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, অজ্ঞ আওলাদে রাসূল (দঃ) আর বিজ্ঞ আলেমের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই দুইজনের মধ্যে কে অধিকতর সম্মান পাওয়ার যোগ্য? এ ধরনের দু'জন এক জায়গায় সমবেত হলে এবং তাতে কোন কিছু পরিবেশন করতে হলে কাকে দিয়ে শুরু করা উত্তম? আর এই দুজনের হাত চুম্বন করতে চাইলে কার হাত প্রথমে চুম্বন করবে?

উত্তরে তিনি বলেন, উভয়জনই মর্যাদাবান। তবে যিনি হুজুর (দঃ) এর আওলাদ, তিনি তাঁর (দঃ) অঙ্গস্বরূপ। আর হুজুর (দঃ) এর আওলাদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা দুনিয়ার কোন মর্যাদা, সম্মানের সাথে তুলনীয় হতে পারে না। এজন্য বিজ্ঞ মনীষীগণ বলেন, হুজুর (দঃ) এর রক্তের সম্পর্কের সাথে দুনিয়ার অন্য কোন সম্পর্ককে তুলনা করতে পারবে না।

আর বিজ্ঞ জ্ঞানী, যে বাস্তবক্ষেত্রে তার জ্ঞানকে প্রয়োগ করে, যদি মুসলিম সমাজ উপকৃত হয় এবং পথহারা মানুষ পথের সন্ধান পায়, এমন ওলামায়ে কেরাম রাসূল (দঃ) এর সত্যিকার প্রতিনিধি, তাঁর জ্ঞান ভান্ডারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। অতএব আল্লাহ তায়ালা যাকে সুস্থ মস্তিষ্ক দিয়েছেন, তার উচিৎ উভয়কে পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করা। তবে উভয় শ্রেণীর মানুষ যদি এক স্থানে সমবেত হয়, তখন আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) কে প্রাধান্য দেয়া কর্তব্য। কেননা হুজুর (দঃ) ইরশাদ করেছেন- "সর্বক্ষেত্রে কুরাইশদেরকে প্রাধান্য দাও।" কারন তাঁদের সাথে হুজুর (দঃ) এর নাড়ীর সম্পর্ক। আর এই সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁদেরকে সর্বক্ষেত্রে শীর্ষে রাখতে হবে।

সৈয়দ বা শরীফ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ পরম্পরা বা রক্তের সম্পর্ক হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর সাথে মিলিত হওয়া। অর্থাৎ আওলাদে রাসূল (দঃ) মূলত তাঁরাই। তাঁরাই সেই সুমহান মর্যাদার অধিকারী যার স্বীকৃতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে দিয়েছেন এবং তাঁদের শানেই বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদীস।

হুজুর (দঃ) এর বংশধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার ফজিলত ঃ

সহীহ হাদীস শরীফসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী হুজুর (দঃ) এর বংশধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার উপকারীতা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই বিদ্যমান। আর এই মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং হুজুর (দঃ)। ইবনে আসাকীর হযরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামত দিবসে সমস্ত রক্তের সম্পর্ক এবং সব রকমের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে, কিন্তু আমার রক্তের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে।"

আলোচ্য হাদীস এবং এই বিষয়ের উপর আরো অসংখ্য হাদীস এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, হুজুর (দঃ) এর সাথে রক্তের সম্পর্ক, তাঁর বংশধারায় সম্পৃক্ত হওয়া দুনিয়া আখিরাতে অনেক সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপার। এর উপকারীতা অপরিসীম। দুনিয়ার কোন সম্পর্ক এর সাথে তুলনীয় নয়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামতও বটে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, তাঁদের এই সম্মান ঐ হাদীস শরীফের বিপরীত নয়, যে হাদীস শরীফে হুজুর (দঃ) তাঁর আহলে বায়তগণকে খোদাভীরু হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান পূর্বক বলেছেন যে, তিনি তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহর থেকে বে-নেয়াজ (অমুখাপেক্ষী) নন। তিনি তাঁদের কারো ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি করার অধিকারী নন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এই অধিকার দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের উভয় জাহানের উপকার করতে পারবেন। তখন, যে হাদীসে তিনি (দঃ) বলেছেন, "আমি তোমাদের কোন লাভ-ক্ষতির অধিকার রাখি না, সেটার অর্থ দাঁড়াবে- আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত (যা তিনি আমাকে অনুগ্রহ করেছেন) তোমাদের কোন লাভ-ক্ষতি করতে পারব না। অর্থাৎ আমি নিজ থেকে তোমাদের কোন উপকার করব না বরং আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহশীল হয়ে উম্মতের জন্য সুপারিশ করার এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার যে নিয়ামত আমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আমি তোমাদের উপকার করব। মূলত এখানে হুজুর (দঃ) তাঁর আওলাদগণকে সম্বোধনটা করেছেন ভীতি প্রদর্শনমূলক, যাতে তাঁরা আল্লাহর বন্দেগীতে উদাসীন না হন, অবহেলা না করেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত এই নিয়ামতের প্রতি যত্নবান হন। এভাবে ইমাম বাযযার, ইমাম তিবরানী ও আরো অনেক মুহাদ্দিসীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন, (বড় হাদীসের অংশ বিশেষ) হুজুর (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "মানুষের কি হয়েছে যে, তারা ধারণা করে আমার আত্মীয়তা সম্পর্ক কোন উপকারে আসবে না? সকল বংশধারা ও রক্তের সম্পর্ক কিয়ামতের দিন ছিন্ন হবে। একমাত্র আমার বংশধারা এবং সম্পর্ক ছিন্ন হবে না এবং নিশ্চয় আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক দুনিয়া হতে আখিরাত পর্যন্ত বিস্তৃত।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম বায়হাকী, ইমাম হাকেম (রঃ), হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)- হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (দঃ) কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খোতবা দানরত অবস্থায় এই বলতে শুনেছি, "লোকদের কি হয়েছে যে, তারা বলে বেড়ায় রাসূল (দঃ) এর আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন সম্প্রদায়ের কাজে আসবে না? তা অবশ্যই না। মহান আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে বিদ্যমান থাকবে। এর দ্বারা আমার বংশধরগণ উভয় জাহানে সম্মানিত ও লাভবান হবে। হে লোকগণ! জেনে রাখ, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য হাউজে কাউছারের সম্মুখে অপেক্ষমান থাকব।"

হযরত ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) এর কন্যা বিবাহ করার পর হুজুর (দঃ) এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের দিনে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কি আমাকে সংবর্ধনা দেবে না? আমি রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে বলতে শুনেছি "কিয়ামতের দিন সব বংশের এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে শুধুমাত্র আমার সম্পর্ক ব্যতীত।"

আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) এর ভালবাসার প্রতি উৎসাহিতকরণ এবং তাঁদের বিদ্বেষ পোষণকারীর প্রতি ভীতি প্রদর্শন ঃ

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আহলে বায়তে রাসূলের (দঃ) প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন সকল মুসলমানের আবশ্যকীয় কর্তব্য। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও মুসলিম ইমামদের সুচিন্তিত অভিমত এ কথার প্রমাণ বহন করে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়নবী (দঃ) কে বলেন, "(হে হাবীব (দঃ)!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট দ্বীন প্রচারের বিনিময়ে কিছুই চাই না। শুধুমাত্র চাই, আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালবাসা।" উক্ত আয়াতই প্রমাণ করে, প্রত্যেক মুমিনের উপর নবী করিম (দঃ) এর পরিবারবর্গের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা ফরজ।

ইমাম আহমদ, তিবরানী ও হাকেম (রঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হল, তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আপনার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন কারা? যাদের প্রতি ভালবাসা আমাদের উপর ওয়াজিব?

তিনি (দঃ) উত্তরে বললেন, "এঁরা হলেন আলী, ফাতেমা ও তাঁদের দুই সন্তান (রাঃ)। হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ)
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আয়াতে القربى থেকে উদ্দেশ্য- হুজুর নবী করিম (দঃ) এর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনগণ।"
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহ তায়ালার বাণী-
ومن يقترف حسنة و نزدله فيها حسنا এর الحسنة থেকে উদ্দেশ্য হুজুর নবী করিম (দঃ) এর পরিবারবর্গের প্রতি মুহাব্বত।
ইমাম ইবনে মাজা (রাঃ) হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম (দঃ) ইরশাদ
করেন, "যদি আমার পরিবারবর্গের কেউ কোন সম্প্রদায়ের আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটায়
তাদের কি অবস্থা হতে পারে? (জেনে রাখ) আমি ঐ সত্ত্বার শপথ করে বলছি যার কুদরতী হস্তে আমার প্রাণ, কারো অন্তরে
ঈমান প্রবেশ করবে না যতক্ষণ সে আমার আহলে বায়তকে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ও আমার আত্মীয়তার মূল্যায়ন করে
ভালবাসবে না।"
অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "কোন বান্দা পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ সে
আমাকে ভালবাসবে না। আর আমার ভালবাসা হবে না যতক্ষণ না সে আমার আহলে বায়তকে ভালবাসবে।" ইমাম
তিরমিযী ও ইমাম হাকেম (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন,
"তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতে কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁকে ভালবাস। আর আল্লাহর ভালবাসায় আমাকে ভালবাস। আর আমার
ভালবাসায় আমার আহলে বায়তকে ভালবাস।"
ইমাম দায়লামী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটি জিনিসের
আদব শিক্ষা দাও। (১) তোমাদের নবী (দঃ) এর প্রতি ভালবাসা, (২) তাঁর (দঃ) পরিবারবর্গের প্রতি ভালবাসা এবং (৩)
কোরআন পাক তেলাওয়াত।"
ইমাম তিবরানী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) সর্বশেষ যে কথাটি বলেছেন
সেটি হচ্ছে, "আমার আহলে বায়তকে আমার উত্তরাধিকারী হিসেবে মান্য করবে।"
ইমাম তিবরানী ও আবুল শায়খ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট তিনটি
জিনিস অতীব সম্মানিত। যারা এগুলোকে মূল্যায়ন করে তাদের দ্বীন-দুনিয়ার সমস্ত বিষয়াদিকে আল্লাহ তায়ালা হেফাজত
করেন। আর যারা ওগুলোর প্রতি উদাসীন তারা আল্লাহর হেফাজত থেকে বঞ্চিত। তখন জিজ্ঞাসা করা হল, (ইয়া
রাসুলাল্লাহ (দঃ)!) ওগুলো কি? উত্তরে তিনি বলেন, "ওগুলো হচ্ছে ইসলামের সম্মান, আমার সম্মান ও আমার আহলে
বায়তের সম্মান।"
ইমাম বায়হাকী ও ইমাম দায়লামী (রঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেছেন, কোন বান্দা পরিপূর্ণ ঈমানদার
হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার নিকট তার আত্মা থেকে অধিক প্রিয় না হই। আমার আহলে বায়ত তার আওলাদের
চেয়ে অধিক প্রিয় না হয় এবং আমার পরিবারবর্গ তার নিকট তার পরিবারবর্গের চেয়ে অধিক প্রিয় না হয়।" ইমাম বুখারী
তাঁর বিশুদ্ধ গ্রন্থে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "হে মানব সন্তান! তোমরা মুহাম্মদ (দঃ)
কে তাঁর আহলে বায়তের মধ্যে সম্মান কর এবং তাঁর (দঃ) মূল্যায়ন কর তাঁদের মধ্যে। সাবধান! তাঁদেরকে কষ্ট দিও না।"
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, "ঐ সত্ত্বার শপথ যার হস্তে আমার প্রাণ, আমার আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে
রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর আত্মীয়-স্বজন আমার নিকট অধিক প্রিয়।
কাজী আয়াজ (রাঃ) শেফা শরীফে লিখেছেন, হুজুর নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, আলে মুহাম্মদ (হযরত মুহাম্মদ
(দঃ) এর আওলাদগণ) এর যথাযথ মূল্যায়নেই দোজখ থেকে মুক্তি, তাঁদের প্রতি ভালবাসাই পুলসিরাত পারের গ্যারান্টি
এবং তাঁদের প্রতি হৃদ্যতাই আজাব থেকে নিষ্কৃতি।

আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও তাঁদেরকে কষ্ট দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি ঃ

আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও শত্রুতা পোষণ করার ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনাপূর্বক ইসলামী শরীয়তে
অনেক প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অতএব আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (দঃ) এর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যারা দ্বীনের উপর অটল
থাকতে চায়, তারা যেন আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) এর প্রতি বিদ্বেষ, শত্রুতা পোষণ, ক্ষতি সাধন তথা যে কোন প্রকারের
অকল্যাণ কামনা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে। কারন, এমন মনোভাব যে কোন ব্যক্তির দুনিয়া আখিরাত ধ্বংস হওয়ার
জন্য যথেষ্ট। আর এ ধরনের কর্মকাণ্ড স্বয়ং নবী করিম (দঃ) এর প্রতি ধৃষ্টতা পোষণ ও তাঁকে কষ্ট দেয়ার অন্তর্ভূক্ত। এ
প্রসঙ্গে অসংখ্য হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর আলোকে সারমর্ম হিসেবে ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, যে
আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) কে কষ্ট দিল, সে যেন নবী করিমকে (দঃ) কষ্ট দিল। আর যে নবী করিমকে (দঃ) কষ্ট দিল সে

যেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকে কষ্ট দিল। ফলে সে অভিশপ্ত হল এবং তার জন্য 'আজাব' অবধারিত হল, ঐ আয়াতে করীমা
তাদের জন্য প্রযোজ্য হল, যাতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- "নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দঃ) কে কষ্ট দেয়
তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত দেন এবং তাদের জন্য তৈরী রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"
অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "(হে মুমিনগণ!) "তোমাদের কখনো রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে কষ্ট দেয়া উচিত নয়।"
ইমাম তিবরানী ও ইমাম বায়হাকী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করিম (দঃ) মিম্বরের উপর খোতবা দানরত
অবস্থায় ইরশাদ করেন, "ঐ সম্প্রদায় সমূহের কি হলো, যে তারা আমার আওলাদ ও আত্মীয়-স্বজনকে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে
আমাকে কষ্ট দেয়? সাবধান! যারা তাদেরকে কষ্ট দেয়, তারা যেন আমাকেই কষ্ট দেয়। আর যারা আমাকে কষ্ট দেয় তারা
যেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীনকেই কষ্ট দেয়।"
ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজা (রাঃ) ও ইমাম হাকেম (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেন, যারা আহলে
বায়তে রাসূলের (দঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। যারা তাঁদেরকে শান্তি দেয় আমি তাদেরকে
নিরাপত্তা দিই।
মোল্লা ওমর তাঁর সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ করেছেন "খোদাভীরু মুমিনরাই আহলে বায়তকে
ভালবাসে আর দুর্ভাগা মুনাফিকরাই তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।
ইমাম তিবরানী ও ইমাম হাকেম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, "যদি কোন লোক মকামে
ইব্রাহীম ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে নামাজ, রোজা তথা ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থেকে মৃত্যু বরণ করে তবুও
সে জাহান্নামী হবে, যদি আহলে বায়তে রাসূলের (দঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী হয়।"
হুজুর নবী করিম (দঃ) আরো ইরশাদ করেছেন, ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তায়ালা অতীব কঠোর যারা আমার আহলে
বায়তকে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে আমাকে কষ্ট দেয়। (ইমাম দায়লমী)।
উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) এর মহত্ত্ব, তাঁদের প্রতি মহব্বতের
গুরুত্ব, তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের ভয়াবহতা, তাঁদের আনুগত্যের উপকারীতা আশা করি সুস্পষ্ট হয়েছে। এ নিবন্ধের
প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন ঃ
আহলে বায়তে রাসূল (দঃ) হচ্ছেন আওলাদে রাসূল তথা নবী করিম (দঃ) এর বংশধরগণ।
তাঁদের প্রতি ভালবাসা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে মুমিনদের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন।
তাঁদেরকে মহব্বত করা, সম্মান করা, সু-সম্পর্ক বজায় রাখা মানে রাসূলকে (দঃ) করা।
তাঁদের অনুসরণ ও আনুগত্যই হচ্ছে ইসলাম। তাঁদের পথ সিরাতুল মুস্তাকীম।
তাঁদের সান্নিধ্য উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ) এর নিরাপদ আশ্রয়।
তাঁদের প্রকৃত গোলামীতেই বেলায়ত অর্জিত হয়, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করা যায়।
আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁদের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা প্রদর্শনের এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁদের গোলামীতে আত্মনিয়োগ করার
তৌফিক দান করুন। আমীন। বেহুরমাতে সৈয়দিল মুরসালীন।

তথ্যপঞ্জি ঃ

❖ احياء الميت بفضائل ال البيت ـ الامام جلال الدين السيوطي
❖ علموا اولادكم محبة ال بيت النبي صلي الله عليه و سلم ـ الدكتور محمد عبده يماني
❖ اهل البيت و احفاد النبي صلي الله عليه و سلم ـ هشام خضر
❖ في الرحب الطاهرة ـ الاستاذ السيد محمد وهبي ابراهيم
❖ نور الابصار ـ العلامة مؤمن بن حسن مومن الشبلنجي
❖ العقائد و المسائل ـ الاستاذ المفتي محمد عبد القيوم القادري
❖ সফীনা-ই-নূহ : আল্লামা শফী উকাড়ভী (রঃ)

সংকটাপন্ন মুসলিম বিশ্ব ও কারবালার শিক্ষা

মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিম*

ভূমিকা ঃ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন গোপন ধনভান্ডার ছিলেন। তিনি আমাদের প্রিয় নবী ছরকারে দো-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামার উছিলায় এ নশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করে তাতে মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যখন অসভ্যতার ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত বিশ্বধরা, মানবতা, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব তিরোহিত, শান্তি-মুক্তির নেশায় মানবজাতি ত্রাহি ত্রাহি রব তুলেছিলো, তখনি অধঃপতিত মানবজাতির চিরমুক্তির নিমিত্তে মহান রাব্বুল আলামীন নবীকুল সর্দার, ছরকারে দো-আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, আঁকা ও মাওলা হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামাকে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' সমগ্র বিশ্ব জগতের 'রহমত' তথা কল্যাণের মূর্ত প্রতীক হিসাবে প্রেরণ করেন। দিনমণির আগমণে যেমনি রজনীর তমসা বিদূরিত হয়; ঠিক তেমনি প্রিয়নবীর আগমনে বিশ্ব জাহানে শান্তি, মুক্তি ও রহমতের ফল্গুধারা বয়ে যায়। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে মজিদে এরশাদ করেন " হে হাবীব (দঃ)! আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জাহানের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামার আনীত ও প্রচারিত মহান ও একমাত্র দ্বীন "আল্ ইসলাম'র অনুপমাদর্শ মহানবী (দঃ) এর তিরোধানের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনের পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে ক্ষয় হতে থাকে এবং বিশিষ্ট সাহাবী, কাতেবে ওহি হযরত আমিরে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর অবর্তমানে তদীয় পুত্র পাপিষ্ঠ পূরাচার এজিদ চক্রান্তের মাধ্যমে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে স্ব-পরিবারে শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে ন্যাক্কারজনক ঘটনার সৃষ্টি হয়।

ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্য ও শাশ্বত আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়ায় মুসলিম সমাজ ক্রমান্বয়ে প্রিয়নবী (দঃ) এর আদর্শ বিচ্যুত হয়ে পড়ে। মুসলিম জাতির এ দূরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন ডঃ আল্লামা ইকবাল এভাবে- "বিশ্ব আজি অন্যের চায় মুসলমানে চায়না ফেরে কাল্পনিক এক জগত আছে মাত্র এ'জাতির তরে।" মুসলিম জাতির এ দূরবস্থার সুযোগে খোদাদ্রোহী নাস্তিক্যবাদী, নবীদ্রোহী, কপট ইহুদী, খৃষ্টান চক্রান্তও ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন কলাকৌশল ও ভ্রান্তনীতির মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে অনৈক্যের জালে আবদ্ধ করতঃ তাদের আদর্শ ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেয়। তাদের চক্রান্ত ও কৌশলের কাছে বর্তমান মুসলিম সমাজ পরাজয় বরণ করে। এক পর্যায়ে মুসলিম সমাজে আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (দঃ) এর আদর্শের শেষ চিহ্নটুকুও মিশে যেতে বসেছে। আলা হযরত শাহ্ মাওলানা আহমদ রেজা খান বলেন, "খেলায় ধুলায় দিন গেল তার ঘুমের নেশায় রাত কেটেছে, নবীর লজ্জা-খোদার ভীতি যা ছিল তোর সব খোয়েছে।" বর্তমান সংকটাপন্ন মুসলিম সমাজ প্রিয়নবীর (দঃ) আনীত ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর অনুসৃত আদর্শের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হবার মাধ্যমে সংকট হতে উত্তরণ করতে পারবে। এ পর্যায়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামার প্রচারিত মৌল আদর্শ উপস্থাপন করা হলো।

মহানবী (দঃ) এর আর্বিভাব ঃ

বিশ্ব যখন অসভ্যতা ও বর্বরতায় তমসাচ্ছন্ন; পৌত্তলিকতার জয়জয়কার; মানবতার মরণদশা- তখনি ধরিত্রীর অধঃপতিত মানবকে সত্যের পথে পরিচালিত করার জন্যই মহানবী (দঃ)'র আবির্ভাব। এরশাদ হয়েছে- 'হে হাবীব (সাঃ) আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।'

মহানবী (দঃ) এর আদর্শ কি?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য একটি কালোত্তীর্ণ জীবন বিধান এনেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, "ঐ মহান সত্তার শপথ, যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ, অবশ্যই আমার উম্মতেরা তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, একটা মাত্র দল জান্নাতে যাবে, আর বাহাত্তর দল জাহান্নামী হবে। '(ইবনে মাজা)'। মুহাদ্দিসগণ এ জান্নাতী দল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যারা আল্লাহ, তদীয় রাসুল (দঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করবে তাদেরকে। বর্ণনার অবকাশ রাখে না, তারাই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা 'সুন্নী' জামাত।

আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (দঃ)

মহানবী হযরত (দঃ) আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান আল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ তেইশ বছর কঠোর পরিশ্রম করতঃ শেষ অবধি বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তাঁর নবীকে (দঃ) সত্য দ্বীনসহ এজন্যই প্রেরণ করেছেন যে, তিনি যেনো একে যাবতীয় বাতিল মতবাদের উপর বিজয়ী করতে পারেন।

* প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

তাওহীদের ধারনা পেশঃ

যুগ যুগ ধরে মানুষের ধ্যান ধারনায় যে জড়বাদী নাস্তিকতা স্থান পেয়েছিল তাকে সমূলে উৎপাটিত করতঃ তিনি এক আল্লাহ্ ভিত্তিক তাওহীদের ধারণা পেশ করেন। এরশাদ হয়েছে-'আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহর জন্য। হযরত (দঃ) বলেছেন, 'সকল সৃষ্টির একজন প্রভু আছেন, তিনিই আল্লাহ।'

মানুষের সঠিক পরিচয় ঃ

মানুষ কোন জড় পদার্থ নয়, সে "আশরাফুল মাখলুকাত' শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের পরিচয় তুলে ধরে হযরত (দঃ) বলেন, 'হে মানুষ, তুমি ছোট নও, তুচ্ছ নও, ঘৃণ্য নও, তুমি মহান, তুমি মহীয়ান। প্রকৃতির সবই তোমার জন্যই। তুমি কেন অন্যের কাছে মাথা নত করবে? তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছেন। যে কুফরী করবে, এর পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। (আল কোরআন-ফাতের-৩৯)

একমাত্র জীবন বিধান আল ইসলাম ঃ

হযরত (দঃ) মানবতার মুক্তির জন্য যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা ছিল আল্লাহর মনোনীত ধর্ম 'আল ইসলাম'। এরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম'। এতে রয়েছে যাবতীয় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান।

বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সমন্বয় ঃ

জড়বাদী সভ্যতায় মানুষের বৈষয়িক জীবনকে প্রাধান্য দিলেও আধ্যাত্মিকতাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। মহানবী (দঃ) প্রতিষ্ঠিত আদর্শে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই সমান গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারন, মানুষ দেহ ও আত্মা মিলেই পূর্ণাঙ্গ মানুষ। ইসলামে বৈরাগ্য যেমনি স্বীকৃত নয়; তেমনি কঠোরতাও বর্জিত। এরশাদ হয়েছে, 'হে আমাদের রব আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন; দান করুন আখেরাতের কল্যাণও। নবীজী (দঃ) বলেছেন, ইসলামে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয়টির গুরুত্ব সমান।

ভারসাম্যময় ব্যবস্থা ঃ

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) প্রতিষ্ঠিত আদর্শে মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মধ্যে সু-সমন্বয় ঘটেছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি ইত্যাদিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অন্য কোন মতবাদে এটা সম্ভব হয়নি। মার্কসবাদে কেবল অর্থনীতিকে পুঁজিবাদে ব্যক্তি উদ্যোগ ও ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে এ দু-ব্যবস্থায় ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছে। কোরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে আখেরাতের ঘর বানাবার চেষ্টা কর, অবশ্য দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ নিতে ভুলবে না।'

বস্তুগত উন্নতি ও মানবতার কল্যাণ সাধন ঃ

বিশ্ব জগতের সব কিছুই মানব কল্যাণে নিবেদিত। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে এসব ফজলের (নেয়ামত) সদ্ব্যবহার করতঃ তা নিজের কল্যাণে ব্যবহার করবে; কিন্তু ভোগ বিলাসিতায় মত্ত হতে পারবে না। এরশাদ হয়েছে-'একমাত্র তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন।' অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তাদেরকে দাও।' 'আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।" (আল কোরআন)

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ঃ

হযরত (দঃ) অনুপম আদর্শালোকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সাদা কালোর মধ্যকার যাবতীয় পার্থক্য মুছে এক কলেমার ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরশাদ হয়েছে- 'তোমাদেরকে একজন নারী ও পুরুষ হতে সৃজন করা হয়েছে। যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো'। অন্যত্র রয়েছে 'সমস্ত মানব মন্ডলী এক জাতি।' হযরত (দঃ) বলেছেন, 'সকল মুসলমান ভাই ভাই'। এ প্রসঙ্গে মহানবী (দঃ) কর্তৃক মারিয়া কিবতিয়াকে পত্নীরূপে বরণ করার কথা স্মরণ করা যায়।

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ছিলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল দিকের যাবতীয় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান তিনি দিয়েছিলেন। এরশাদ হয়েছে, 'এতো গোটা বিশ্ববাসীর জন্য একটি উপদেশমালা।' অন্যত্র রয়েছে আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধানরূপে মনোনীত করেছি।'

মানব প্রকৃতিনির্ভর (ফিতরাত) জীবন প্রতিষ্ঠা ঃ

হযরত (দঃ) প্রতিষ্ঠিত ইসলাম হচ্ছে ফিতরাত বা স্বভাবসুলভ ধর্ম। কেননা এ ধর্ম সর্বদা বিশ্ব প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে। ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করেছে।

এরশাদ হয়েছে, 'অতএব একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র কাজকে আল্লাহর দিকে কেন্দ্রীভূত কর; দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির উপর যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই ইসলাম জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে সুসমন্বয় গড়ে তুলেছিলো।

সার্বজনীনতা ও গতিশীলতা ঃ

হযরত (দঃ) এর প্রতিষ্ঠিত জীবনাদর্শ ইসলাম সার্বজনীন ও গতিশীল জীবনব্যবস্থা। দীর্ঘ সংগ্রামের পর প্রতিষ্ঠিত এ আদর্শ আজো জীবন্ত গতিশীল। এরশাদ হয়েছে, 'যদি তোমরা ক্ষমতা অর্জন করতে পার, তাহলে আসমান ও জমিনের সীমানা ছেড়ে যাও, অবশ্যই সে ক্ষমতা অর্জন না করলে তো বেরুতে পারবে না।' অন্যত্র রয়েছে, 'হে হাবিব (দঃ) আপনাকে সমগ্র জাতির জন্য সু-সংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি।'

মহানবীর (দঃ) আদর্শ ও বিশ্ব মুসলিম ঃ

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর তিরোধানের পর ইসলামী সমাজ হঠাৎ করেই আদর্শচ্যুত হয়নি; তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাদের মধ্যে বিমুখিতা শুরু হয় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনের পরিসমাপ্তির সাথেই পাপিষ্ট ও দুরাচার এজিদের চক্রান্তের ফলে তা দ্রুত পতনের দিকে নিম্নরূপে ধাবিত হয়।

উমাইয়া যুগ ঃ

উমাইয়া যুগে তাঁর আদর্শ হতে বিমুখিতা শুরু হয়। উমাইয়া শাসকগণ গণতন্ত্রকে হত্যা করতঃ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে এবং ভোগ বিলাসিতায় মত্ত হয়ে পড়ে। তারা ন্যায় বিচারের আদর্শ বিচ্যুত হয়ে রাষ্ট্রের স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থে জলাঞ্জলী দিতে থাকে। এভাবেই আদর্শ বিমুখিতার সূত্রপাত হয়।

আব্বাসীয় যুগ ঃ

এ যুগে মুসলিম সমাজ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর আদর্শ হতে অধিকতর বিমুখ হয়ে পড়ে। আমীর-ওমরাগণের বিলাসিতা ও সুন্নাহ বিরোধী কার্যাদির কারণে তৎকালীন মুসলিম সমাজ বিকৃতির দিকে ধাবিত হয়। অবশ্য এ সমাজে জ্ঞানী গুণী ও সত্যাশ্রয়ী লোকও ছিলো; কিন্তু শাসকদের কার্যকলাপ ইসলামের ক্ষতি করেছে।

উসমানীয় যুগ ঃ

আব্বাসীয়দের পতনের পর তুর্কীরা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়। তারা সামরিক দিক দিয়ে ইসলামকে এগিয়ে নিলেও তাদের হাতেই হযরতের (দঃ) আদর্শের বিকৃতি প্রবলাকার ধারণ করে। তারা নতুন কলা-কৌশল উদ্ভাবন না করে পূর্ববর্তীদের উপর নির্ভরশীল থাকায় সমাজ ক্রমশঃ বিচ্যুতি ও বিকৃতির দিকে এগিয়ে যায়। তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামপন্থী দাবী করলেও তাদের পতন অবশাম্ভাবী ছিল। উমাইয়া রাজত্ব হতে তুর্কী পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে ইসলামকে আভ্যন্তরীণ এবং বাইরের বিবিধ দুঃখজনক পরিণতির শিকার হতে হয়েছে। তুর্কীদের আমলেই খৃষ্টজগত ইসলামের বেশি ক্ষতি করেছে। কারণ তারা উন্নত কলা-কৌশলের মাধ্যমে মুসলমানদের করায়ত্ত করে নেয়।

মিশরের উপর ফরাসীদের আক্রমণ ঃ

মিশরের উপর ফরাসীদের আক্রমণ মুসলিম সমাজের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। খৃষ্টজগত ইতোপূর্বে আক্রমণে ব্যর্থ হলেও পরে নেপোলিয়ানের হাতে মুসলমানদের পরাজয় তাদের মানসিকতার উপর প্রভাব ফেলে। নেপোলিয়ান সুযোগ নিয়ে ইসলামী আইনের পরিবর্তে ফরাসী আইন চাপিয়ে দেয়। এভাবে গোটা মুসলিম সমাজে বিকৃতি প্রবেশ করে। শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্যরা তাদের অনুগতদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম সম্প্রদায়কে কাবু করে ফেলে।

খৃষ্টান মিশনারী শিক্ষা ঃ

আশ্চর্যের বিষয় যে, একটা ইসলামী সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন ডানলপ নামক একজন পাদ্রী। এর মূল লক্ষ্য ছিলো কোরআনকে ছিনিয়ে নেয়া। তারা এ কাজে ধীর গতিতে এগোয় এবং আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়কে চিহ্নিত করে তারা পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতঃ কিছু শিক্ষিত লোকদেরকে অফিসের বিভিন্ন পদে বসিয়ে প্রলোভনে ফেলতে সক্ষম হয়। তারা ইসলামী শিক্ষা পশ্চাদপদ এবং ইসলামকে আনুষ্ঠানিক ধর্ম রূপে পেশ করতঃ ছাত্রদেরকে ইসলাম বিমুখ করে ফেলে।

নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউঃ মুসলিম সম্প্রদায় যাতে যৌন সংস্কৃতিতে ডুবে থাকে তজ্জন্য খৃষ্টানরা নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে, নারীদেরকে উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ করার বীজ ঢুকিয়ে দেয়। ফলতঃ বেহায়াপনা ও অপসংস্কৃতি মুসলিমদেরকে নবীর (দঃ) আদর্শ হতে বিমুখ করে ফেলে।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ঃ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কবলে পড়ে মুসলিম সম্প্রদায় হযরতের আদর্শ বিচ্যুত হয়। ১৮৮২ সালে

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্লাডষ্টোন সংসদে কোরআন হাতে নিয়ে বলেন, "এ কোরআন যতোদিন মিশরীয়দের হাতে থাকবে, আমরা ততোদিন তাদের এলাকায় নির্বিঘ্নে শাসন কার্য চালাতে পারবো না"। এর চেয়ে বড়ো ষড়যন্ত্র আর কি হতে পারে?

প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র ঃ খৃষ্টজগত ধর্ম নিরপেক্ষ সেক্যুলার মিশনারীর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে তাদের অনুচর বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করতঃ ইসলামী শিক্ষাকে ধ্বংস করতে তৎপর হয়। তারা নবী করিম (দঃ) সম্পর্কে অদ্ভুত কাহিনী রটিয়ে মুসলমানদেরকে বেঈমানরূপে চিহ্নিত করে। এভাবে মুসলিম সমাজ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর আদর্শ হতে বিমুখ হয়ে পড়ে এবং বিশ্বব্যাপী ১৫০ কোটি মুসলমান নির্যাতিত ও নিগৃহীত হচ্ছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য মহানবীর আদর্শই একমাত্র সম্বল।

বস্তুত মুসলিম সমাজ যখনই প্রিয়নবী (দঃ)'র আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তখনি ইহুদি, খৃষ্টান ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নানা কলা-কৌশল ও ছলনার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে করায়ত্ত করতঃ ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে পর্বতসম প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করিয়ে দেয়, যাতে ইসলাম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। অন্তরায়সমূহ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলোরিজম এর জন্মস্থান ইউরোপে। এর মূলকথা 'ধর্মকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে আল্লাহ ও রাসুলের (দঃ) প্রভাব হতে মুক্ত রাখা'-এই মতবাদ সর্বপ্রথম তুরস্কে প্রবেশ করতঃ ক্রমান্বয়ে প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে, যা কোরআন সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে মারাত্মক অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুবাদী দর্শন, জড়বাদী সভ্যতা মানুষকে ভোগ বিলাসিতায় মত্ত এবং মোহান্ধ হয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে প্রলুব্ধ করে। অথচ ইসলাম পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের মধ্যে সু-সমন্বয় ঘটিয়েছিল।

সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইহুদী, খৃষ্টানদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ধর্ম বিমুখ করতঃ বেহেয়াপনায় ডুবে থাকার অবাধ সুযোগ দিয়েছে। নৈতিকতা বর্জিত এ শিক্ষা ইসলামের বিরুদ্ধে এক জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের অংশ।

নারী স্বাধীনতার ঢেউ ঃ ইসলাম নারী জাতিকে সম্মানের আসনে বসিয়ে যাবতীয় অধিকার দিলেও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে বেহায়াপনা সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে বিরাট বাধা।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ঃ পুর্জিবাদী গণতন্ত্রের মূলকথা হলো, 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সকল ক্ষমতার আধার একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ধারণা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বিরাট বাধা।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি ঃ সুদ ও শোষণ পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল ভিত্তি। যথেচ্ছ আয় ও ব্যয় করার সুযোগ দিয়ে পুঁজিবাদ মানুষকে পরকাল বিমুখ করে ফেলায় মানুষ অনবরত সীমালংঘন করে চলেছে।

পতিত সমাজতন্ত্র ঃ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গালভরা শ্লোগান আওড়িয়ে অগণিত মানবতার লাশের উপর দিয়ে সমাজতন্ত্র দীর্ঘ ৮৫ বৎসর আগে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় শোষণের যাতাঁকলে নিষ্পেষিত মানবতা শেষ অবধি একে গলায় জুতো পরিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়েছে। কিন্তু এর সৃষ্ট বিভ্রান্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে মারাত্মক অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উগ্র জাতীয়তাবাদ ঃ জাতীয়তাবাদ একটি মানসিক ধারণা যা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য মানবগোষ্ঠী হতে স্বতন্ত্র হতে শিখায়। বস্তুতঃ উগ্র জাতীয়তাবাদ ইসলামের সার্বজনীনতার প্রতি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

রাজতন্ত্র ঃ রাজতন্ত্র বা Oligarcny হচ্ছে ইসলামের গৃহশত্রু। ইসলামের সোনালী যুগের অবসান ঘটিয়ে এ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজতন্ত্রে যাবতীয় মানবাধিকার পদদলিত করতঃ রাজতন্ত্রের নায়ক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। মধ্যপ্রাচ্যের সকল মুসলিম রাষ্ট্রেই রাজতন্ত্র সু-প্রতিষ্ঠিত। অথচ ইসলামে রাজতন্ত্রের কোনই স্থান নেই।

একনায়কতন্ত্র ঃ একনায়কতন্ত্র বা Dictatorship ইসলামের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। একনায়ক যাবতীয় মানবাধিকার পদদলিত করতঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। জনমনের কোন গুরুত্ব তিনি দেন না। ইসলাম একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছে এভাবে 'সকল ক্ষমতার আধার একমাত্র আল্লাহ'। সুতরাং একনায়কতন্ত্র ইসলামের জন্য হুমকিস্বরূপ।

সাম্রাজ্যবাদ ঃ ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে সবচে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। পরদেশ-পরসংস্কৃতি দখল করার যে হীন মানসিকতা সাম্রাজ্যবাদের রয়েছে, তা ইসলামের জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলাম নিয়ে বিভ্রান্তি ঃ পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ ইসলামকে চিরতরে ধ্বংসের জন্য এর বিরুদ্ধে জঘন্যতম বিভ্রান্তি প্রচারে লিপ্ত রয়েছে।

ক) ইসলাম পশ্চাদপদ ঃ তারা ইসলামকে পশ্চাদপদ ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধকরূপে চিহ্নিত করে আসছে; অথচ আল কোরআনই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস।

খ) ইসলাম উগ্র ও মৌলবাদী ঃ তারা ইসলামকে মৌলবাদ এবং মুসলমানদেরকে উগ্র বলে আখ্যায়িত করতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

গ) ইসলাম গণতন্ত্র বিরোধী ঃ পশ্চিমা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা বুলি আওড়িয়ে থাকে যে, ইসলাম গণতন্ত্র বিরোধী, অথচ

ইসলামই সর্বপ্রথম সকলের সমানাধিকার দিয়ে মদিনার বুকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

পশ্চিমা গণমাধ্যম ঃ বর্তমানে দুই ধরনের গণমাধ্যম দেখতে পাওয়া যায়। যথা (১) প্রিন্ট মিডিয়া (ক) সংবাদপত্র, (খ) সাময়িকী (গ) বই পুস্তক ইত্যাদি। (২) ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া (ক) রেডিও (খ) টেলিভিশন (গ) সিনেমা (ঘ) অডিও ভিডিও ক্যাসেট (ঙ) টেলিফোন, ফ্যাক্স (চ) স্যাটেলাইট এবং ইন্টারনেট ইত্যাদি। বস্তুতঃ এ সকল গণমাধ্যমের সবগুলোই পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী এবং এদের দালালদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই তারা এগুলোর মাধ্যমে অব্যাহতভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

মুসলিম অনৈক্য ঃ 'সকল মুসলমান ভাই ভাই'- এ কথা বিশ্বনবী (দঃ) বলে গেলেও মুসলিম বিশ্ব আজ শতধা বিভক্ত। নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

খৃষ্টান মিশনারীর ষড়যন্ত্র ঃ বিশ্বের সর্বত্র বিশেষতঃ অনুন্নত দেশসমূহে খৃষ্টান মিশনারীরা সাহায্য সহযোগিতার ছদ্মাবরণে ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এছাড়া মুসলিম সমাজে বিদ্যমান বিজাতীয় মতাদর্শ যেমন-যৌতুক প্রথা, বেহায়াপনা, নারীদের নর্তন-কুর্দন ইত্যাদিও ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় স্বরূপ।

অস্থিতিশীল সরকার ঃ মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান অনৈক্যের সুযোগে পাশ্চাত্য শক্তি অনুন্নত ও পশ্চাদপদ দেশসমূহে সর্বদা অস্থিতিশীলতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ড জিইয়ে রাখছে, যাতে স্থিতিশীলতা ফিরে এসে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে।

নেতৃত্বের সংকট ঃ একদা বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দানকারী মুসলিম সমাজ আজ নেতৃত্বের সংকটে নিপতিত। অনৈক্য, বিভেদ ও রাজনৈতিক সংকটের কারণে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়নি। অথচ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব অতীব প্রয়োজন। মুসলিম বিশ্ব তথা বাংলাদেশেও ইসলামী নেতৃত্বের দারুন সংকট বিদ্যমান।

মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান সংকটাবলী ঃ ইতোপূর্বে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামার আনীত ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর প্রচারিত ইসলামের শাশ্বত আদর্শ বিচ্যুতির কারণ ও প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিচ্যুতির ফলে মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে বিরাজমান সংকটাবলী উপস্থাপন করা হলো ।

(১) আল্লাহ-তদীয় রাসুল (দঃ) এর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম সংকট;
(২) যোগ্য নেতৃত্বের সংকট;
(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা;
(৪) শিক্ষায় অনগ্রসরতা;
(৫) অর্থনৈতিক সংকট;
(৬) মুসলিম অনৈক্য;
(৭) রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব;
(৮) সাংস্কৃতিক সংকট;
(৯) দুর্বল সমর কৌশল;
(১০) বিজাতীয় মতাদর্শ;
(১১) মানবগড়া আইন ও বিচার ব্যবস্থা;
(১২) বিশ্বায়ন এর প্রভাব;
(১৩) সাম্রাজ্যবাদ এর প্রভাব;
(১৪) ইসলাম নিয়ে ভুল ধারণা;
(১৫) পশ্চিমা গণতন্ত্র,
(১৬) পার্থিব লোভ-লালসা,
(১৭) রাজতন্ত্রের প্রচলন,
(১৮) মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি।

সংকট উত্তরণে কারবালার শিক্ষা ঃ সৈয়াদুশ শোহাদা শাহেনশাহে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) স্বপরিবারে শাহাদাত বরণ করেছিলেন আল্লাহর মহান ও একমাত্র ধর্ম ইসলামের মূল আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। বর্তমান সংকটাপন্ন মুসলিম বিশ্বে শান্তি ও মুক্তির বারতা ফিরে আনার জন্য আমাদেরকে কারবালার ঐতিহাসিক ট্রাজেডি হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কারবালার ঐতিহাসিক শিক্ষা আমাদেরকে সত্যের দিশা দিতে পারবে।

১. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ঃ ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। পবিত্র কুরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে - "আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম।" হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) মহান ধর্ম ইসলামকে অবিকল ও অবিকৃত পূর্ণাঙ্গ অনুসরন ও অনুকরণের বাণী সমুষ্ণ করার জন্য পাপিষ্ট এজিদের সাথে অসম যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। বর্তমান মুসলিম সমাজ ইসলামের পূর্ণাংগ অনুসরণেই মুক্তির পথ খুজে পাবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন- "তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।" অর্থাৎ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ কর। ডঃ আল্লামা ইকবাল (রহঃ) বলেন,

"উয়হ জামানে মে মুআযয থী মুসলমাঁ হো কর ---------- আউর হাম খার হোয়ি তারেকে কোরআঁন হো কর।"

২. অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা ঃ অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্যই পৃথিবীতে ইসলামের আগমন। এজিদের অন্যায়ের কাছে ইমাম হোসাইন (রাঃ) মাথানত না করে এটাই শিক্ষা দিয়েছেন যে, মুসলমান কখনো অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দরের কাছে মাথা নত করতে পারে না। পবিত্র কুরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে " হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য্য অবলম্বন কর, বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন কর, সত্যের অনুসরণে সদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তোমরা সফলকাম হবে। ডঃ আল্লামা ইকবাল বলেন, "রমযে কোরআ আয হুসাইন আ মুখতীম।"

৩. ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হওয়া ঃ ইসলামের মূল উপজীব্য বা শিক্ষা হচ্ছে ত্যাগ, ধৈর্য্য ও ছবর। ইমাম হোসাইন (রাঃ) কারবালা ময়দানে স্ব-পরিবারে শাহাদাত বরণ করে ত্যাগের যে প্রজ্জ্বোল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা ইসলামের ইতিহাসে বিরল। ডঃ আল্লামা ইকবাল (রহঃ) বলেন

(১) "ফিররে ইবরাহীমে ইসমাইলে বুদ ---------- ইয়ানিয়া ইজমালে-রা তাফসীরে বুদ"
(২) "নকসে ইল্লাল্লাহ পর সাহারা নবীস ---------- সাতরে উনুয়া মে নাজাতে মা নবীস"
(৩) "খুনে উ তাফসীরে ই-আছরার কার ---------- মিল্লাতে খাবীদা বে দারেকার।"

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, "ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।"

৪. আহলে বাইতের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ ঃ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামা পৃথিবী থেকে পর্দার করার পর হতে পৃথিবীর বুকে ইসলামের পতাকা যারা উড্ডীন করেছেন, তাঁরা হলেন আওলাদে রাসুল গণ। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে আহলে বায়ত তথা আওলাদে রাসুলের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। ইমাম হোসাইন (রাঃ) শাহাদাতের মাধ্যমে নিজ জীবন উৎসর্গ করে আহলে বাইতের প্রতি বিশ্ব মুসলিমকে ঋণী করে গেছেন। কুরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে, "আপনি বলে দিন যে, আমি (রাসুল) তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাইনা, (আমার) নিকটাত্মীয়দের ভালবাসা ব্যতীত।" হাদিস শরীফে এরশাদ হয়েছে, (ক) "হে লোকেরা; আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে দিয়েছি। যদি তোমরা এগুলো মজবুতভাবে ধারণ কর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। (প্রথমতঃ) আল্লাহর কিতাব (দ্বিতীয়তঃ) আমার বংশধর তথা আহলে বায়ত।" প্রিয়নবী (দঃ) এরশাদ করেন- "আল্লাহর ক্রোধ অতীব কঠিন/ কঠোর হবে যারা আমার বংশধরকে কষ্ট দিয়েছে।"

৫. ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটানো ঃ সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের ভেতরের প্রকৃত স্বরূপ। আমাদের প্রিয়নবী (দঃ) ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যই পৃথিবীতে তশরীফ এনেছিলেন এবং সফলকাম হয়েছেন। ইমাম হোসাইন (রাঃ) এজিদের অনৈসলামিক কার্যকলাপও অপসংস্কৃতির বিপরীতে ইসলামী সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তিনি এজিদের অন্যায় কার্যকলাপও দুশ্চরিত্রের নিকট মাথা নত করেননি। বর্তমান সংকটাপন্ন মুসলিম বিশ্বকে বিজাতীয় মতাদর্শ ও অপসংস্কৃতির চর্চা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে হবে। ডঃ আল্লামা ইকবাল (রঃ) বলেন, "আধুনিকতা আমাদের আত্মপরিচয়কেও বিস্মৃত করে দিয়েছে। প্রিয় নবীর (দঃ) অভ্রান্ত ও চিরসুন্দর আদর্শ হতেও দূরে বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছে।"

৬. ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামা শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রিয়নবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, "চীন দেশে হলেও জ্ঞান সন্ধান কর।" অন্যত্র বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর জ্ঞানার্জন ফরজ।" প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান কখনো কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী জীবন যাপনে অভ্যস্থ হতে পারেন না। কুখ্যাত এজিদ তৎকালীন সমাজে ইসলামী শিক্ষার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করতঃ অনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিল। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশাসন ও শিক্ষাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যই জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বর্তমান সমাজে বিরাজমান কুসংস্কার, অন্ধতা, অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটনের জন্য ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার অপরিহার্য্য। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন, " হে রাসুল (দঃ)! আপনি বলে দিন, যারা জ্ঞানী ও যারা অজ্ঞ তারা কি কখনো সমান হতে পারে?"

৭. নবী প্রেম জাগ্রত করা ঃ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন গোপন ধনভান্ডার ছিলেন। তিনি আমাদের প্রিয়নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন'র উছিলায় এ নশ্বর ধরা সৃজন করেছেন। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন 'নবীপ্রেম' কে ঈমানের মূলদাবী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম হোসাইন (রাঃ) স্ব-পরিবারে আত্মোৎসর্গ করার পেছনে নবীজীর প্রেম-প্রীতি তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতি অবিচলতাই মূল কারণ ছিল। কুরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! ঈমানের দাবী করার পর যদি তোমাদের কেউ ঈমান-ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ ফিরে যেতে চায়; তাহলে আল্লাহ তদস্থলে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন, তাঁরাও আল্লাহকে ভালবাসবে। তাঁরা মুমিনদের প্রতি বিনম্র আর অস্বীকারকারীদেরকে সাধ্যমতো সত্যের পথে আনার চেষ্টা করবেন। তাঁরা জিহাদে অবতীর্ণ হবে এবং কোন ভীতিতে সংকোচিত হবে না। আর এটাতো আল্লাহর একমাত্র বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি আপন ইচ্ছায় যাকে চান সে অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেন; আর কারা এ বিশেষ অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য তিনি তাদের ভাল করেই জানেন।" সংকটাপন্ন মুসলিম সম্প্রদায়কে আল্লাহর এ নির্দেশের আলোকে নবীপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর অনুসরনে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। ডঃ আল্লামা ইকবাল (রহঃ) বলেন, "হে মুসলিম যুবক! অলস, নিদ্রা ঝেড়ে ফেলে ইসলামী সঞ্জিবনী সূধা নিয়ে বেরিয়ে পড়, ছড়িয়ে দাও ইসলামের বিপ্লবী বাণীকে। এ পর্বে রাসুলপ্রেমের তরবারি আর কোরআন হাকিম এর ঢাল ধারন করতে পারলে যে কোন কঠিন কাজ সহজ হবে; আর পারবে পাপাচারমুক্ত, শোষণমুক্ত স্বর্গোপম একটি বাস্তব ইসলামী সমাজ দুনিয়াবাসীকে উপহার দিতে।"

৮. ইসলামী আইন ও রীতিনীতির পরিপূর্ণ অনুসরন ঃ দুরাচার-পাপিষ্ট এজিদ-ইসলামী অনুশাসন, আইন ও রীতিনীতি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সমাজে অনৈতিক জীবনাচার চালু করেছিল। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলামী আইনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য শাহাদাত বরণ করেন। বর্তমান যুগে ধরা সংকটাপন্ন বিশ্বের ১৫০ কোটি মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার কাছে ফিরে যেতে হবে। অন্যথা ইহুদী, খৃষ্টান তথা খোদাদ্রোহীদের বানানো আইনে শান্তি, মুক্তি ও স্বস্তি সুদূর পরাহত। পবিত্র কুরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে-"(১) একমাত্র সে আইন বিধানই মেনে চলো এবং অনুসরণ কর; যা তোমাদের প্রভু অবতীর্ণ করেছেন এবং তাকে পরিত্যাগ করে অন্য কোন পৃষ্ঠপোষক বা নেতার অনুসরণ করোনা।

(২) "হে নবী (দঃ) আমি এ কিতাব আপনার প্রতি সত্য নাজিল করেছি। যাতে করে আপনি আল্লাহর দেখানো আইনানুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পারেন।"

(৩) "আর সুবিচার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীগণকে ভালোবাসেন।"

(৪) আল্লাহর দেওয়া বিধানানুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারা কাফের।"

৯. উন্নত সমরকৌশল ও আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যুগোপযোগী সমরকৌশল ও যুদ্ধনীতি গ্রহণ করতেন বিধায় ন্যায়যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কারবালা প্রান্তরে প্রাণপনে বীরদর্পে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন ও সমরনীতির বিষয়ে অত্যন্ত দূর্বল। খোদাদ্রোহী ও নাস্তিক্যবাদী শক্তির মোকাবিলায় টিকে থাকার জন্য শক্তিশালী আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন ও সমরনীতি গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর প্রয়োজনীয় সমরকৌশল ও যুদ্ধনীতি সম্পর্কে অবগত থাকা একান্ত অত্যাবশ্যক। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, -(১) আর তোমরা আল্লাহর পথে কাফেরদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করোনা। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।"

(২) "তাদের মোকাবিলার জন্য তোমরা যতো বেশি সম্ভব শক্তি সঞ্চয় কর।"

(৩) এ এমন এক কৃষি যা অংকুর বের করলো, অতঃপর শক্তি সঞ্চয় করলো, অতঃপর মোটাতাজা হলো এবং অবশেষে নিজ কান্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গেলো।"

১০. আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন ঃ আল্ কুরআন হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার আকর। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরোধা হিসাবে স্বীকৃত। কারবালা প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) অসম যুদ্ধে শহীদ হবার পর ইসলামী অনুশাসন ও সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় পশ্চিমা বিশ্ব মুসলমানদের চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। এককালে মুসলিম সাম্রাজ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করলেও বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কলা-কৌশল, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে মুসলিম বিশ্বের পরিকল্পনা ও বাস্তবতা অত্যন্ত দূর্বল ও সেকেলে। মুসলিম জাতিসত্বার অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও কলাকৌশল আয়ত্ব করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। পবিত্র কুরআন মজিদে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এভাবে - (১) "তিনি যাকে ইচ্ছা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দান করেন, আর যে এ জ্ঞান লাভ করল

সে প্রকৃত পক্ষে বিরাট সম্পদই লাভ করল।"

(২) "আমরা জমিন ও আকাশমন্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তুকে মহাসত্য ব্যতীত সৃষ্টি করিনি।

১১. সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি ঃ উন্নত নৈতিক চরিত্রে বলিয়ান সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব বর্তমান পতনোন্মুখ সংকটাপন্ন মুসলিম বিশ্বকে রক্ষা করতে পারে। ইমাম হোসাইন (রাঃ) ছিলেন প্রিয়নবী (দঃ) এর প্রতিচ্ছবি ও নবীজীর আদর্শে আত্মসমর্পিত বিলীন দ্বিতীয় সত্ত্বা। কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে অদ্বিতীয় ও যোগ্যনেতার নেতৃত্বে সমাজে বিরাজমান অনাচার, অবিচার ও যাবতীয় পাপাচারের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। পবিত্র কুরআন মজিদে সৎ ও যোগ্য নেতার স্বরূপ বিধৃত হয়েছে নিম্নরুপে ঃ

(ক) "তারা নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত।"

(খ) "আমার বান্দাদেরকে বল যা উত্তম তা বলতে।"

(গ) হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরন কর।"

(ঘ) মহানবী (দঃ) বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

১২. মুসলিম জাতিসংঘ গঠন ঃ কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত ঐতিহাসিক 'শাহাদাত' আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিচ্ছে যে, খোদাদ্রোহী ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অপরিহার্য্য। এ লক্ষ্যে মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ়করণ, ও.আই.সি. কে শক্তিশালীকরণ এবং সকল মুসলিম দেশের সমন্বয়ে মুসলিম জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবী। মুসলিম জাতিসংঘ গঠনের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি করে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে ইহুদী ও খৃষ্টান চক্রের কবল হতে মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে বের করে আনতে হবে। বর্তমান জাতিসংঘ মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রতিষ্ঠার পর হতে কোনই অবদান রাখতে পারেনি। বরং ইরাক, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, লেবানন, চেচেনিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নির্যাতিত মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা, মুসলিম জাতিসত্ত্বার অহংকার ডঃ মাহাথির বিন মুহাম্মদ বলেছেন, "মুসলিম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষায় মুসলিম জাতিসংঘ গঠন করা অপরিহার্য্য।"

১৩. ইসলামী কমন মার্কেট ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান স্থাপন ঃ বর্তমান বিশ্বে নেতৃত্বদানকারী ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের কব্জায় রয়েছে সকল প্রকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ফলে তারা সুদভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থের এক বিরাট অংশ ব্যবহার করছে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত ক্রুসেডে। ইসলামের চিরশত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়কে সকল সেক্টরে পরিকল্পিতভাবে কার্যক্রম চালাতে হবে। বিশ্বব্যাংক, আই-এম-এফ সহ বিধর্মীদের কুক্ষিগত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে পড়ে তুলতে হবে ইসলামী কমন মার্কেট ও সুদ বিহীন ব্যাংক, বীমা, এনজিওসহ অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। ইসলাম বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে 'আর্থিক বলয়' সৃষ্টি করতঃ মুসলিম সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিকভাবে মজবুত হতে হবে।

১৪. আল্লাহর উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি ঃ ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর শাহাদাত বরণ ছিল মহান আল্লাহর একান্ত ইচ্ছার প্রতিফলন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) জন্মের পরপরই প্রিয়নবী (দঃ) তাঁর শাহাদাতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তথাপি ইমাম হোসাইন (রাঃ) স্বপরিবারে শাহাদাত বরণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ধৈর্য্যধারন করেন। তাঁর মহান শাহাদাতের সময় নূরনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) হাউজে কাউসার হাতে নিয়ে কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ছবর করার জন্য শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন। বর্তমান সমস্যাসংকুল মুসলিম মিল্লাতকে ধৈর্য্য ও ত্যাগের মাধ্যমে ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পবিত্র কুরআন মজিদে রয়েছে-

(১) "পরন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করে থাকেন।"

(২) "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করে থাকেন।"

(৩) "যারা ধৈর্য্যধারন করে এবং তাঁরা তাঁদের প্রভুর উপর নির্ভর করে।"

১৫. মুনাফিকদের বিষয়ে সতর্ক থাকা ঃ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামা কর্তৃক মহান সত্যধর্ম 'ইসলাম' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কাফির-মুশরিকগণ যতটুকু ক্ষতি করেনি, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে মুনাফিক বেঈমান নামধারী মুসলমানগণ। তাই আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন মুনাফিকদের বিষয়ে সদা সর্বদা অতি সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহনের আহ্বান জানিয়েছেন। ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে কুফাবাসীর পক্ষ হতে অগণিত পত্র মারফত আমন্ত্রণ জানানো এবং তাঁর হাতে বায়ত হবার প্রতিশ্রুতি প্রদানের পরও তারা প্রতিশ্রুতি ভংগ করে মুনাফিকী করেছিল। বর্তমান মুসলিম

আল্লাহ্, তদীয় রাসুল (দঃ), সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়ত বিশেষতঃ কারবালার শহীদানের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম-প্রীতি লক্ষ্য করা যায় না। এরাই বাস্তবে সত্যিকার মদিনার ইসলাম তথা হোসাইনী ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। বর্তমান সমস্যাসংকুল বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়কে এ সকল মুনাফিক, বেঈমান, নবী বিদ্বেষী ও আহলে বায়তের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণকারীদের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, সকল ইবাদত-বন্দেগীর মূল হচ্ছে নবীপ্রেম ও আহলে বাইতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি লালন করা। মুনাফিকদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

(১) "এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ মিথ্যাবাদী।"

(২) "তারা (মুনাফিকগণ) এদিকেও নহে, ওদিকেও নহে।"

(৩) এবং যখন তারা (মুনাফিকগণ) নামাজের জন্য দন্ডায়মান হয়, তখন লোকদিগকে দেখাবার জন্য শিথিলচিত্তে দন্ডায়মান হয়ে থাকে এবং আল্লাহকে অত্যল্প ব্যতীত স্মরণ করেনা।"

১৬. ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা ঃ মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি বা 'খলিফা' হিসাবে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম 'ইসলাম' প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাবে এটাই স্বাভাবিক। প্রিয়নবী (দঃ) তেইশ বছর কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার পর বিশ্বে একমাত্র সার্বজনীন ও মানবতার কল্যাণকামী ধর্ম ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) প্রিয়নবীর (দঃ) এর আনীত মহান ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছিলেন। সংকটাপন্ন মুসলিম বিশ্বের ১৫০ কোটি মুসলমানকে প্রিয়নবীর আনীত ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর অনুসৃত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম'র ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হবে। সকল প্রকার বাঁধা বিপত্তি, চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করে অবিকৃত ও পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা আল্ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। সত্যিকার নবীপ্রেমিকও আহলে বায়তের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণকারী সম্প্রদায় কিয়ামত পর্যন্ত 'ইসলাম' প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখে যাবে। পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহ বলেন- (১)"যদি আল্লাহ তোমাদিগকে (সত্যবাদীদেরকে) সাহায্য করেন তবে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হবে না এবং যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর পরে কে আছে যে তোমাদিগকে সাহায্য করবে? আর বিশ্বাসীগণ আল্লাহর উপরই নির্ভর করে থাকেন।"

(২) "এবং ঈমানদারগণকে সাহায্য করা আমার (আমি আল্লাহর) অবশ্য কর্তব্য ছিল।

(৩) "এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব প্রদান করেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী।

১৭. অপপ্রচার ও মিডিয়াসন্ত্রাস প্রতিরোধ করা ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামার সময়ও খোদাদ্রোহী ও নবীবিদ্বেষীরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতো। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর শাহাদাতের প্রাক্কালেও মুনাফিকগণ বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করেছিল। বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি, মিডিয়া, পত্রিকা সবই ইসলাম তথা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর প্রচারিত মতাদর্শের বিরুদ্ধে সোচ্চার। পশ্চিমাবিশ্ব অনবরতঃ শান্তি, সৌন্দর্য্য, মানবতা ও মুক্তির ধর্ম পবিত্র ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত। এমতাবস্থায় ইসলামের মৌল আদর্শ তথা সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা, বহুমতবাদিতা, মানবাধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, জীবনের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে সুশৃংখল ও গঠনমূলক প্রচার-প্রসারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর অনুসৃত মহান 'ইসলামের' বিষয়ে বিশ্বদৃষ্টি বদলে যাবে; মানুষ ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিবে। সুখের খবর হচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের ক্রমাগত শক্তি ও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি আমাদেরকে আশান্বিত করে তুলেছে।

উপসংহার ঃ পরিশেষে বলা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামার আনীত জীবন বিধান ইসলামের সুমহান আদর্শকে অবিকৃত ও পূর্ণাংগরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাপিষ্ট ও দুরাচার এজিদের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে স্বপরিবারে শাহাদাত বরণ করে চিরঞ্জীব হয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে কুখ্যাত এজিদ চিরদিনের জন্য ইতিহাসের পাতায় আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এজিদের 'কবর' আজ অবধি নির্ণয় করা যায়নি। অন্যদিকে শাহেনশাহে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে মহান ধর্ম ইসলামকে তরতাজা, সজিব ও প্রাণবন্ত করে গেছেন। আল কুরআনে শহীদের মর্যাদা প্রসংগে এরশাদ হয়েছে, (১) "আর যারা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণে করেছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা; বরং তাঁরা চিরঞ্জীব; অথচ তদ বিষয়ে তোমরা কোন অবহিত নও"। (২) "এবং যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তৎপরে শাহাদাত বরণ করে বা বিজয়ী হয় তবে আমি (আল্লাহ) তাকে মহান প্রতিদান প্রদান করব।"

বর্তমান সংকটাপন্ন মুসলিম সম্প্রদায়কে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর অনুসৃত পথে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি তথা পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যাবতীয় বাতিল মতবাদকে পদদলিত করে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সত্য, ন্যায় ও মানবাধিকারের একমাত্র গ্যারান্টি ইসলামের সুমহান আদর্শকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। আর এভাবে মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে একটি সুন্দর, শান্তি ও মঙ্গলময় বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে-ইন্‌শাল্লাহ্‌। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন- "তোমরা মনমরা হয়ো না; দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়োনা; তোমরাই বিজয়ী হবে-যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (আলে ইমরান-১৩৯) আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর পদাংক অনুসরণে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্য নির্দেশক :

১. ইসলামী রাষ্ট্রের পটভূমি ও রূপরেখা প্রেক্ষিত বাংলাদেশ - অধ্যক্ষ হারুনুর রশিদ
২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান : তুলনামূলক রাজনীতি - এ.কে.এম. এমদাদুল হক
৩. ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) স্মরণিকা - ১৪২১ হিজরী - মাওলানা ফরিদ উদ্দিন
৪. রসুল মুহাম্মদ (দঃ) এর সরকার কাঠামো- ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী
৫. তাজদীদে দ্বীন - জেহাদীয়া মুজাদ্দেদীয়া কাফেলা, কুমিল্লা
৬. সাপ্তাহিক পূর্ণিমা - এ.এম.এম. বাহাউদ্দিন
৭. মাসিক সুরেশ্বর - সৈয়দ শাহ্‌ নুরে আহমদ মোরশেদ
৮. মাসিক পরওয়ানা - মুহাম্মদ হুছামউদ্দিন
৯. দৈনিক ইনকিলাব- ঢাকা

sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

হিরন্ময় যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা

নূ.ক.ম. আকবর হোসেন*

বিশ্বজুড়ে আজকের বিশাল সম্ভাবনার যে স্রোতধারা তার মূলে প্রোথিত আছে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে অর্জিত সাফল্য। সে সভ্যতার নাম আরবী সভ্যতা, আরব সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতা বা ইসলামী সভ্যতা।

ইসলামের আগমনের পরে হঠাৎ করে ঝিমিয়ে পড়া আরব জাতি যে গতি ও ক্ষীপ্রতায় জেগে উঠে, বিশ্বে তাক লাগিয়ে দেয়- তা এক কথায় বিস্ময়কর। পবিত্র কোরআনের আলোকে এবং বিশ্বনবী (দঃ) এর জীবন চরিতের সংস্পর্শে এসে অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া এক জাতি যে নব উদ্দীপনা ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছে তার সমকক্ষ জোয়ার অন্য কোথাও দেখা যায় না। ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত মুসলমানরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পথকে সর্বোচ্চ পথ বলে বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী কাজ করে গেছেন। তাঁদের সকল প্রকারের জ্ঞান সাধনা ও শিল্প চর্চার উদ্দেশ্যে ছিলো দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতি ও কল্যাণ।

আজকের পাশ্চাত্য যদিও সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিকট থেকেই পাথেয় নির্দেশনা লাভ করে ধন্য হয়েছেন, কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদানকে বরাবরই অস্বীকার করে আসছে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখার গোড়াপত্তনকারী এবং কোন কোন শাখার সমুদয় সমৃদ্ধি যুগের মুসলমানদের হাতে নিষ্পন্ন হয়, সেসব মহান বিজ্ঞানী দার্শনিকদের মধ্যে Jabir Ibn Haiyan-বিষয় রসায়ন বিদ্যা, Muhammad Bin Musa Al-Khawarizmi (গণিত, বীজগণিত, ক্যালকুলাস, ভূগোল) Yanus Ibn Ishaq Al-Kindi (পদার্থ বিদ্যা, গণিত, ঔষধ) Thasit Ibn Qurra (জ্যোতির্বিদ্যা, যন্ত্র কৌশল, জ্যামিতি, শরীর তত্ত্ব) Ali Ibn Rasban Al-Tasari (চিকিৎসা, গণিত, হস্তলিপি, সাহিত্য) Abu Abdullah Al-Battani (জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ত্রিকোণমিতি) Al-Farghani (জ্যোতির্বিদ্যা, Civil Eng.), Mohammad Ibn Zakaria Al-Razi (চিকিৎসা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, চক্ষু বিদ্যা), Abu Al Nasir Al-Farasi (সমাজ বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সংগীত শাস্ত্র) Abul Hasan Ali Al-Masudi (ভূগোল, ইতিহাস), Abu Al Qasim Al-Zahrani (চিকিৎসা বিদ্যা, ঔষধ বিজ্ঞান), Abul Wafa Muhammad Al-Barjani (গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি), Abu Ali Hasan Bin Al-Hai (আলোক বিজ্ঞান, গণিত), Abu Al-Hasan Al-Mawardi (রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, আইন শাস্ত্র, নীতি বিজ্ঞান), Abu Raihan Al-Bisu (জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, তিনি পৃথিবীর পরিধি মাপেন), Abu Ali Ibn Sina (চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক, দর্শন, গণিত), Omar Al-Khayyam (গণিত, কৃষি সাহিত্য), Abu Hamid Al-Ghasali (সমাজ বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব বিদ্যা, দর্শন শাস্ত্র), Abu Marwan Ibn Zahar (সার্জারী, মেডিসিন), Al-Idrisi (ভূগোল), Ibn Rushd (আইন শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন শাস্ত্র), Ibn Al-Baitas (জ্যোতির্বিদ্যা), Nasir Al-Din Al-Tusi (জ্যোতির্বিদ্যা), Jalal Al-Din Rumi (সমাজ বিজ্ঞান), Ibn Al Nafis (Anatomy), Ibn Khaldun (সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি)

এ সকল বিজ্ঞানীদের হাতে দার্শনিকদের চিন্তার ফসল হিসাবে যে নবযাত্রা শুরু হয়েছিলো তার ফল ভোগ করছে পাশ্চাত্যের ধনী মানুষেরা। এদের মধ্যে জাবীর ইবনে হাইয়ান (ইংরেজরা Geber বলে চিনে) হলেন রসায়ন বিদ্যার জনক। তাঁর হাতেই রসায়ন বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে উঠে। তিনি আনুমানিক ৭২১ খৃ. পারস্যের তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খলীফা হারুন উর-রশীদের সময়কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি রসায়ন বিজ্ঞানের বেশ কিছু যন্ত্র পাতি ও পরিভাষার জন্ম দেন। বর্তমানে ব্যবহৃত Alkali, Antimony, Aludel ইত্যাদি আল জাবীরের দেয়া শব্দ। Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi (780-800) তিনি খলীফা হারুন উর-রশিদ এর সময়কালে বাগদাদে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ক্রমে তাঁর কাজ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর নাম থেকেই Algorithim শব্দটির উৎপত্তি। তিনি প্রথম সুসংবদ্ধভাবে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি এ পদ্ধতির ধারণা পান ভারতীয়দের নিকট থেকে। ভারতীয়রাই সর্বপ্রথম শূন্যের ব্যবহার করে। বর্তমানে যে সংখ্যা পদ্ধতি প্রচলিত যেমন ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ইত্যাদির পরিশিলীত রূপ দান করেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ মুসা আল খাওয়ারিযমী। এ সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাপত্র প্রায় ১২০০ খৃঃ প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্য সমাজে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। তিনি বীজগণিতের উপর বিখ্যাত গ্রন্থ "Hisas Al-Jasar Wa Al-Mingasala" রচনা করেন। তিনি দ্বি-ঘত সমীকরণের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। Algebra শব্দটি

* ইউ জি সি, পি এইচ ডি ফেলো, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

নেয়া হয়েছে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক থেকে। গণিত ও ভূগোলে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছিলেন। বৃটিশ ব্রুটকাস্টিং কর্পোরেশন এ বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে সর্বকালের অন্যতম বিজ্ঞানী বলে সম্মানিত করেন। ইসলামী বিশ্বের আলোকবর্তিকায় সমৃদ্ধ হয়ে যিনি বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছেন এরকম একজন বিজ্ঞানী হলেন আবু বকর মুহাম্মদ আল-রাজী (৮৪৪-৯৪৬) সে সময়ে তিনি জগত বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকার গবেষণা গ্রন্থ ১৩১টি। তার মধ্যে অর্ধেক চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত। ২০ খন্ডে রচিত তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ "Kitab Al-Hauri" অসাধারণ বই। যাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশ্চাত্য সমাজে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এ গ্রন্থটি দীর্ঘ সময় ধরে টেক্স বই হিসাবে পাঠ্য ছিলো। তাঁর রচিত আরেকটি গ্রন্থের নাম "Kitab Al-Mausuri" এটি দশ খন্ডে রচিত বিশাল গ্রন্থ। ঔষধ বিষয়ে রচিত এ গ্রন্থটি তাঁর অসামান্য গবেষণা কর্ম। তিনি মনোরোগ বিষয়ে Tibb Al-Ruhani গ্রন্থ রচনা করেন।

আলোক বিজ্ঞানের (Optin) উপর গবেষণা করে খ্যাতি লাভ করেছেন এরকম একজন প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী Muhammad Ibn Al-Haittam (965-1039) . তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থের নাম Kitab Al-Mrezi বা আলোক বিজ্ঞানের বই। বিশ্বের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সূর্যগ্রহণকালে সূর্যের অর্ধচন্দ্র আকৃতির (Half moon shape) ছবি ধারণ করেন। আলোক বিজ্ঞানের সমৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অসাধারণ।

কীভাবে আমরা দেখতে পাই এ বিষয়ক বিতর্কে তিনি বিশ্বাস করতেন দৃশ্যমান বস্তু থেকে যে আলো ছড়ায় তার কিছু অংশ চোখের মনিতে প্রবেশ করে, তাই আমরা দেখতে পাই। এ বিষয়ে ইউক্লিড, টলেমী ও আল-কিন্দীর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রতিসরণ, প্রতিফলন, ল্যান্স ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিলো। তার গবেষণার পথ ধরে পরবর্তীতে ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়।

বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী মুসলিম বিজ্ঞানী আল বেরুনী। তাঁর পুরো নাম আবু আল রায়হান মুহাম্মদ বিন আল বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮)। তিনি একাধারে দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা, পরিব্রাজক, ভূগোল বিশারদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, গণিতজ্ঞ, জ্যোর্তিবিদ, কবি ও পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন। প্রতিটি শাখায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তার বিখ্যাত কয়টি গ্রন্থ Athar-ul-Baaiya, Vestigs of the Kast Tarik Al-Hind (হিন্দুস্থানের ইতিহাস)। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার উপর একখানি বিশ্বকোষ রচনা করেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ১৮টি মূল্যবান পাথরের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) নির্ণয় করেন। গণিত ও জ্যামিতিতে তাঁর অনেক আবিস্কার রয়েছে।

ভূগোল চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলো না। তারাই সর্বপ্রথম পৃথিবীর পরিধি মাপতে সক্ষম হন, প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র তৈরী করেন। সে যুগের ঐতিহাসিক ও ভূগোল বিশারদ আল-মাসউদী তাঁর সুরুজ আয-যাহাব নামক বইয়ে তৎকালীন সময়ের অনেক জায়গার সঠিক বিবরণ প্রদান করেন। মুসলিম পরিব্রাজক নাসির-ই-খসরু সৌরমণ্ডল ও পৃথিবীর মানচিত্র তৈরী করেন।

তৎকালীন আরব ও অনারব মুসলিম দেশসমূহের রাস্তাঘাট, নগর, শস্য উৎপাদন বিষয়ক বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত বেশ কিছু পুস্তক খ্যাতি লাভ করে। এগুলোর রচয়িতাদের মধ্যে ইবনে খুদাযবিহ্, কুদামা, ইয়াকুবী ও ইবনে রুস্তাহ্। দশম শতাব্দী থেকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা সুবিন্যস্তভাবে ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ রচনা শুরু করেন।

আজকের যে চিকিৎসা বিজ্ঞান তার শুরু মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে, তার সমৃদ্ধি ও বিন্যাস মুসলমান বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারে শুরু হয়। এক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান বিশাল ও তুলনাহীন। প্রথম দিকে মুসলিম চিকিৎসকরা প্রাচীন যুগের তিনজন প্রধান চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও ডায়োসকিউরাইডসের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু ৮৫০ খৃ. আলী ইবনে হাব্বান আত-তাবারী সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ 'ফিরদাউস আল হিকমা' (জ্ঞানের স্বর্গ) রচনার মধ্য দিয়ে মৌলিক জ্ঞান ভান্ডারে প্রবেশ করেন। তারপর থেকে কেবল এগিয়ে যাবার পালা। অসাধারণ জ্ঞান নৈপুণ্যে টইটুম্বুর সেসব ঘটনা। ইরান দেশের তিনজন বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নাম জগৎজোড়া। এরা সকলে মুসলিম। তাঁরা হলেন, আল-রাযী, আল-মাজুমী ও ইবনে সীনা।

ইবনে সীনার অবদান চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসামান্য। তাঁকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ও প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তাঁর রচিত ১৮ খন্ডের বিশাল গ্রন্থ Kitab Al-Shifa এবং Qanun Fiel Tibb (৫ খন্ড) চিকিৎসা বিজ্ঞানীর কাছে হিরের টুকরো। তিনি এ বিষয়ে ৯৯টি গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিখ্যাত বিজ্ঞানী কারো ছাত্র না হয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে বিখ্যাত হন। তিনি তাঁর সময়কালে আশ-শায়খ আর রাঈস আল-হুকামা (জ্ঞানীদের প্রধান ও পুরোধা) অভিধায়ে ভূষিত হন।

তাঁর গ্রন্থের প্রভাব এত বেশি ছিলো যে, ইউরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলোতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের (প্যালেন, আল-রাযী) পুস্তকের বদলে তাঁর পুস্তক পাঠ্য করা হয়। তাঁর বইগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। আরেকজন বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী হলেন, কায়রোর ইবন আন-নাফীস। তিনি ফুসফুসে পালমুনারী ধমনীর রক্ত সঞ্চালনের বিষয়ে প্রায় নিখুঁত বর্ণনা দেন। ভেষজ বিজ্ঞানে বই রচনা, ঔষধ তৈরীর কারখানা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলমানরাই বর্তমান সভ্যতার অগ্রদূত। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে বাগদাদে খলীফা হারুন উর রশীদের সময় প্রথম হাসপাতাল (বিমারিস্তান) প্রতিষ্ঠিত হয়। একাদশ শতাব্দীতে ভ্রাম্যমান হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিমরা। প্রত্যেক হাসপাতালে নারী ও পুরুষের পৃথক বিভাগ থাকতো। চিকিৎসক ছাড়াও রোগীর পরিচর্যার জন্য পুরুষ ও মেয়ে সেবক-সেবিকা ও পরিচারক-পরিচারিকা থাকতো।

মূলতঃ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান বিশাল। আধুনিক সভ্যতার জনক তারাই। গবেষণা ক্ষেত্রে তাদের যে বিস্ময়কর সৃজনশীলতা তা আজকের যুগের মুসলমানদের অবস্থা দেখে বিশ্বাস করা কঠিন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যাতে মুসলিম জ্ঞানী গবেষকরা কাজ করেননি। মুসলমানদের অনুকরণ, অনুসরণ করে সমৃদ্ধি পেয়েছে আজকের পাশ্চাত্য বিশ্ব।

জ্ঞান অর্জনের জন্য, সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য, আল্লাহর দেয়া নিদর্শন সমূহ অনুধাবন, উপলব্দি করার মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন যাদের পাথেয় হওয়ার কথা, তারা আজ সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত। সারা বিশ্বের সিংহ ভাগ উদ্বাস্তু মুসলিম জনগোষ্ঠী।

যারা জ্ঞানের পুরোধা তারাই আজ অন্ধকারে পথ খুঁজে মরে। কারন একটাই- জ্ঞান অন্বেষনের, জ্ঞান চর্চার, জ্ঞান শিক্ষার পথ থেকে দুরে সরে যাওয়া।

যে মহান গ্রন্থ আল কোরআনের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে মুসলমানেরা বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিয়েছিলো, সেবার মহান দ্বার উন্মোচন করেছিল, তারাই আজ বিস্মৃত, ম্রিয়মান।

আল কুরআনের প্রথম নির্দেশ পড় এবং প্রভুর নামে পড়। কুরআন শব্দের অর্থ পড়ার বিষয়। আমরা পবিত্র কুরআনকে না পড়ে, না বুঝে এতবার চেষ্টা করছি। যেদিন আবার মুসলমানরা পবিত্র কুরআনকে পূর্বের মতো গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তন্ময় হয়ে পড়বে, বুঝবে ও গবেষণা করবে, সেদিন আবার শুরু হবে সোনালী দিন। সেদিন যেন খুব সহসাই আসে সেই প্রার্থণা করি মহান রাব্বুল আলামীন এর দরবারে।